

Live MCQ™

৪৯তম স্পেশাল বিসিএস (শিক্ষা) বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বিষয়: রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৩৪১)

Compendium PDF

(সিলেবাস অনুসারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও এমসিকিউ-এর সমন্বয়ে রচিত)

Mentor:

মোঃ আব্দুল কাদের

প্রভাষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)

৩৮তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা)

প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম।

৪৯তম (স্পেশাল) বিসিএস পরীক্ষা-২০২৫ এর বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়ে PSC কর্তৃক নির্ধারিত সিলেবাসের ওপর সকল ক্লাস ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। আসন্ন চূড়ান্ত পরীক্ষাকে সামনে রেখে Live

MCQ একাডেমিক টিম আপনাদের প্রস্তুতিকে শানিত করতে বিশেষ কমপেনডিয়াম পিডিএফ প্রদান করছে। আশা করছি, এর মাধ্যমে আপনাদের প্রস্তুতি আরও শানিত হবে ইনশাআল্লাহ।

সূচিপত্র:

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.	PSC নির্ধারিত সিলেবাস ও মানবন্টন	2
২.	টপিকসমূহের গুরুত্ব নির্ধারণ	6
৩.	বুক লিস্ট	9
৪.	শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল	9
৫.	টপিকভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা	11
৬.	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ২০০ MCQ	239

Contents

POLITICAL SCIENCE (POST RELATED).....	4
❖ টপিকভিত্তিক সাজেশন	6
❖ বুকলিস্ট:.....	8
❖ শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল	9
❖ টপিকভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং সংক্ষিপ্ত নোট	10
ফলাফল:.....	148
১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি	148
আগরতলা মামলা (Agartala Conspiracy Case).....	149
১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন	150
ফলাফল.....	150
গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ	150
আওয়ামী লীগের বিজয়	150
পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন স্পষ্ট হয়.....	150

ক্ষমতা হস্তান্তর অধীকৃতি	150
ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া	150
১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন.....	150
পটভূমি.....	151
১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী	151
২৫ মার্চ ১৯৭১: এক ভয়াবহ রাত – কালরাত্রি	151
১০ এপ্রিল ১৯৭১: অস্থায়ী সরকার গঠন.....	151
সরকারের মূল সদস্যরা	151
অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ	152
মুজিবনগর সরকারের প্রধান কাজ.....	152
মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব	152
১১ টি সেক্টর ও তাদের সদর দপ্তর	152
ব্রিগেড ফোর্স	153
বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী	153
অক্টোবর – নভেম্বর ১৯৭১	153
➤ অক্টোবর ১৯৭১	153
➤ নভেম্বর ১৯৭১	153
ডিসেম্বর ১৯৭১: চূড়ান্ত যুদ্ধ ও বিজয়.....	153
➤ ৩ ডিসেম্বর:.....	153
➤ ৪-১৬ ডিসেম্বর: যৌথ বাহিনীর বিজয় অভিযান	153
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১: শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস.....	154
শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা (নমুনা).....	154
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১: বিজয় দিবস.....	154
আত্মসমর্পণের সময় মধ্যে ছিলেন.....	154
এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও ঘটনা	155
সরকার প্রদত্ত বীরত্বসূচক উপাধি / খেতাবসমূহ.....	155
বীরশ্রেষ্ঠ (Bir Sreshtho).....	155
❖ সর্বাধিক ২০০ টি MCQ.....	165

POLITICAL SCIENCE (POST RELATED)

Subject Code: 341

Total Marks-100

Part-1: Marks: 50

A. Introduction to Political Science: Basic Concepts, State and its evolution, Society, Citizenship, Law, Meaning and Classification of Constitution, Classification and forms of Govt., Democratic, Dictatorial, Totalitarian, Presidential and Parliamentary. French model, Unitary, Federalism, Problems and new trends.

(ক. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভূমিকা: মৌলিক ধারণা, রাষ্ট্র এবং এর বিবর্তন, সমাজ, নাগরিকত্ব, আইন, সংবিধানের অর্থ এবং শ্রেণিবিভাগ, সরকারের শ্রেণিবিভাগ এবং রূপ, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, সর্বাধিকারবাদী শাসন, রাষ্ট্রপতিশাসিত এবং সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা, ফরাসি মডেল, এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা, ফেডারেল বা বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার সমস্যা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থার নতুন প্রবণতা)

B. Organs of Govt., Separation of Power-Variety and Proportional Representation, Electorate, Political Party, Interest Group, Pressure Group, Public Opinion, Bureaucracy, Elite, Local Govt., Local Self govt.

(খ. সরকারের অঙ্গ: ক্ষমতার বিভাজন বৈচিত্র্য এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, ভোটার, রাজনৈতিক দল, স্বার্থ গোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, জনমত, আমলাতন্ত্র, অভিজাত, স্থানীয় সরকার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।)

C. Nature and Meaning of Public Administration: Scope and the main elements of Public Administration, Public and Private Administration, Approaches to the Study of Public Administration.

(গ. জনপ্রশাসনের প্রকৃতি এবং অর্থ: জনপ্রশাসনের পরিধি এবং প্রধান উপাদান, সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসন, জনপ্রশাসন অধ্যয়নের পদ্ধতি।)

D. Administrative Concepts: Hierarchy. Division of Work, Co-ordination, Span of Control, Unity of Command, Line and Staff, Centralization and Decentralization, Departmentalization.

(ঘ. প্রশাসনিক ধারণা: শ্রেণিবিন্যাস, কর্মবিভাগ, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণের পরিধি, কমান্ড, লাইন এবং কর্মীদের ঐক্য, কেন্দ্রীকরণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ, বিভাগীয়করণ।)

E. Bureaucracy: Meaning and Characteristics, Political and Administrative Role, **Administrative Accountability:** Legislative, Executive and Judiciary.

(ঙ. আমলাতন্ত্র: অর্থ এবং বৈশিষ্ট্য, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভূমিকা।)

প্রশাসনিক জবাবদিহিতা: আইনসভা, নির্বাহী এবং বিচার বিভাগ।)

F. Approaches to the Study of Politics System Analysis: Structural-Functional Analysis, Elite Theory, Group Theory, Role Theory, Decision-Making Theory. Conflict Theory, Game Theory, Communication Theory, Psycho-Analytic approaches, Marxist and Neo-Marxist Approaches.

(চ. রাজনীতি অধ্যয়নের পদ্ধতি পদ্ধতি বিশ্লেষণ: কাঠামোগত-কার্যকরী বিশ্লেষণ, অভিজাত তত্ত্ব, গোষ্ঠী তত্ত্ব, ভূমিকা তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব, দ্বন্দ্ব তত্ত্ব, গেম থিওরি, যোগাযোগ তত্ত্ব, মনো-বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি, মার্কসবাদী এবং নব্য-মার্কসবাদী পদ্ধতি।)

G. Political Thought

Greek City State and/Greek Philosophy Socrates, Plato, Aristotle, Kautilya and Arthashastra, Confucianism, Taoism

Ibne Khaldun, Imam Gazzali, Machiavelli, Hobbes, Locks, Montesquieu, Rousseau, Karl Marx, Mao-Ze-Dong.

(ছ. রাজনৈতিক চিন্তাধারা: গ্রীক নগর রাষ্ট্র এবং/গ্রীক দর্শন সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, কৌটীলা ও অর্থশাস্ত্র, কনফুসিয়ানিজম, তাওবাদ, ইবনে খালদুন, ইমাম গাজ্জালী (রহ.), ম্যাকিয়াভেলি, টমাস হবস, জন লক, মন্টেস্কু, জ্যাঁ জ্যাক রুশো, কার্ল মার্কস, মাও-জে-দং)

Part-II; Marks: 50

A. Politics in Bangladesh: Geography, History, Society, Culture.

(ক. বাংলাদেশের রাজনীতি: ভূগোল, ইতিহাস, সমাজ, সংস্কৃতি।)

B. The Liberation War and its Background: Language Movement, 1952; Constitutional Movement, 1962; Autonomy Movement, 1966; Mass Movement, 1968, 1969; Non-Cooperation Movement, 1971. Liberation War-Courses and various Dimensions.

(খ. মুক্তিযুদ্ধ এবং এর পটভূমি: ভাষা আন্দোলন, ১৯৫২; সাংবিধানিক আন্দোলন, ১৯৬২; স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, ১৯৬৬; গণআন্দোলন, ১৯৬৮, ১৯৬৯, অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৭১।

মুক্তিযুদ্ধ-কোর্স এবং বিভিন্ন মাত্রা।)

C. Political Process & Constitution Making: Political Development, 1972-2005. Rule of Military and Military withdrawal from Politics, Role of Opposition, The Concept of Caretaker Govt. Amendments to the Constitution.

(গ. রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও সংবিধান প্রণয়ন: রাজনৈতিক উন্নয়ন, ১৯৭২-২০০৫। রাজনীতি থেকে সামরিক বাহিনী এবং সামরিক প্রত্যাহারের শাসন, বিরোধী দলের ভূমিকা, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা। সংবিধানের সংশোধনী।)

D. Foreign Policy of Bangladesh: The Big Power Diplomacy in the Bangladesh Liberation War, The Nature and the Objectives of Bangladesh's Foreign Policy, Foreign Policy Making Process in Bangladesh, Economic and Political bases of Bangladesh Foreign Policy, Bangladesh and its South Asian Neighbours, Bangladesh's Relations with the US, Former Soviet Union, Russia, China and the EU, Bangladesh and the Islamic World, Bangladesh and UNO, Recent trends in Bangladesh Foreign Policy.

(ঘ. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি: বাংলাদেশে বৃহৎ শক্তির কূটনীতি মুক্তিযুদ্ধ, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য, বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়া, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্তি, বাংলাদেশ এবং এর দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন, রাশিয়া, চীন এবং ইইউ, বাংলাদেশ এবং ইসলামী বিশ্ব, বাংলাদেশ এবং জাতিসংঘ, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির সাম্প্রতিক প্রবণতা।)

E. International Politics of South & South East Asia: The Region, Social & Cultural Setting, Historical & Colonial Experience, Nationalist Movement,

Nature & Political System: Democratic Setup, The Foreign Policies of South and South East Asian Countries, The Formation of SAARC, ASEAN, and Future Prospects.

(ঙ. দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আন্তর্জাতিক রাজনীতি: অঞ্চল, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমি, ঐতিহাসিক ও ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, প্রকৃতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা: গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির পররাষ্ট্রনীতি, সার্ক, আসিয়ান গঠন এবং ভবিষ্যতের সম্ভাবনা)

F. Major Political Systems: UK, USA, PRC and Japan.

(চ. প্রধান রাজনৈতিক ব্যবস্থা: যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পিআরসি এবং জাপান।)

❖ টপিকভিত্তিক সাজেশন

Part- I

টপিক	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ***	গুরুত্বপূর্ণ **
	-গ্রন্থের নাম (বেশকিছু প্রশ্ন কমন আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি) -বিভিন্ন প্রবক্তা বা জনক -গুরুত্বপূর্ণ উক্তি -বিভিন্ন শব্দের উৎপত্তি	
A. Introduction to Political science (খুব গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন)	-Basic concept -রাষ্ট্রের উপাদান -সার্বভৌমত্ব -এরিস্টটলের সরকারের শ্রেণিবিভাগ -সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ - রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী শাসিত সরকার	- রাষ্ট্রের বিবর্তন - ফ্রাঞ্চ মডেল - আইন
B.	-Organs of Government -Separation of power -Rule of law -Bureaucracy -Local government -Local self government	-Interest group -Pressure group
C. Administration	-Nature & meaning of public administration -Elements - Public and private administration difference	- Approach
D.	- Hierarchy -Span of control - Red tapism	- Centralization and decentralization
E. Bureaucracy	-Meaning -Characteristics - Max Weber's bureaucracy - Administrative accountability	
F. Approaches (খিওরি থেকে অবশ্যই প্রশ্ন আসবে)	-System theory -Structural functional theory -Elite theory - Game theory	- Group theory - Communication theory
G. Political	-Plato	-Socrates

thought ***** (অধিকাংশ প্রশ্নই এখান থেকে আসার মতোই গুরুত্বপূর্ণ। must read, carefully read)	-Aristotle -Kautilya and Arthashastra -Confucianism -Ibne Khandun, Gazzali -Machiavelli -Hobbes -Locke -Rousseau -Karl Marx	-Taoism --Mao Ze Dong
--	---	--------------------------

Part-II

টপিক	সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ***	গুরুত্বপূর্ণ **
A.	History	
B.	-Language Movement -Constitutional movement -Autonomy movement -Mass uprising 1969 -Liberation war	-Mass movement
C.	-Caretaker Government -Amendments	-Military rule
D.	-Big power diplomacy in Liberation war -The Nature and the Objectives of Bangladesh's Foreign Policy Foreign policy of BD -BD US -Bangladesh and its South Asian Neighbours -BD China	Economic and Political bases of Bangladesh Foreign Policy
E.	-SAARC -ASEAN	-The Region, Social & Cultural Setting, Historical & Colonial Experience, Nationalist Movement
F.	-USA (ইলেক্টোরাল বডি, নির্বাচন পদ্ধতি) -UK (রাজা)	-PRC -Japan

- প্রথম ভাগ থেকে সূচনা অধ্যায় এবং রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের অংশটা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে পড়বেন।
- এপ্রোচ এবং অঙ্গসংস্থাগুলো বারবার খেয়াল করবেন যেন ভুল হয়। বাংলাদেশ বিষয়াবলীতে অঙ্গসংস্থা যেহেতু পড়েছেন তাই এটা আপনার স্ট্রং পয়েন্ট করার চেষ্টা করবেন।
- দ্বিতীয় ভাগ যেহেতু বাংলাদেশ বিষয়াবলী এবং আন্তর্জাতিক বিষয়াবলীর সাথে মিল আছে সেহেতু এখানে খুব বেশি আলাদা প্রস্তুতির প্রয়োজন পড়বে না।
- দ্বিতীয় ভাগের প্রধান রাজনৈতিক পদ্ধতি অংশটা খুব ভালো করে পড়বেন। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা, ভোট পদ্ধতি, নির্বাচকমণ্ডলী এবং যুক্তরাজ্যের শাসন ব্যবস্থা যত্ন নিয়ে পড়বেন।
- মূল পরীক্ষায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে উত্তর করবেন। উত্তর করার আগে অন্যান্য অপশন দেখে নিবেন। সবগুলো/কোনোটাই নয়/প্রশ্নে 'না' বোধক উত্তর চাইলে ভালো করে খেয়াল করে উত্তর করবেন।
- উত্তর করার শুরুতেই যদি প্রশ্ন আনকমন মনে হয় বা কঠিন মনে হয় প্যানিকড না হয়ে স্কিপ করবেন। মনে রাখবেন প্রশ্ন কঠিন হলে সবার জন্যই কঠিন। তাই প্যানিকড না হয়ে শান্ত থাকার চেষ্টা করবেন। অনেক শুভকামনা রইলো।

❖ বুকলিস্ট:

১. পৌরনীতি ও নাগরিকতা- নবম দশম শ্রেণি
২. পৌরনীতি ও সুশাসন (১ম ও ২য় পত্র)- প্রফেসর মো: মোজাম্মেল হক
৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা- ড. এমাজউদ্দীন আহমদ
৪. রাষ্ট্রচিন্তা পরিচিতি- মুহম্মদ আয়েশ উদ্দীন
৫. তুলনামূলক নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি- ড. অনাদিকুমার মহাপাত্র
৬. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় এইচ এস সি প্রোগ্রাম- রাষ্ট্রবিজ্ঞান ১,২
এবং অনার্স (সম্মান) বইসমূহ-
৬. রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন
৭. রাজনৈতিক তত্ত্ব পরিচিতি
৮. প্রধান প্রধান বৈদেশিক সরকার:(যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স)
৯. পূর্ব এশিয়ার সরকার ও রাজনীতি: চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া

❖ শেষ মুহূর্তের নির্দেশনা ও গুরুত্বপূর্ণ কৌশল

* এই মুহূর্তে এবং এত কম সময়ে নতুন করে কোনো রেফারেন্স বই পড়ে শেষ করা এবং পরীক্ষায় ভালো করা প্রায় অসম্ভব কারণ একই বইতে সব টপিক পাওয়া যাবে না। আর ৪/৫টা বই থেকে পড়ে রিভাইস দেওয়ার মতো সময় হাতে নেই। কিন্তু কিছু বই রেফারেন্স বুক হিসেবে পড়ার সময় সামনে রাখা যেতে পারে যেন কোনো দ্বিধা বা সন্দেহ জাগলে বা না বুঝতে পারলে মোটামুটি পড়ে বুঝে নিতে পারেন।

অনার্সের সব পড়া মনে না থাকাটাই স্বাভাবিক। তাই এসব ভেবে প্যানিকড হবেন না। চেষ্টা করুন সময়টুকুর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার।

* লাইভ এমসিকিউ প্রদত্ত ম্যাটারিয়ালস, ক্লাস এবং মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলো সমাধান করার চেষ্টা করবেন। পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো ইন্টারনেটে সার্চ করে নিবেন।

* আপনি বেকার বা চাকরিজীবী যাই হোন না কেন, শেষ সময়ে সবাই টেবিলে অন্তত ১০-১২ ঘণ্টা করে সময় দিন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো বারবার সমাধান করুন।

* শেষ সময়ে এসে নিয়মিত মডেল টেস্ট দিন এবং নিজের দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত করুন। কোন বিষয় বা অধ্যায় বা টপিকে বেশি খারাপ করছেন, সেটি চিহ্নিত করে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নজর দিন।

জেনারেল ১০০ তে পিছিয়ে না থেকে সাবজেক্টিভ ১০০ নম্বরে একটি গোছানো প্রস্তুতি নিলে সহজেই এগিয়ে যাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ।

* কোয়ালিটি পড়াশোনা নিশ্চিত করুন। কেবল টেবিলে বসে থাকাটাই পড়াশোনা নয়; আপনি যদি ১০ ঘণ্টা টেবিলে বসে ৮ ঘণ্টা আনমনা বা অমনোযোগী থাকেন, তাহলে দিনশেষে শূন্য হাতে ফিরতে হবে।

* দিনশেষে আত্মবিশ্বাস রাখুন- আপনি পারবেন। নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখুন। যে ধর্মের-ই হোন সেখান থেকে নিয়মিত দোয়া প্রার্থনা করুন। মনে রাখবেন আপনার আত্মবিশ্বাস আপনার শক্তি। পরীক্ষায় আপনাকে অনেকটাই এগিয়ে রাখবে।

❖ টপিকভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং সংক্ষিপ্ত নোট

লেকচার: ১

Topic:

A. Introduction to Political Science :

Basic Concepts, State and its evolution, Society, Citizenship, Law, Meaning and Classification of Constitution, Classification and forms of Govt, Democratic, Dictatorial, Totalitarian, Presidential and Parliamentary, French model, Unitary, Federalism, Problems and new trends

Introduction to Political Science

রাষ্ট্রবিজ্ঞান শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে 'Political Science' যা এসেছে গ্রিক শব্দ 'Polis' থেকে। 'Polis' অর্থ হল 'নগররাষ্ট্র'। প্রাচীন গ্রিস ও রোমের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ছোট ছোট নগরকে নিয়ে এক একটি রাষ্ট্র গঠিত হতো। প্রাচীনকালে নগররাষ্ট্র ও এর সমস্যাবলি এবং সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হতো বলে এ বিজ্ঞানকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে। সাধারণ অর্থে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয় তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে।

- রাষ্ট্রবিজ্ঞান শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন- লিবনিজ
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান কূটনীতি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, আন্তর্জাতিক আইন, বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনা করে।
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল তাঁর পলিটিক্স নামক গ্রন্থটিতে রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিশ্লেষণকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান (Master Science) বলে উল্লেখ করেছেন।
- রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাস্ত্রটিকে প্রধানত তত্ত্বগত রাজনীতি (Theoretical Politics) ও ব্যবহারিক রাজনীতি (Applied Politics) এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। তত্ত্বগত রাজনীতি রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে। ব্যবহারিক রাজনীতি রাষ্ট্রের কার্যাবলী পর্যালোচনা করে। যেমন, শাসনতন্ত্র, শাসনতান্ত্রিক আইন, নির্বাচকমণ্ডলী, আইন সভা, আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ইত্যাদি।
- রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতির ধারা দুটি- আরোহ, অবরোহ। এরিস্টটল প্রথম আরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ করেন। প্লেটো অবরোহী পদ্ধতির অবতারণা করেন।

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

- অধ্যাপক জে ডব্লিউ গার্নার বলেন, 'Political science begins and ends with the state' (রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শুরু ও শেষ রাষ্ট্রকে নিয়ে।) অর্থাৎ, রাষ্ট্রবিজ্ঞান হলো সেই বিষয় যা কেবল রাষ্ট্রকে নিয়ে আলোচনা করে।
- স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয়- বার্জেস বলেছেন।
- অধ্যাপক আর জি গেটেল এর মতে, "Political Science is the study of the state in the past, present and future". (রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করে)।
- অধ্যাপক গিলক্রিস্ট বলেছেন- "Political science deals with the state and government" (রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র ও সরকার নিয়ে আলোচনা করে) অর্থাৎ এর আলোচ্য বিষয়- রাষ্ট্র এবং সরকার।

- 'Political Science is that part of social science which analyses the foundations of the state and the principles of government' এ সংজ্ঞাটি দিয়েছেন- পলজানে
- Political science deals with political activities of men in society and their different social roles' এই উক্তিটি- ক্যাটালিনের।

প্যারিসের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনে (১৯৪৮) গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিষয় ৪টি হল—

- রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান,
- রাজনৈতিক তত্ত্ব,
- রাজনৈতিক দল, গণ্যেষ্ঠী ও জনমত এবং
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক সংগঠন।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিবর্তন

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূচনা: প্রাচীন গ্রিসে রাষ্ট্রচিন্তার দ্বারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রপাত গ্রিসের চিন্তাবিদগণ সফিস্ট (Sophist)-এর হাতে। পরবর্তীকালে সে যুগের যুক্তিবাদী মনীষী ও সমাজশিক্ষক সক্রেটিস রাষ্ট্রচিন্তার ধারণাকে সত্য ও নীতিজ্ঞানের আলায়ে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো তার দ্য রিপাবলিক (The Republic) গ্রন্থে সফিস্টদের ধ্যানধারণাকে খণ্ডন করে রাজনৈতিক আলােচনায় দর্শন ও নীতিজ্ঞানের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। পরে রাষ্ট্রতত্ত্বের আলােচনাকে এক সুসংবদ্ধ রূপ দেন অ্যারিস্টটল। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ পলিটিক্স (Politics) এ তিনি সর্বপ্রথম রাষ্ট্রচিন্তা বা রাজনীতিচর্চাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন। এজন্য অ্যারিস্টটলকে 'রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক' বলে গণ্য করা হয়।

এককথায়-

- সূত্রপাত সফিস্টদের হাতে
- সক্রেটিস সত্য ও নীতিজ্ঞানের আলায়ে সমৃদ্ধ করেন।
- প্লেটো দর্শন ও নীতিজ্ঞানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেন।
- এরিস্টটল রাষ্ট্রচিন্তাকে বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত করেন।

স্টোয়িক ও রোমান রাষ্ট্রদর্শনের যুগ: স্টোয়িক দর্শনে ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা ও স্বাভাবিক মর্যাদা দিয়ে এক বিশ্বজনীন আদর্শের কথা প্রচার করা হয়। রোমান রাষ্ট্রচিন্তায় দর্শনের চেয়ে বাস্তবতার বিষয়টি বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। রোমান দার্শনিকরা আইনের শাসন ও শাসনতন্ত্রের প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন।

মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা: মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তা একদিকে অস্থিরতা, অন্যদিকে সংস্কারকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চার্চ ও রাজশক্তির মধ্যে বিরোধকে কেন্দ্র করে এসময় রাষ্ট্রচিন্তায় বিতর্ক দেখা দেয়। খ্রিস্টান যাজকরা রাষ্ট্রের চেয়ে চার্চকে শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করেন। অন্যদিকে, মার্টিন লুথার ও ক্যালভিনের মতো সংস্কারপন্থীরা ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে ব্যক্তিকে মুক্ত করে চার্চের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানান।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তা: মধ্যযুগের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটাতে নবজাগরণের পথিকৃৎ নিকোলাে ম্যাকিয়াভেলি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জন্ম দেন। দার্শনিক হিসেবে তিনিই প্রথম যুক্তিতর্কের সাহায্যে রাজনীতিকে মধ্যযুগীয় ধর্মাত্মতা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করেন এবং যুক্তিসংগত আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার উন্মেষ ঘটান। দ্য প্রিন্স (The Prince) গ্রন্থে তিনি ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে বাদ দিয়ে যুক্তি ও বিজ্ঞতার আলায়ে শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্র ও রাজকীয় সার্বভৌম ক্ষমতার তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। ম্যাকিয়াভেলির উত্তরসূরি জাঁ বার্দো ও টমাস হবস নবজাগরণের ভাবধারায় তাদের রচনায় শক্তিশালী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ চিন্তাবিদ জন লকের প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক অধিকারের (Natural Rights) তত্ত্ব রাষ্ট্রচিন্তার জগতে এক নতুন যুগের সূচনা করে। জনগণের জীবন, সম্পত্তি ও স্বাধীনতার অধিকার সংরক্ষণের জন্যই রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে—এ কথা বলে লক উদারনৈতিক মতবাদের সূচনা করেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তা: অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তায় জনগণের সার্বভৌমিকতা, স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রী এবং গণতান্ত্রিক আদর্শ বাস্তব রূপ লাভ করে আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬) ও ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯) মাধ্যমে। ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রুশো, ভলতেয়ার, তেযু প্রমুখের রাষ্ট্রচিন্তা আমেরিকা ও ফ্রান্সে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পথে জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তা: এসময় একদিকে ভাববাদ, হিতবাদ, উদারনীতিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের দর্শন, অন্যদিকে বস্তুবাদী মার্কসীয় দর্শন রাজনীতিচর্চার পরিধিকে আরও সমৃদ্ধ করে। ভাববাদী দর্শন রাষ্ট্রকে একটি ভাব বা আদর্শ হিসেবে প্রচার করে। হিতবাদ, উদারনীতিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা রাষ্ট্রচিন্তায় প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা এবং বজনের হিতসাধনের (কল্যাণের) কথা বলা হয়। অন্যদিকে, মার্কসীয় দর্শন শ্রেণিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে এক শােষণহীন, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা তুলে ধরে।

বিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচিন্তা: বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একদল মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী রাজনীতিচর্চার ক্ষেত্রে কোনো তত্ত্ব বা প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক আলােচনা নয়, রাজনীতিতে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর আচার-আচরণ বিশ্লেষণ করে মূল্যবোধবর্জিত এক বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তারা। রাজনীতিচর্চার এই ধারাকে আচরণবাদ বলা হয়। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের পরে, আচরণবাদের অন্য এক ধারায় 'নয়া আচরণবাদের উদ্ভব ঘটে। **নয়া আচরণবাদ রাজনৈতিক বিশ্লেষণে মানবিক চেতনা ও নৈতিক চেতনাকে যুক্ত করে।**

বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে নয়া উদারনীতিবাদের জন্ম হয়। নয়া উদারনীতিবাদ রাষ্ট্রের কাজকর্মের পরিধিকে সীমিত করে ব্যক্তিকে সবরকম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি দেয়। নয়া উদারনীতিবাদে 'মুক্ত বাজার অর্থনীতির কথা বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজনীতি সম্পর্কিত প্রচলিত ভাবনার কঠোর সমালোচনা করে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির পত্তন ঘটে। নারীবাদীরা পুরুষশাসিত সমাজকাঠামোর বদল ঘটিয়ে নারীর অধিকার ও ক্ষমতায়নের জন্য সোচ্চার হন।

রাষ্ট্রচিন্তার দ্বৈততত্ত্ব : আদর্শমূলক ও অভিজ্ঞতামূলক

রাষ্ট্রচিন্তা দ্বিবিধ প্রকারের, যথা- আদর্শমূলক (Normative) এবং অভিজ্ঞতামূলক (Empirical)। অধ্যাপক ডাব্লিউ. টি. ব্লুম (W. T. Bluhm) এই শ্রেণীবিন্যাসকে ভিন্ন নামে অভিহিত করেছেন, যথা "ন্যুমেনালিস্ট" (Noumenalist) এবং "ন্যাচারালিস্ট" (Naturalist)।

- আদর্শমূলক অর্থাৎ 'নরমেটিভ' বা 'র্যাশনালিস্টিক' রাষ্ট্রচিন্তায় যুক্তি বা আদর্শবাদই প্রধান। গ্রিসে এর সূচনা। যুক্তি বা আদর্শবাদের মাধ্যমে সত্য লাভ করে বলে একে **Truths of reason** বলা হয়। প্লেটো, একুইনাস এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।
- অভিজ্ঞতাবাদে যুক্তি তর্কের চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা বেশি গুরুত্ব পায়। এজন্য একে **truths of fact** বা তথ্যের সত্য বলে। এরিস্টটল, ম্যাকিয়াভেলি এই অংশের অন্তর্ভুক্ত। এর পর্যায়গুলো হলো- সমস্যা নির্ধারণ> পর্যবেক্ষণ> সাধারণ সূত্র আবিষ্কার।

চারটি স্কুল বা মতবাদ

রাষ্ট্রচিন্তার দুটি ধারা- হেলেনিক এবং হেলেনিস্টিক। **হেলেনিস্টিক থেকে চারটি স্কুল বা দার্শনিক মতবাদ গড়ে উঠে।** যথা- সোফিস্ট, এপিকিউরানবাদ, নৈরাশ্যবাদ এবং স্টোয়িকবাদ।

- সোফিস্ট- পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসে বাগ্মিতা, রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে যুক্তিবাদী শিক্ষকতা সোফিস্ট। যেমন- প্রোটাগোরাস, গর্জিয়াস, হিপিয়ারাস, প্রডিকাস।

- এপিকিউরানবাদ- জিনোর বিপরীতধর্মী মতবাদ। Epicurus of Samos থেকেই এর উৎপত্তি। এপিকিউরানরা ভাবতেন- আনন্দই সুখী জীবনের মূলকথা।
- নৈরাশ্যবাদ বা সিনিসিজম- সিনিকগণ সমাজের আর্থসামাজিক সাম্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সিনিকরা সাম্যের ভিত্তিতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চান। মেধা ও জ্ঞানের আলোকে মানুষের উচ্চতা নির্ধারণ করতে চান।
- স্টোয়িকবাদ- সিনিক দার্শনিক কিতিয়নের জিনো (Zeno of Citium) স্টোয়িকবাদের উদ্ভাবক। তাঁর মতে- মানব সুখের ভিত্তি নিজের (বা প্রকৃতির) সাথে সমঝোতা করে বাঁচা, সদগুণের ভিত্তি জ্ঞান, ন্যায়বিচার সঠিক জ্ঞানের বস্তু। এ মতবাদের ভাগ তিনটি হলো- বাঞ্ছনীয় জিনিস (জীবন, সুস্বাস্থ্য), প্রভাবহীন জিনিস এবং অবাঞ্ছিত জিনিস।

সংশয়বাদ- পিরো (Pyrrho of Elis) মনে করতেন, যেহেতু কোনো বিষয়েই পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব জা, সেহেতু কারো পক্ষে এটা বুঝাও সম্ভব না তার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ সত্য না মিথ্যে।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের পদ্ধতি (Methods of studying Political Science)

সনাতন পদ্ধতিসমূহ

- ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical method): সংগৃহীত তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে অতীতের ঘটনাবলি বিশ্লেষণ এবং সাম্প্রতিককালের রাজনৈতিক কার্যাবলির কোন কোন দিক সম্পর্কে পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ বুঝতে তাদের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বর্তমান কর্মসূচি নির্ধারণ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ইঙ্গিত প্রদান করা সম্ভব।
- পরীক্ষামূলক পদ্ধতি (Experimental method): উদ্ভূত নতুন নতুন ঘটনাবলির (শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন, জনবিক্ষোভ, বিদ্রোহ) কারণ অনুসন্ধানের পরীক্ষামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে।
- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি (Observational Method): এ পদ্ধতির সাহায্যে আমরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে রাজনৈতিক নিয়ম-কানুন ও সূত্র উদ্ভাবন করতে সক্ষম হই। **রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এরিস্টটল সর্বপ্রথম এই পদ্ধতিতে নগর রাষ্ট্রের সংবিধান বিশ্লেষণ করেছেন।** এরিস্টটল ১৫৮টি দেশের শাসনতন্ত্রের তথ্য সংগ্রহ করে তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'The Politics' রচনা করেছেন। এতে সংবিধান বা সরকারের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেছেন।
- জীববিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Biological method): রাষ্ট্রকে জীবদেহের সাথে তুলনা করে রাষ্ট্রের গঠন ও কার্যাবলিকে জীববিজ্ঞানের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হয়।
- সমাজবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Sociological method): রাষ্ট্র, সরকার, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গ, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশধারা সম্পর্কে ধারণা নিতে সামাজিক পরিবর্তন ও মূল্যবোধের আলোকে বিচার করতে হয়।
- মনোবিজ্ঞানমূলক পদ্ধতি (Psychological method): জনমত, নির্বাচনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কোন বিশেষ দলের প্রতি সমর্থন ইত্যাদি বিশ্লেষণে মনোবিজ্ঞানের সাহায্য নিতে হয়।
- পরিসংখ্যান পদ্ধতি (Statistical method): রাজনৈতিক দল, জনমত, নির্বাচন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ঘটনাপ্রবাহের গবেষণায় পরিসংখ্যান পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।
- দার্শনিক পদ্ধতি (Philosophical Method): **দার্শনিক পদ্ধতি রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের অবরোহ পদ্ধতি।** এ পদ্ধতিতে কতকগুলো বিষয়কে অনুমানের ভিত্তিতে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে ধরে নেওয়া হয় এবং কাল্পনিকভাবে কতকগুলো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেমন গ্রিক দার্শনিক প্লেটো তার 'The Republic' গ্রন্থে শিক্ষাব্যবস্থা, সাম্যবাদ, ন্যায়ধর্ম ও দার্শনিক রাজার শাসন সম্পর্কে কাল্পনিক ধারণার অবতারণা করেছেন।
- তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method): **রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক এরিস্টটল তুলনামূলক পদ্ধতির প্রবর্তক।** তিনি এই পদ্ধতির সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে রাষ্ট্র, সরকার ও শাসন ব্যবস্থার বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব প্রদান করেছেন। তুলনামূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করে অতীতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলি ও প্রতিষ্ঠানের

সাথে বর্তমানকালের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও ঘটনাপ্রবাহের বিশ্লেষণ করা হয় এবং তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে কার্যকারণ সূত্র নির্ধারণ করা হয়।

- সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (Interview method): সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে শিক্ষিত-অশিক্ষিত জনসাধারণের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কার্যকর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।
- প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি (Institutional method): রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে ও বাইরে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানসমূহ (রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন গোষ্ঠী, সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগ) গঠন ও কার্যাবলি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হয়।

আধুনিক পদ্ধতিসমূহ-

- আচরণগত পদ্ধতি (Behavioral method): পরীক্ষণলব্ধ ও প্রায়োগিক তত্ত্ব উদ্ভাবন, সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ ও তাদের সত্যাসত্য যাচাইয়ের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সুসমন্বিত সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুসন্ধানই হলো আচরণবাদ। এ পদ্ধতিতে অনুকল্প (Hypothesis) গঠন ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।
- সংঘ/গোষ্ঠী তত্ত্ব (Group theory): সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে বোঝার জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করে বিভিন্ন স্বার্থ গোষ্ঠীর ভূমিকা ও পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করা হয়।
- ব্যবস্থা তত্ত্ব (System theory): একটি সমাজে রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এবং অভ্যন্তরীণ ও বহিঃপরিবেশের আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের প্রেক্ষাপটে রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করা হয়।
- কাঠামো কার্যগত তত্ত্ব (Structural-functional theory): রাষ্ট্র ও রাজনীতিকে বোঝার জন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন এবং এই কাঠামোগুলো কী ধরনের ভূমিকা বা কাজ সম্পাদন করে।
- যোগাযোগ তত্ত্ব: Karl Deutsch তাঁর “The Nerves of Government” গ্রন্থে এই তত্ত্বের কথা বলেন। এ পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব সংরক্ষণ, রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন, রাজনীতিতে কাঠামোগত প্রভাব ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়। **জুলাই বিপ্লবকে এই তত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগ বলা যায়। ****

প্রবক্তা/জনক***

বিষয়	জনক/ প্রবক্তা	বিষয়	জনক/ প্রবক্তা
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক	অ্যারিস্টটল	আমলাতন্ত্রের জনক/ আধুনিক আমলাতন্ত্রের জনক	ম্যাক্স ওয়েবার
আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক	নিকোলা ম্যাকিয়াভেলি	দ্বন্দ্ববাদের প্রবক্তা	ফ্রেডরিক হেগেল
গণতন্ত্রের জনক	ক্লিস্থেনিস	ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণের প্রবক্তা	চার্লস মন্টেস্কু
আধুনিক গণতন্ত্রের জনক, উদারনীতিবাদের জনক	জন লক	সার্বভৌম মতবাদের জনক	জন অস্টিন

ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রবক্তা	জন স্টুয়ার্ট মিল	ক্ষমতার বিভাজন তত্ত্ব	মন্টেস্কু
রাজনৈতিক সার্বভৌমিকতার জনক	জ্যাঁ জ্যাক রুশো	আইনগত সার্বভৌমিকতার জনক	বোঁদা

গ্রন্থের রচয়িতা***

গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা
The Republic	প্লেটো	Summa Theologica	থমাস একুইনাস
-The Politics, -Ethics, -Metaphysics	অ্যারিস্টটল	Public Opinion	লিপম্যান
Economy & Society	ম্যাক্স ওয়েবার	The Political System	ডেভিড ইস্টন
Two Treaties on Civil Government	জন লক	অর্থশাস্ত্র	কৌটিল্য
The Spirit of Laws	চার্লস মন্টেস্কু	The Prince	নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি
The Communist Manifesto	কার্ল মার্কস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস	War & Peace	লিও টলস্টয়
Six Books of the Commonwealth	জ্য বোদ্যা	-Das Capital, -State & Revolution	কার্ল মার্কস

The Clash of Civilization	স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন	Leviathan	থমাস হবস
Social Contract theory	জ্যাঁ জ্যাক রুশো	The City of God	সেন্ট অগাস্টিন
The Governmental Process	ডেভিড ট্রুম্যান	Marxismo & Politics	মিলিব্যান্ড
Security: A New Framework for Analysis	ব্যারি বুজান	-Six Books on the Republic, -Lectures on Jurisprudence	জ্যাঁ বোদা
Political Philosophy	ম্যাক্সি		

State & Its Evolution

- রাষ্ট্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।
- 'রাষ্ট্র' শব্দটি সর্বপ্রথম বৈজ্ঞানিক অর্থে ব্যবহার করেন ইতালীয় চিন্তাবিদ নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি।
- পূর্বে রাষ্ট্র বলতে নগররাষ্ট্রকে বুঝানো হতো। আধুনিককালে রাষ্ট্রকে জাতীয় রাষ্ট্র ও সার্বভৌম সংস্থা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাষ্ট্রকে ঈশ্বরসৃষ্ট প্রতিষ্ঠান ভাবা হতো। তখন রাষ্ট্রের ভূমিকা ছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে। খ্রিস্টধর্ম যাজকদের মতানুযায়ী রাষ্ট্র ধর্মীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে।
- ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফালিয়ান চুক্তির থেকে সার্বভৌমত্ব, জাতিরাষ্ট্রের ধারণা উদ্ভব এবং আধুনিক রাষ্ট্রের সূচনা। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের মাধ্যমেই ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। একে সার্বজনীন কল্যাণসাধনকারী প্রতিষ্ঠান ভাবা হয়।
- 'State' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Status' থেকে এসেছে যার অর্থ হলো অবস্থা বা অবস্থান, যা রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত সমাজকে নির্দেশ করে।
- একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনসমষ্টি যদি সরকার গঠন করে স্বাধীন ও সার্বভৌমভাবে বসবাস করে তাকে রাষ্ট্র বলে।
- রাষ্ট্রের/সরকারের প্রধান কাজ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলারক্ষা।
- রাষ্ট্র বিবর্তনের প্রথম ধাপ পরিবার।
- আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। তবে বাংলাদেশ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয়।
- রাষ্ট্রের বাস্তব রূপকার সরকার। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই বলেন- "I am the state", তিনি নিজেকে ঈশ্বরের বরপুত্র মনে করতেন।
- আধুনিক যুগে রাষ্ট্রের (state) পরিবর্তে ব্যবহৃত হচ্ছে 'রাজনৈতিক ব্যবস্থা' (Political system) শব্দটি।

মনীষীর মতে-

- Woodrow Wilson says, "The state is a people organized for law within a definite territory".
- এরিস্টটল বলেন, মানুষের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে এবং মানুষের উন্নততর জীবন বিধানের জন্য রাষ্ট্র সক্রিয় থাকবে।
- অধ্যাপক গার্নার বলেন, "রাষ্ট্র হল বিপুল বা স্বল্পাধিক জনসমষ্টি, যারা একটি সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। যারা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন (অথবা নিকটবর্তী) এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার রয়েছে যার প্রতি সংখ্যাধিক্য জনসাধারণ স্বভাজাত আনুগত্য স্বীকার করে।
- টি এইচ গ্রিন বলেন- রাষ্ট্রের ভিত্তি জনগণের সম্মতি, বলপ্রয়োগ নয়।

রাষ্ট্রের অপরিহার্য কার্যাবলি (Essential functions of state):

- দেশরক্ষা সংক্রান্ত কাজ
- পররাষ্ট্র সংক্রান্ত কাজ
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কাজ
- জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান
- প্রশাসন সংক্রান্ত কাজ
- বিচার সংক্রান্ত কাজ
- আর্থিক কাজ

রাষ্ট্রের উপাদান (Elements of the state)***

রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান ৪ টি। যথা-

1. নির্দিষ্ট ভূখণ্ড (Definite territory)
2. জনসমষ্টি (Population)
3. সরকার (Government)
4. সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)

গৌণ উপাদানের মধ্যে রয়েছে- স্থায়িত্ব, স্বীকৃতি, সাম্য ইত্যাদি।

রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ (Theories of the origin of the state)***

- ঐশ্বরিক মতবাদ (Divine theory): সবচেয়ে প্রাচীন মতবাদ। বিধাতাই রাষ্ট্র সৃষ্টি করে তার পছন্দনীয় প্রতিনিধির হাতে শাসনভার অর্পণ করেছেন। প্রতিনিধিগণ বিধাতার আদেশ মোতাবেক রাষ্ট্র শাসন করেন। রাজার আদেশ নিষেধ অমান্য করা বিধাতাকে অমান্য করার শামিল।
- বলপ্রয়োগ মতবাদ (Force theory): মানুষ কলহপ্রিয় এবং ক্ষমতার মোহে জোর যার মল্লুক তার নীতির ভিত্তিতে সবলেরা দুর্বলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এরূপ পন্থায় গোত্র হতে রাজ্য, রাজ্য হতে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রক্রিয়া চলে এভাবেই রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এতে জনমত অস্বীকার করা হয়।
- পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal theory): অতীতের কোন একজন আদি পুরুষ থেকে পরিবারের জন্ম চিহ্নিত করা হয়। সকল পরিবার রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ থাকতো। কালক্রমে পরিবারের সমষ্টির সমন্বয়ে গঠিত হতো গোষ্ঠী এবং বহু গোষ্ঠীর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে রাষ্ট্র।
- মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Matriarchal theory): সমাজের বিবর্তন ঘটেছে মাতার মাধ্যমে। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়।
- সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract theory)****: **হবস, লক ও রুশোর** মতে, চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো। আইন বা শাসন না থাকায় প্রকৃতির আইন মেনে চলতো। সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতে প্রাকৃতিক আইনের কার্যকারিতা এবং প্রাকৃতিক

অধিকার ভোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। মানুষ চুক্তির মাধ্যমে সভ্য সমাজে ফিরে আসে এবং রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।
অর্থাৎ নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র সৃষ্টি।

- ঐতিহাসিক মতবাদ (Historical or Evolutionary theory): ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের প্রেক্ষাপটে ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। উপাদানসমূহ-রক্তের সম্পর্ক, ধর্ম, অর্থনৈতিক কার্যাবলি, যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক চেতনা।

হবসের মতে- মানুষ ছিল একা, দরিদ্র, কদর্য, পাশবিক, সংক্ষিপ্ত। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। রাজা ও জনগণের মধ্যে এই চুক্তি হয়।

লকের মতে- নাগরিকদের প্রাকৃতিক অধিকার (জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি) রক্ষা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

রুশের মতে- মানুষ ছিল সহজ, সরল, সহানুভূতিশীল। হিংসা, ঘেঁষ ছিল না। প্রকৃতির রাজ্য ছিল আদর্শ রাজ্য। **রুশোর**

মতে- জনগণ তাদের সকল ক্ষমতা একটি সাধারণ ইচ্ছের (general will) উপর অর্পণ করে যা মূলত সার্বভৌম।

সমাজ (Society)

মানুষের প্রয়োজনে সমাজের উৎপত্তি। মানুষের বর্বর বন্য দশা থেকে মুক্তির লক্ষ্যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি দায়িত্ববোধ ও সহযোগিতার নীতির বশীভূত হয়ে **ঐক্যবদ্ধভাবে বসবাসের প্রয়াস** লাভ করে। আর এ প্রয়াস থেকেই সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। কার্ল মার্কস তার মার্কসবাদী তত্ত্বে সমাজের বিবর্তনে শ্রেণিবিভাগের উপর গুরুত্ব দেন। এই তত্ত্বে কার্ল মার্ক্স শ্রেণিসংগ্রামের উপরেও গুরুত্ব দেন।

- সমাজ পরিবর্তনশীল।
- পরিবার সমাজের মৌলিক একক।
- সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য- সহযোগিতা।
- সমাজ সৃষ্টির মূল উপাদান- মানুষ।
- আদিম সমাজের সম্পত্তির ধরন ছিল- সামাজিক মালিকানা।
- সংস্কৃতি হলো- সামগ্রিক জীবন প্রণালী।
- সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য- সামাজিক সংহতি।
- R. N. Gilchrist says, 'Society is compared to a number of individuals living together and entering into a relationship with one another'.
- অধ্যাপক গিডিংস বলেন, 'নিজেদের ঐক্য সম্পর্কে সচেতন সমমনোভাবাপন্ন কিছু সংখ্যক ব্যক্তি যখন কোন সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মিলিত হয় ও মনের ভাব আদান-প্রদান করে তাকে সমাজ বলে।
- অধ্যাপক ম্যাক আইভার (Mac Iver) বলেন, 'সমাজ হলো সামাজিক সম্পর্কের সামগ্রিক ব্যবস্থা' ("Society is the whole system of social relationships")
- এরিস্টটল বলেছেন- “মানুষ স্বভাবতই সামাজিক ও **রাজনৈতিক** জীব এবং যে সমাজে বসবাস করে না, সে হয় দেবতা না হয় পশু।”

সমাজ বলতে বোঝায় একদল মানুষের বসবাস, যারা পারস্পরিক সম্পর্ক, ঐতিহ্য, প্রথা, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা আবদ্ধ থাকে এবং যাদের মধ্যে একটি সাধারণ জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকে।

সমাজের বৈশিষ্ট্য নিম্নলিখিত উপাদানগুলো-

১. সংঘবদ্ধ জনসমষ্টি;
২. সাধারণ উদ্দেশ্য;
৩. উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জনসমষ্টির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, এবং
৪. সামাজিক বৈশিষ্ট্যের বন্ধন।

রাষ্ট্র ও সমাজ (Society and State)

সম্পর্ক (Relation):

- উভয়ের উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করা।
- রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক আচরণের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধানের তৎপর হয়। সমাজ মানুষের প্রথাভিত্তিক রীতি নীতি বা আচার আচরণের উপর যৌক্তিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে সুন্দর জীবন গড়ে তোলে।
- মানুষ প্রথমে সমাজে বসবাস করে, সেখান থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি। রাষ্ট্র সমাজের একটি অংশ মাত্র।
- রাষ্ট্রের সহযোগিতা ছাড়া সমাজ অচল, আবার সমাজের সহযোগিতা ছাড়া রাষ্ট্র চলতে পারেনা। রাষ্ট্র যেমন সামাজিক বিধিবিধানের উপর প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে সমাজও তেমনি রাষ্ট্রীয় আইনের উপর প্রচলিত প্রথা বা রীতিনীতির মাধ্যমে প্রভাব বিস্তার করে।
- রাষ্ট্র আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে যা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখে।

পার্থক্য (Difference):

- রাষ্ট্র একটি স্থায়ী ও আনুষ্ঠানিক কিন্তু সমাজ পরিবর্তনশীল ও অনানুষ্ঠানিক।
- রাষ্ট্র নির্দিষ্ট ভূখন্ড, জনগণ, সরকার ও সার্বভৌমত্বের মাধ্যমে গঠিত রাজনৈতিক সংগঠন। মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রয়োজন, সংস্কৃতি ও ঐক্যের ভিত্তিতে গঠিত সামাজিক সংগঠন।
- রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা আছে কিন্তু সমাজ নিজস্ব প্রথা, রীতি ও নৈতিক বিধি অনুসরণ করে।
- রাষ্ট্র আইন ও রাজনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে গঠিত সমাজ প্রাকৃতিকভাবে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে বিকশিত।
- রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে, সমাজের নেই।

নাগরিকত্ব (Citizenship)

২৫০০ বছর পূর্বে গ্রিসে নাগরিক ও নাগরিকতা ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে যারা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতো অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করতো তাদের নাগরিক বলা হতো। সাধারণত পুরুষদের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিলো। দাস, নারী ও বিদেশীদের রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না।

- নাগরিক হল ব্যক্তির পরিচয়। যেমন-আমাদের পরিচয় আমরা বাংলাদেশের নাগরিক।
- রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পেয়ে থাকে তাকে নাগরিকতা বলে।
- নাগরিকদের মৌলিক দায়িত্ব - রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলা।

যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে, রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করে এবং রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করে তাকে ঐ দেশের নাগরিক বলে।

- নাগরিকত্ব সম্পর্কে এরিস্টটল তার "The Politics" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে নাগরিক সম্পর্কিত মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রে বসবাসকারী সব জনগণ নাগরিক নয়। আইন প্রণয়ন, বিচারবিষয়ক কিংবা প্রশাসনিক কার্যে যারা সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম কেবল তারাই রাষ্ট্রের নাগরিক।

Ways to acquire citizenship:***

- জন্মসূত্রে: ২ ভাবে-
-ভূমিসূত্রে (Jus soli) যে দেশে জন্ম সে দেশের নাগরিক;
-রক্তসূত্রে (Jus sanguinis)- পিতা -মাতার নাগরিকত্ব অনুযায়ী।
- অনুমোদনসূত্রে: কতগুলো শর্ত পালনের মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নাগরিক অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জন করলে তাকে অনুমোদন সূত্রে নাগরিক বলা হয়। যেমন- ১) সেই রাষ্ট্রের নাগরিককে বিয়ে করা, ২) সরকারি চাকরি করা, ৩) সততার পরিচয় দেওয়া, ৪) সে দেশের ভাষা জানা, ৫) সম্পত্তি ক্রয় করা, ৬) দীর্ঘদিন বসবাস করা, ৭) সেনাবাহিনীতে যোগদান করা ৮) দত্তক গ্রহণ। রাষ্ট্রভেদে এসব শর্ত ভিন্ন হতে পারে।

দ্বৈত নাগরিকতা**

একজন ব্যক্তির একই সঙ্গে দুটি রাষ্ট্রের নাগরিকতা অর্জনকে দ্বৈত নাগরিকতা বলে। জন্মসূত্রে নাগরিকতা অর্জনের দুটি নীতি থাকায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকতা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- বাংলাদেশ নাগরিকতা নির্ধারণে জন্মনীতি অনুসরণ করে, অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জন্মনীতি ও জন্মস্থান উভয় নীতি অনুসরণ করে। তবে পূর্ণবয়স্ক হলে তাকে যেকোনো একটি রাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে।

সুনাগরিকের গুণাবলী**

সুনাগরিকের প্রধানত তিনটি গুণ রয়েছে। যথা-

১। বুদ্ধি, ২। বিবেক ও ৩। আত্মসংযম।

নাগরিক অধিকার (Rights of Citizen)**

নাগরিক অধিকার মূলত দু'প্রকার। নৈতিক ও আইনগত অধিকার।

নৈতিক অধিকারঃ নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে জন্ম। ভিক্ষকের ভিক্ষা প্রাপ্তি, ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা।

আইনগত অধিকারঃ আইনগত অধিকারকে আবার কয়েকভাগে ভাগ করা যায়। যথা- সামাজিক অধিকার-জীবন ধারণ, সম্পত্তি ভোগ, পরিবার গঠন।

রাজনৈতিক অধিকার-স্থায়ীভাবে বসবাস, সরকারি চাকরি লাভ, ভোট প্রদান।

অর্থনৈতিক অধিকার-কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও অবকাশ লাভের অধিকার।

নাগরিক কর্তব্য (Duties of Citizen):***

অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিকরা যেসব দায়িত্ব পালন করে, তাকে কর্তব্য বলে। নাগরিকের কর্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-ক। নৈতিক কর্তব্য ও খ। আইনগত কর্তব্য।

নৈতিক কর্তব্যঃ নৈতিক কর্তব্য মানুষের বিবেক এবং সামাজিক নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে আসে। যেমন-

নিজে শিক্ষিত হওয়া এবং সন্তানদের শিক্ষিত করা,

-সততার সাথে ভোট দান,

- রাষ্ট্রের সেবা করা

-বিশ্বমানবতার সাহায্যে এগিয়ে আসা।

আইনগত কর্তব্যঃ রাষ্ট্রের আইন দ্বারা আরোপিত কর্তব্যকে আইনগত কর্তব্য বলে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, আইন মান্য ও কর প্রদান করা নাগরিকের আইনগত কর্তব্য।

- রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য,
- আইন মেনে চলা,
- নিয়মিত কর প্রদান করা,
- সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ,
- সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া,
- পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য।

আইন (Law)

আইন(ইংরেজি Law) শব্দটি ফারসি ভাষা থেকে এসেছে। 'Law' শব্দটি টিউটনিক শব্দ 'Lag' থেকে এসেছে যার অর্থ স্থির, অপরিবর্তনীয়, সর্বক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। এদিক থেকে আইন বলতে ওইসব নিয়মকানুনকে বুঝায় যা সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য।

- অধ্যাপক হল্যান্ড বলেন, 'আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের কতকগুলো নিয়ম, যা সার্বভৌম শাসক কর্তৃক সৃষ্টি হয়েছে'।
- সর্বজন গৃহীত সংজ্ঞা দেন উড্রো উইলসন।

- Aristotle says, 'Law is the passionless reason' (আইন হচ্ছে আবেগহীন যুক্তি)। অ্যারিস্টটল আইন প্রসঙ্গে আরও বলেন, "আইনের শাসন যেকোন ব্যক্তি শাসনের চেয়ে ভালো।"
- John Austin says, 'Law is the command of the sovereign' (সার্বভৌম শক্তির আদেশই হলো আইন)**
- জন লক বলেন- যেখানে আইন নেই, সেখানে স্বাধীনতা থাকতে পারে না।***

আইন বলতে এমন আদেশ বা বিধিবিধান যা মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণে সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ তথা রাষ্ট্র অনুমোদন করে।

- আইন স্বাধীনতার রক্ষাকবজ।
- আইনের সবচেয়ে বড় উৎস এবং আনুষ্ঠানিক উৎস- সংবিধান।

□ আইনের উৎস (Sources of law)***

আইনের উৎস	বিস্তারিত
প্রথা	সুদীর্ঘ কাল ধরে সমাজে কোন নিয়ম থাকলে তাকে প্রথা বলে। রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর প্রথা রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করলে আইনে পরিণত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের অধিকাংশ আইন প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।
ধর্ম	একজন শাসকের হাতে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষমতা থাকলে সে ব্যক্তি রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ করেন। মধ্যযুগে ধর্মকে কেন্দ্র করে আইন প্রণীত হতো (বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীস ও রোমে)। বর্তমানে হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ, সামাজিক সম্পর্ক ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন।
বিচারকের রায়	বিচারকগণ যখন কোন মামলার বিচার করেন তখন সে মামলার জন্য প্রচলিত যদি আইন অস্পষ্ট থাকে, তাহলে বিচারকগণ নিজস্ব বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে রায় দেন। পরবর্তীতে ওইরূপ মামলার রায় একইরূপে দেয়া হয় পরবর্তীতে তা আইনে পরিণত হয়।
বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা	আইন সম্পর্কে বিভিন্ন আইনবিদ ও পণ্ডিত ব্যক্তিগণ বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিচারকগণ বিচার করতে গিয়ে আইনসংক্রান্ত কোন সমস্যায় পড়লে তা মীমাংসার জন্য এসব পুস্তকের বিধান গ্রহণ করেন এবং তা আইনে পরিণত হয়।
ন্যায়বোধ	কোন মামলার বিবাদ মীমাংসার জন্য কোন আইন না থাকলে বিচারকগণ তাদের ন্যায়বোধ দিয়ে তা মীমাংসা করেন। পরবর্তীতে তা আইনে পরিণত হয়।
আইনসভা	বর্তমান যুগে আইনসভা চাহিদা অনুযায়ী মানুষের জন্য নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করে এবং পুরাতন আইন সংশোধন বা বাতিল করে।
জনমত	আইনসভার সদস্যগণ জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন বিধায় জনমতের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেন।
প্রশাসনিক ঘোষণা	আইনসভার কাজের পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় শাসন বিভাগ কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ করে যা পরবর্তীতে আইনে পরিণত হয়।
বৈদেশিক চুক্তি	বিভিন্ন দেশ বৈদেশিক চুক্তি হওয়ার পর আইনসভার মাধ্যমে অনুমোদন করে আইনে পরিণত করে।

আইনের প্রকারভেদ

সাধারণত আইনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ১। সরকারি আইন, ২। বেসরকারি আইন ও ৩। আন্তর্জাতিক আইন।

আন্তর্জাতিক আইনের উৎস:

অধ্যাপক গেটেল (R.G. Gettell) আন্তর্জাতিক আইনের তিনটি উৎসের কথা বলেছেন। যথা- (ক) en (Custom); (খ) যুক্তি (Reason); (গ) সম্মতি (Consent)।

অধ্যাপক পালমার ও পাকিনসও (Palmer & Perkins) আন্তর্জাতিক আইনের তিনটি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন।

যথা- (১) সন্ধি (Treaty), (২) সাতমা (Custom) এবং (৩) আইনের সাধারণ ও সর্বজনীন নীতিসমূহ (General Principles of Law)। আন্তর্জাতিক আইন কোনো বিশেষ আইনসভা কর্তৃক রচিত হয় না।

নাগরিক জীবনে আইনের শাসন**

আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে কেউ আইনের উপরে নয়, সবাই আইনের অধীন এবং আইনের চোখে সবাই সমান। আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিকের সমান অধিকার প্রাপ্তির সুযোগকে আইনের শাসন বলে। সবার উপরে আইন- এর অর্থ আইনের প্রাধান্য। আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান-এর অর্থ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ -লিঙ্গ-পেশা নির্বিশেষে আইনের সমান আশ্রয় লাভ করা। এর ফলে ধনী-দরিদ্র, সবল-দুর্বল সকলে সমান অধিকার লাভ করে।

A. V. Dicey আইনের শাসন নিয়ে বলেন-

- স্বৈরীক্ষমতার অনুপস্থিতি
- আইনের চোখে সমতা
- নাগরিক অধিকার

আইন মানার কারণ (Reason for obeying law)

- শান্তির ভয়
- শ্রদ্ধাঃ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও জননেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকে
- নির্লিপ্ততাঃ রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণে নিষ্ক্রিয়তার জন্য অধিকাংশ মানুষ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের প্রণীত আইন মান্য করে।
- সহানুভূতিঃ সাধারণ মানুষের আচার-আচরণের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে একে অপরকে অনুসরণ করে আইন মান্য করে।
- উপযোগিতার উপলব্ধিঃ আইন আছে বলে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় আছে এবং মানবকল্যাণ সাধিত হচ্ছে।
- ব্যক্তিগত বিকাশঃ আইনের উপস্থিতির কারণে ব্যক্তিস্বাধীনতায় কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারেনা।
- ধর্মীয় ও নৈতিক কারণঃ সমাজের আইন ধর্মীয় ও নৈতিক দিক দ্বারা পরীক্ষিত।
- প্রয়োজনীয়তাবোধঃ মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষার্থে আইন মেনে চলে।
- নিরাপত্তার জন্যঃ সমাজে জনমালের নিরাপত্তার জন্য আইন মেনে চলে।
- অভ্যাসবশতঃ প্রচলিত আইনের মধ্যে বড় অসঙ্গতি না থাকলে মানুষ আইনের বিরোধিতা করে না।

আইনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of law)

অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইন ২ প্রকার।***

আইন— ক. জাতীয় আইন

খ. আন্তর্জাতিক আইন

এবং অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে, আইনের উৎস মোট ৬টি। এগুলো হলো:***

- আইন বিধি (Legislation)
- বিচার বিভাগের রায় (Judicial Decisions)
- আইনি রীতিনীতির সূত্র (Customary Law)
- প্রশাসনিক নির্দেশনা (Administrative Regulations)
- চুক্তি (Contracts)
- আন্তর্জাতিক আইন (International Law)

বিভিন্ন আইন

সাংবিধানিক আইন (Constitutional law) রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় এ আইন।

আইন শাসন ও বিচার বিভাগের মধ্যকার ক্ষমতা বণ্টন করে।

সাধারণভাবে প্রণীত আইন (Statue): দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ প্রয়োজনে আইন পরিষদ সাধারণভাবে এ আইন প্রণয়ন করে।

দেওয়ানি আইন (Civil law) ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত অধিকার, চুক্তি, সম্পত্তি ও পারিবারিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে।

ফৌজদারি আইন (Criminal law) এ আইন অপরাধ ও শাস্তি নির্ধারণ করে। এ আইনের উদ্দেশ্য সমাজে শৃংখলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, অপরাধ দমন করা ও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া।

সাধারণ আইন (Common law): প্রথাভিত্তিক সাধারণ নিয়মাবলিকে সাধারণ আইন বলে। এরূপ আইন আদালতের সিদ্ধান্ত থেকে গ্রহণ করা হয়।

অধ্যাদেশ (Ordinance): জরুরি প্রয়োজনে শাসন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশনা হলো অধ্যাদেশ। আইন পরিষদের অনুমোদন সাপেক্ষে এ অধ্যাদেশ আইনে পরিণত হয়।

শাসন বিভাগীয় আইন (Administrative law): প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য নির্বাহী বিভাগ যে নীতিমালা প্রণয়ন করে তা এ আইনের আওতায় পড়ে।

আন্তর্জাতিক আইন (International law): একদেশের সাথে অন্যদেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তি, দলিল, ঘোষণার মাধ্যমে এসব আইন প্রণীত হয়।

আইন ও নৈতিকতা

আইন হলো রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃত ও অনুমোদনকৃত নিয়ম-কানুন আর নৈতিকতা হলো সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধভিত্তিক আচরণবিধি।

আইন সার্বজনীন যা সমাজের সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নৈতিকতা ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যক্তিভেদে নৈতিকতার তারতম্য ঘটে।

আইন ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়। নৈতিকতা বিসর্জন দিলে সামাজিকভাবে হয়ে প্রতিপন্ন হতে হয়।

আইন সুস্পষ্ট ও সুনিশ্চিত। নৈতিকতা অস্পষ্ট যা সরকার কর্তৃক গৃহীত ও অনুমোদিত নয়।

আইন মানুষের বাহ্যিক আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। নৈতিকতা মানুষের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

রাষ্ট্রীয় আইনের পিছনে সার্বভৌম শক্তির সমর্থন থাকে। কিন্তু নৈতিক বিধানের পিছনে এ রকম শক্তির সমর্থন নেই।

সার্বভৌমত্ব***

উইলোবি বলেন- “সার্বভৌম রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা”

ব্লাকস্টোন বলেন- “সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চরম, অপ্রতিরোধ্য, শর্তহীন কর্তৃত্ব।”

জ্যাঁ বোডিন এর মতে- “Sovereignty is Supreme power over citizens and subjects, unrestrained by law.”

- আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রবক্তা- অস্টিন
- রুশো বলেন- Voice of the people is the voice of the God.
- রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায় নিজ দেশের শাসনে সর্বোচ্চ ক্ষমতা।
- বহিঃসার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায় অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের স্বাধীনতা।
- সার্বভৌমত্বের দুটি দিক- অভ্যন্তরীণ, বাহ্যিক।
- সার্বভৌমত্বের দুটি মতবাদ বিদ্যমান- একত্ববাদী, বহুত্ববাদী।
- একত্ববাদের মূল কথা হলো সার্বভৌমত্ব চরম, অবাধ, অসং একক এবং অবিভাজ্য। এই মতবাদে সার্বভৌমত্বের কেন্দ্রীকরণ এবং রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতার কথা বলা হয়।
- সার্বভৌমত্বের বহুত্ববাদী মতবাদের মূল কথা হলো সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো একক ব্যক্তির হাতে নিয়োজিত না থেকে তা রাষ্ট্রাভ্যন্তরে বিভিন্ন সংঘের হাতে নিয়োজিত থাকবে।

অস্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব**

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আইনগত মতবাদের নাম একত্ববাদ। একত্ববাদীদের মতে, সার্বভৌমত্ব হচ্ছে অবাধ, অসীম ও অবিভাজ্য ক্ষমতা। একত্ববাদ বা আইনগত সার্বভৌমত্বের প্রধান প্রবক্তা হলেন বিখ্যাত ইংরেজ আইনবিদ জন অস্টিন। ১৮৩২ সালে প্রকাশিত 'আইনশ্যলের উপর বক্তৃতামালা' নামক গ্রন্থে তিনি আইনগত সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন।

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে জন অস্টিন বলেছেন, "যদি কোন নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি অপর কোন উর্ধ্বতনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করে, সে সমাজের বেশিরভাগ লোকের স্বভাবজাত আনুগত্য লাভ করে, তখন সে নির্দিষ্ট উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সে সমাজের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী এবং উক্ত সমাজ একটি রাজনৈতিক ও স্বাধীন সমাজ।"

অস্টিনের সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য

-চরম ও অসীম

-অবিভাজ্য

-সর্বজনীন

-আইনের ব্যবহার- অস্টিনের মতে সার্বভৌমত্বের আদেশই আইন। **

-চূড়ান্ত ক্ষমতা

সংবিধান (Constitution)

সংবিধান হলো একটি রাষ্ট্রের মৌলিক আইন ও নিয়মকানুন সংবলিত একটি দলিল, যা রাষ্ট্র পরিচালনা, ক্ষমতা বন্টন, জনগণের অধিকার ও কর্তব্য এবং সরকারের কাঠামো নির্ধারণ করে।

- Aristotle says, 'The Constitution is the way of life that the state has chosen for itself.'
- Lord Bryce says, 'Constitution is the aggregate laws and customs under which the life of the state goes on'.
- অধ্যাপক লুইস বলেন, 'সংবিধান হল জনগণের নিকট ক্ষমতা বন্টন অথবা সরকার পদ্ধতি নির্ধারণ'।

সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মূল দলিল যার মাধ্যমে সরকারের ক্ষমতা নির্ধারিত হয়, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন হয়, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ করে এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখে।

- সর্ববৃহৎ লিখিত সংবিধান- ভারতের
- সবচেয়ে ক্ষুদ্র লিখিত সংবিধান- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের।
- অলিখিত সংবিধান হয়- ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে
- সপরিবর্তনীয় সংবিধানের উত্তম উদাহরণ- ইংল্যান্ড।

উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

- সংক্ষিপ্ত কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার সকল বিষয় লিপিবদ্ধ এবং মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত।
- সংবিধানের ধারা স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হবে
- বিভিন্ন ধারা, উপধারা সংক্ষিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়
- সাংবিধানিক কাঠামোর স্থায়ীত্ব
- সংবিধানে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা
- লিখিত
- বিভিন্ন বিভাগ এবং সরকার ও জনগণের মাঝে ভারসাম্য বিরাজমান
- জনমতের প্রতিফলন
- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- সুপরিবর্তনীয় হবে না, আবার দুস্পরিবর্তনীয় হবে না এর মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে হবে।

সংবিধানের উৎস (Sources of Constitution)

প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার প্রথাঃ অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত রীতিনীতি ও আচার প্রথা রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন ও স্বীকৃতি লাভ করলে সেগুলো সাংবিধানিক রীতিনীতি হিসেবে গণ্য হয়।

মৌলিক দলিলঃ ১৭৮৭ সালে জর্জ ওয়াশিংটনের সভাপতিত্বে ফিলাডেলফিয়ায় আমেরিকার সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে সম্মেলন হয়, তার প্রস্তাবের ভিত্তিতে আমেরিকার সংবিধানের মৌলিক ধারাগুলো দলিল হিসেবে লিখিত হয়।

বিধিবদ্ধ আইনঃ বিধিবদ্ধ আইন হচ্ছে আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন যা পরিবর্তন করা যায়। ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালে প্রণীত পার্লামেন্ট আইন ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস বলে বিবেচিত।

সনদঃ নাগরিক অধিকার রক্ষা ও রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য গৃহীত সনদ সংবিধানের উৎস। যেমন-১২১৫ সালের ম্যাগনাকার্টা, ১৬৮৯ সালের অধিকার বিল।

বিচারকের রায়ঃ বিচার বিভাগ জটিল কোন মামলার নিষ্পত্তির ব্যাপারে তাদের সুচিন্তিত রায় প্রদান করেন যা সংবিধানের ধারা বা উপধারা হিসেবে সংযোজিত হয়।

প্রামাণ্য পুস্তকঃ ওয়াল্টার বেজহটের The English Constitution, ডাইসির Law of the Constitution.

পার্লিমেণ্ট আইনঃ আইনসভা সংবিধান সংক্রান্ত আইন ও সংশোধনগুলো সংবিধানের অংশ।

গণপরিষদঃ বাংলাদেশের গণপরিষদ সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য খসড়া সংবিধান কমিটি।

সন্ধি ও চুক্তিঃ ১৬২৮ সালের 'The Petition of Rights', ১৬৮৯ সালের 'The Bill of Rights ১৭০০ সালের 'The Act of Settlement'.

সাধারণ আইনঃ ব্রিটিশ সংবিধানে সাধারণ আইন সংবিধানের অংশ যা দীর্ঘদিন ধরে প্রথা বা আচার ছিলো।

সংবিধান প্রণয়ন পদ্ধতি (Methods of establishing constitution)****

অধ্যাপক গেটেল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ৪টি পদ্ধতি উল্লেখ করেছেন। যথা- অনুমোদন, গণপরিষদ, বিবর্তন ও বিপ্লব।

অনুমোদন (Ratification): জনমতের চাপে বা বিপ্লবের ভয়ে রাজা বা শাসকগোষ্ঠী একটি বিধিবদ্ধ দলিলের মাধ্যমে নিজ দেশের সংবিধান ঘোষণা করেন। ১৭৯৯ সালে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন, ১৯০৫ সালে রাশিয়ার জার নিকোলাস।

গণপরিষদ (Constituent assembly): সংবিধান প্রণয়নের জন্য গণপরিষদ গঠিত হয়, এর সদস্যগণের ভোটে অনুমোদিত হলে সংবিধান গৃহীত হয়। **বাংলাদেশের সংবিধান।**

বিবর্তন (Evolution): প্রচলিত রাজনৈতিক রীতিনীতি ঐতিহাসিক ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে সংবিধান তৈরি হয়। ব্রিটেনের সংবিধান।

বিপ্লব (Revolution): নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে যখন সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব হয়না তখন জনগণ বিপ্লবের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাত করে নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় এ পদ্ধতিতে সংবিধান প্রণীত হয়েছিল।

সংবিধানের শ্রেণিবিভাগ (Classification of constitution)

সংবিধান মূলত দুই প্রকার লিখিত ও অলিখিত সংবিধান।

লিখিত সংবিধান (Written constitution): একটি রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনার মৌলিক নিয়ম-কানুন যখন এক বা একাধিক দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান। এছাড়া বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, ফ্রান্সের সংবিধান লিখিত।

অলিখিত সংবিধান (Unwritten constitution): অলিখিত সংবিধান বলতে কোন দলিলে সন্নিবেশিত না থাকলেও প্রচলিত প্রথা, দেশাচার, রীতিনীতি ও বিচারিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে গড়ে উঠে যা লিখিত সংবিধানের মত সরকার নিয়ন্ত্রণ করে। ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত।

সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দু'প্রকার। যথা- সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান:

সুপরিবর্তনীয় সংবিধান (Flexible constitution): এই ধরনের সংবিধানে খুব সহজেই পরিবর্তন আনা যায়। যেমন সাধারণ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। ব্রিটেন ও নিউজিল্যান্ডের সংবিধান।

দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Rigid constitution): এই ধরনের সংবিধানে পরিবর্তন আনতে হলে বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন হয় যা সাধারণ আইনের চেয়ে কঠিন। আমেরিকার সংবিধান।

ক্ষমতা বন্টনের পদ্ধতি অনুযায়ী আবার সংবিধানকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন:

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান (Unitary and federal constitution): একটি রাষ্ট্রে একটি কেন্দ্রীয় সরকার থাকলে তাকে এককেন্দ্রিক সংবিধান। যেমন বাংলাদেশের সংবিধান। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার থাকলে যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান বলা হয়। যেমন- ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান।

সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত সংবিধান (Parliamentary and presidential constitution): যেখানে আইনসভা (সংসদ) বেশি শক্তিশালী ও মন্ত্রিপরিষদ আইনসভারও সদস্য সেটি সংসদীয় সংবিধান। যেমন-বাংলাদেশের সংবিধান। এবং যেখানে রাষ্ট্রপতি বেশি শক্তিশালী সেটি রাষ্ট্রপতি শাসিত সংবিধান। আমেরিকার সংবিধান।

জনগণের অংশগ্রহণের নীতি অনুযায়ী আবার দু'প্রকার। যেমন- গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী সংবিধান।

গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী সংবিধান (Democratic and autocratic constitution): গণতান্ত্রিক সংবিধানে জনগণের অধিকার ও সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত, যেখানে স্বৈরাচারী সংবিধানে ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে।

- সংবিধান মূলত দুই প্রকার-লিখিত ও অলিখিত সংবিধান।
- সংশোধনের ভিত্তিতে সংবিধান দু'প্রকার। যথা- সুপরিবর্তনীয় ও দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান।
- ক্ষমতা বন্টনের পদ্ধতি অনুযায়ী আবার সংবিধানকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। এককেন্দ্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয়, সংসদীয় এবং রাষ্ট্রপতিশাসিত।
- জনগণের অংশগ্রহণের নীতি অনুযায়ী আবার দু'প্রকার। যেমন- গণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী সংবিধান।
- মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে দুই প্রকার- বুর্জোয়া শাসনপন্থ, শ্রমিক শ্রেণির শাসনতন্ত্র।

সাংবিধানিক সরকার:

সংবিধানের আইন মোতাবেক পরিচালিত সরকার। এটি গণতান্ত্রিক সরকার।

গণতন্ত্র (Democracy)

গণতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ Democracy, যা গ্রিক শব্দ 'Demos' এবং 'Kratos' বা 'Kratia' থেকে উদ্ভূত। 'Demos' অর্থ জনগণ এবং 'kratos' বা 'Kratia' অর্থ শাসন। শব্দগত অর্থে গণতন্ত্র হচ্ছে জনগণের শাসন।

খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কিছু গ্রীক নগর-রাজ্যে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়েছিল।

- বিশ্বের প্রথম গণতন্ত্র সৃষ্টি হয় গ্রিসের একটি শহর-রাষ্ট্র এথেন্সে।
- গণতন্ত্রের জনক বলা হয় এরিস্টটলকে। তবে আধুনিক গণতন্ত্রের জনক হলেন জন লক।**
- গণতান্ত্রিক শাসনে ব্যক্তি শাসনের পরিবর্তে আইনের শাসন প্রাধান্য পায়।

গণতন্ত্র হলো জনগণের শাসন যেখানে জনগণ তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে দেশ পরিচালনা করে। এটি এমন একটি শাসন ব্যবস্থা যেখানে জনগণের হাতেই ক্ষমতার মূল উৎস থাকে। গণতন্ত্রে জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা এবং মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞা

- Abraham Lincoln says, 'Democracy is a government of the people, by the people, and for the people' **
- Herodotus says, 'Democracy is a form of government where power resides with the people, contrasting it with monarchy and oligarchy'
- স্যার জন সীলী বলেন, 'গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা যেখানে সকলেরই অংশগ্রহণের সুযোগ আছে'।
- সি, এফ, স্ট্রং এর গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটি উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "যে শাসন ব্যবস্থা শাসিতের সক্রিয় সম্মতির উপর ভিত্তিহীন তাকে গণতন্ত্র বলে।"

- লোকি বলেন- গণতন্ত্র মুখের শাসন। ***

গণতন্ত্র হচ্ছে এমন এক ধরনের শাসন ব্যবস্থা যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের সরাসরি ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয় এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে।

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ****

- শাসন কাজে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে গণতন্ত্র দু'ধরনের-প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ গণতন্ত্র।
- শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গণতন্ত্রকে (ক) বুর্জো গণতন্ত্র (Bourgeois Democracy) বা উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy) এবং (খ) সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy)-এই দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy): জনগণ সরাসরি আইন প্রণয়ন, নীতি নির্ধারণ এবং সরকারের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করে। প্রাচীন গ্রীসের এথেন্স নগর-রাষ্ট্রে এই ধরনের গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। সুইজারল্যান্ডের পাঁচটি ক্যান্টন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইংল্যান্ড শহরে এখনো দেখা যায়।****

***প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি- গণভোট, গণউদ্যোগ, পদচ্যুতি, জনমত

(বাংলাদেশে ১৯৭৭, ১৯৮৫, ১৯৯১ সালে গণভোট হয়)

পরোক্ষ বা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র (Representative Democracy): জনগণ ভোট দিয়ে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে, যারা জনগণের পক্ষে আইন প্রণয়ন ও শাসনকার্য পরিচালনা করে। বর্তমান বিশ্বের বেশিরভাগ গণতান্ত্রিক দেশেই এই ধরনের গণতন্ত্র প্রচলিত। বাংলাদেশ, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরোক্ষ গণতন্ত্রের উদাহরণ। এর বৈশিষ্ট্যগুলো-

-পরোক্ষ অংশগ্রহণ

-নির্বাচন

-ভোটদান

-রাজনৈতিক দল

-নির্বাচিত আইনসভার প্রতিনিধি

-গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

উদারনৈতিক গণতন্ত্র সাম্য, মৈত্র, স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

গণতান্ত্রিক সরকার:***

গণতান্ত্রিক সরকার দু'ধরনের-

(ক) প্রজাতন্ত্র-। যে শাসনব্যবস্থা বা সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ধারিত হন তাকে প্রজাতন্ত্র বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ।

(খ) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র- যুক্তরাজ্য

গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Democracy)

- জনগণের সার্বভৌমত্ব: রাষ্ট্রের মালিক জনগণ এবং তারাই ক্ষমতার উৎস।
- আইনের শাসন: আইন সবার জন্য সমান এবং আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয়।
- রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা: জনগণ তাদের মতামত প্রকাশ, সংগঠন করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার রাখে।
- সংখ্যালঘুদের অধিকার রক্ষা: সংখ্যাগরিষ্ঠের পাশাপাশি সংখ্যালঘুদের অধিকারও এখানে সুরক্ষিত থাকে।
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: সরকার জনগণের কাছে তার কাজের জন্য দায়বদ্ধ থাকে এবং সবকিছু প্রকাশ থাকে।

- নিয়মিত নির্বাচন: জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয় এবং এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা: যেখানে জনগণ তাদের প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে, যারা তাদের পক্ষে নীতি নির্ধারণ ও আইন প্রণয়ন করে।
- নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা: নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে সরকার বাছাই ও পরিবর্তন হয়ে থাকে।
- প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার: জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে প্রতিনিধিগণ দেশ পরিচালনা করে।
- বহুদলীয় ব্যবস্থা: বিভিন্ন রাজনৈতিক দল তাদের দলীয় নীতি ও কর্মসূচির মাধ্যমে জনমসর্থনের চেষ্টা করে।

গণতন্ত্রের সফলতার শর্তাবলি (Conditions for the success of Democracy)

- গণতান্ত্রিক জনগণ: গণতান্ত্রিক চেতনা ও দৃষ্টিসম্পন্ন নাগরিকগণই গণতান্ত্রিক জনগণ হিসাবে বিবেচিত হন। গণতান্ত্রিক চেতনা জনগণকে শাসনকার্যে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করে।
- গণতান্ত্রিক পরিবেশ: মানুষের ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের উপযোগী পরিবেশই হল গণতান্ত্রিক পরিবেশ।
- গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা: গণতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ভিত্তিতেই জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চয়তা লাভ করে এবং ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক পরিপূর্ণ সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।
- পরমতসহিষ্ণুতা: গণতন্ত্রে জনগণের মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা একান্তভাবে কাম্য। এই শাসনব্যবস্থায় জনগণের বাক্য ও মতামত প্রকাশের পরিপূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ: ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে জনগণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়।
- উপযুক্ত নেতৃত্ব: রাষ্ট্রনেতাদের ন্যায়পরায়নতা, সততা, উদারচিত্ত, বিবেকবোধ প্রভৃতি গুণাবলী গণতন্ত্রের সাফল্যের প্রয়োজনীয় শর্ত হিসাবে গণ্য হয়।
- সৎ ও দক্ষ সরকারী কর্মচারী: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য সৎ, সুদক্ষ ও উৎসাহী সরকারী কর্মচারী আবশ্যিক।
- উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা: প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য জনগণের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন।
- লিখিত সংবিধান: সংবিধান লিখিত হলে জনসাধারণ সরকারের কর্তৃত্বের পরিধি এবং নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত থাকতে পারে। ফলে জনগণ সতর্ক থাকে এবং সরকার স্বৈরাচারী হতে পারে না।
- রাজনৈতিক দল: একটি শক্তিশালী ও সুসংহত বিরোধী দল থাকলে সরকার সব সময় সতর্ক থাকে, জনস্বার্থ সাধনে আত্মনিয়োগ করতে বাধ্য হয় এবং স্বৈরাচারী হতে পারে না।
- গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য: গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার স্বরূপ ও সার্থকতা সঠিকভাবে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য জনসাধারণকে সাহায্য করে। এই ঐতিহ্যই দেশবাসীকে গণতান্ত্রিক জনগণ হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।
- সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব: গণতন্ত্রকে সার্থক করে তোলার জন্য সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা থাকা দরকার।।

সরকারের শ্রেণিবিভাগ

এরিস্টটলের সরকারের শ্রেণিবিভাগ*****

সংখ্যা নীতি	উদ্দেশ্য নীতি	ব্যাখ্যা
একজনের শাসন	স্বাভাবিক সরকার	রাজতন্ত্র(Monarchy): এরিস্টটলের ধারণা অনুযায়ী রাজতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় শাসনক্ষমতা একব্যক্তির হাতে থাকে এবং সে ব্যক্তি জনগণের স্বার্থে বা কল্যাণার্থে ক্ষমতা পরিচালনা করে।
	বিকৃত সরকার	স্বৈরতন্ত্র(Tyranny): এরিস্টটল মনে করেন, স্বৈরতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় শাসক নিজের স্বার্থে ক্ষমতা পরিচালনা করে।
কয়েকজনের শাসন	স্বাভাবিক সরকার	অভিজাততন্ত্র(Aristocracy): এরিস্টটলের মতে, অভিজাততান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতা কয়েকজন ব্যক্তির হাতে থাকে এবং তারা জনগণের স্বার্থে বা কল্যাণার্থে ক্ষমতা পরিচালনা করে।
	বিকৃত সরকার	ধনিকতন্ত্র(Oligarchy): এরিস্টটলের ধনিকতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতা পরিচালনা করে।
বহুজনের শাসন	স্বাভাবিক সরকার	মধ্যতন্ত্র(Polity): এরিস্টটলের পলিটি বা মধ্যতন্ত্রে শাসনক্ষমতা বহুজনের হাতে থাকে এবং তারা জনগণের স্বার্থে ক্ষমতা পরিচালনা করে।
	বিকৃত সরকার	গণতন্ত্র(Democracy) এরিস্টটলের মতে, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থায় শাসকগণ নিজেদের স্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগ করে।

- এরিস্টটল 'Politics' গ্রন্থে সরকারকে ২টি নীতির ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করেছেন- সংখ্যা নীতি, লক্ষ্য/উদ্দেশ্য নীতি।
- সংখ্যানীতির ভিত্তিতে ৩ প্রকার- একজনের শাসন, কয়েকজনের শাসন, বহুজনের শাসন।
- উদ্দেশ্য নীতির ভিত্তিতে ২ প্রকার- স্বাভাবিক, বিকৃত।
- এরিস্টটল উদ্দেশ্য ও শাসকের সংখ্যার ভিত্তিতে ছয় ধরনের সরকারের শ্রেণিবিভাগ উল্লেখ করেছেন- (১) রাজতন্ত্র (২) অভিজাততন্ত্র ও (৩) পলিটি। এদের তিনটি বিকৃত রূপ হল: (১) স্বৈরতন্ত্র, (২) ধনিকতন্ত্র ও (৩) গণতন্ত্র -এই মোট ছয়টি।
- এরিস্টটলের মতে- পলিটি সর্বোত্তম, এবং গণতন্ত্র নিকৃষ্ট ধরনের সরকার**

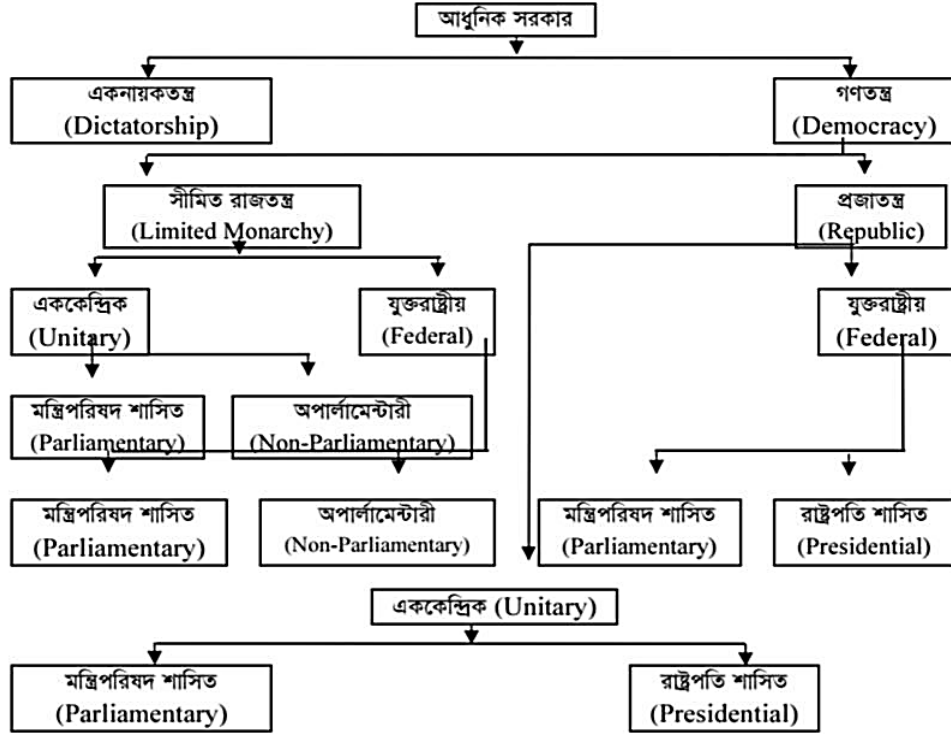
লিককের সরকারের শ্রেণিবিভাগ

লিককের শ্রেণিবিভাগকে বেশি আধুনিক হিসেবে গণ্য করা হয়।**** নিম্নে তার প্রদত্ত শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হলো-
প্রথমত, সার্বভৌম ক্ষমতার অবস্থানের ভিত্তিতে তিনি সরকারকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন-সার্বভৌম ক্ষমতা যখন জনগণের হাতে থাকে তখন তাকে গণতন্ত্র এবং যখন একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের হাতে থাকে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলেছেন লিকক।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতা ও নিয়োগ লাভের পদ্ধতির উপর গণতন্ত্রকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- যখন রাষ্ট্রপ্রধান উত্তরাধিকার সূত্রে এবং নামমাত্র প্রধান হিসেবে নিয়োগলাভ করেন তখন তাকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র আর যখন রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত হন তখন তাকে প্রজাতন্ত্র বলেছেন।

তৃতীয়ত, আঞ্চলিক ও ক্ষমতা বন্টনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- সংবিধানের মাধ্যমে সকল ক্ষমতা যখন কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে তখন তাকে এককেন্দ্রিক এবং যখন কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া হয় তখন তাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলেছেন।

চতুর্থত, আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকারকে তিনি আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন- শাসন বিভাগ যখন আইন বিভাগের নিকট দায়ী থেকে দায়িত্ব পালন করে তখন তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার এবং যখন আইন বিভাগের নিকট শাসন বিভাগ দায়ী থাকে না তখন তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলেছেন। লিঙ্ক কর্তৃক সরকারের শ্রেণিবিভাগের ছক নিম্নে দেওয়া হ'ল:



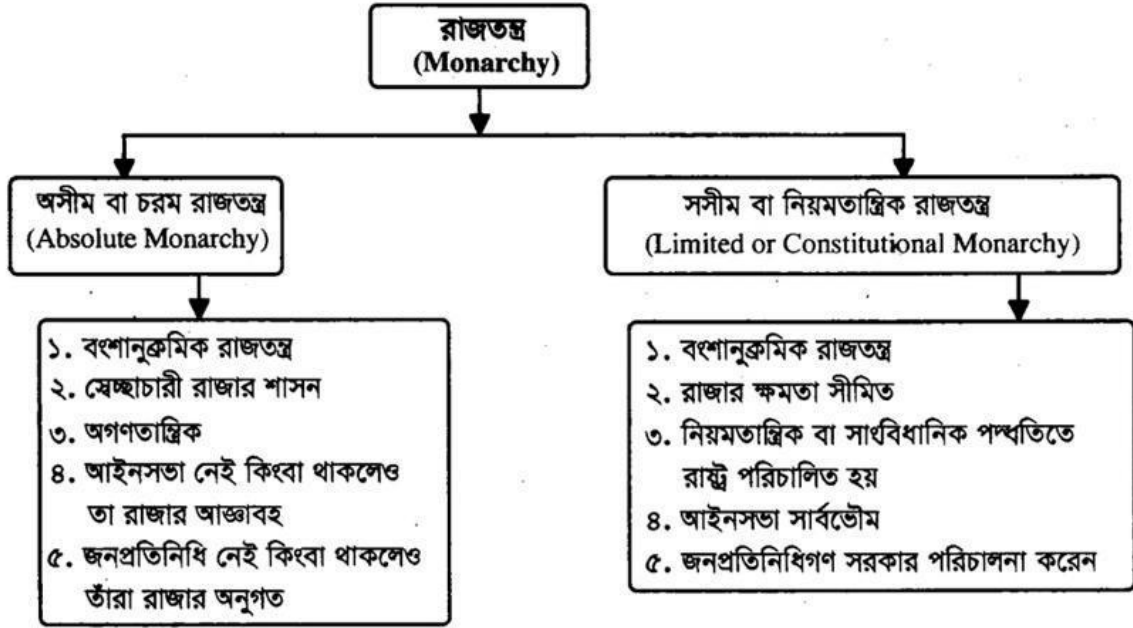
ম্যারিয়টের সরকারের শ্রেণিবিভাগ

- ক্ষমতার আধুনিক বন্টন বিচারে ম্যারিয়ট সরকারকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন।
 - ক. এককেন্দ্রিক
 - খ. যুক্তরাষ্ট্রীয়
- ম্যারিয়ট সংবিধান সংশোধনের ভিত্তিতে ২ ভাগে ভাগ করেছেন।
 - ক. সুপরিবর্তনীয়
 - খ. দুপরিবর্তনীয়
- রাষ্ট্রের আইনি ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে ম্যারিয়ট সরকারকে ৩ ভাগে ভাগ করেছেন।
 - ক. স্বৈরতান্ত্রিক (শাসন বিভাগকে প্রাধান্য দেয়)
 - খ. সংসদীয়
 - গ. রাষ্ট্রপতিশাসিত

রাজতান্ত্রিক সরকার:

- রাজা বা রানির হাতে রাষ্ট্রের চরম ও সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব ন্যস্ত থাকে
- রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে ক্ষমতা লাভ করেন।

- রাজা/রানির ইচ্ছাই ছিল চূড়ান্ত এবং মন্ত্রিগণ রাজার একান্ত অনুগত হলে এই রাজতন্ত্রকে বলা হয় চরম বা অসীম রাজতন্ত্র (Absolute or unlimited Monarchy)। বর্তমান সময়েও সৌদি আরবসহ কিছু কিছু দেশে এরূপ রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।
- রাজার ক্ষমতা সীমিত হলে এবং সাংবিধানিক পদ্ধতি রাষ্ট্র পরিচালিত হলে এরূপ রাজতন্ত্রকে বলা হয় 'সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র' (Limited or Constitutional Monarchy)। গ্রেট ব্রিটেনে সর্বপ্রথম এরূপ সসীম বা নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেন ছাড়াও জাপান, মালয়েশিয়া, প্রভৃতি দেশে এরূপ রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।



একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

একনায়কতন্ত্র হলো এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে একজন ব্যক্তি বা একটি ছোট দল নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ সীমিত থাকে। এই ব্যবস্থায়, একনায়ক বা একদলীয় সরকার তাদের নিজেদের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয় এবং জনগণের মতামতের খুব একটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

উদাহরণ:*** ফ্রান্সে স্পেনে, হিটলার জার্মানিতে, মুসোলিনী ইতালিতে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

- গণতন্ত্রের বিপরীত শাসন একনায়কতন্ত্র***

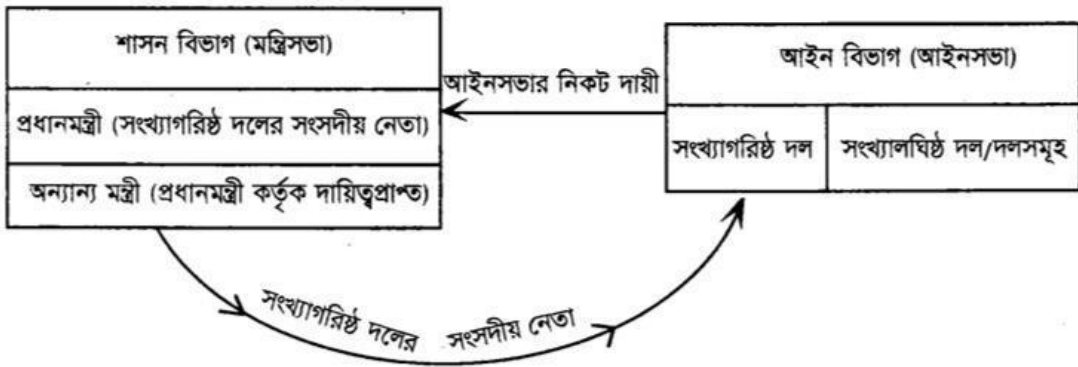
বৈশিষ্ট্য

- ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন: রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা একজন ব্যক্তির হাতে বা একটি দলের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকে।
- স্বেচ্ছাচারী শাসন: একনায়ক বা একদলীয় সরকার নিজেদের খেয়ালখুশি মতো দেশ পরিচালনা করে।
- বিরোধী মতের দমন: গণতন্ত্রের মতো এখানে ভিন্ন মত বা বিরোধিতা করার সুযোগ থাকে না এবং সরকার বিরোধীদের দমন করে।
- আইনের উর্ধ্বে: একনায়ক বা একদলীয় সরকার আইনের উর্ধ্বে থাকে এবং তাদের কাজের জন্য কারো কাছে জবাবদিহি করতে হয় না।
- একক বা একদলীয় শাসন: একনায়কতন্ত্রে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল থাকে অথবা একজন ব্যক্তি একাই শাসন করে।

মন্ত্রিপরিষদশাসিত/সংসদীয় সরকার (Parliamentary form of government)

- সংসদীয় সরকার হচ্ছে এমন এক ধরনের গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা যেখানে আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা মনোনীত ব্যক্তি সরকার প্রধান হন এবং তার নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। এই সরকার প্রধান আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন এবং আইনসভা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে সরকারের পতন হতে পারে।
- এ.ডি. ডাইসি (Av. Dicey)-এর মতে, মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার গড়ে ওঠে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের একত্রীকরণের ভিত্তিতে এবং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে।
- অধ্যাপক গার্নারের মতে, "সংসদীয় বা মন্ত্রিপরিষদ শাসিত শাসনব্যবস্থা এমন এক ধরনের শাসনব্যবস্থা, যেখানে প্রকৃত শামক বা মন্ত্রিপরিষদ আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব হয় ব্রিটেনে।
- বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে।
- আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সরকার প্রধান হন।
- সরকার প্রধান (প্রধানমন্ত্রী) আইনসভার কাছে দায়বদ্ধ থাকেন এবং তার কাজের জন্য সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়।
- রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান, প্রকৃত ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট।
- মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সাধারণত আইনসভার সদস্য ও আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।
- আইনসভা সরকারের কাজের তদারকি করে, প্রয়োজনে অনাস্থা প্রস্তাব এনে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় বিরোধী দল গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনায় সরকারকে সহায়তা করে এবং স্বৈরাচারী পথে বাধা সৃষ্টি করে।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা মূলত দলীয় শাসনব্যবস্থা।
- গ্রেট ব্রিটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, জাপানে প্রচলিত আছে।

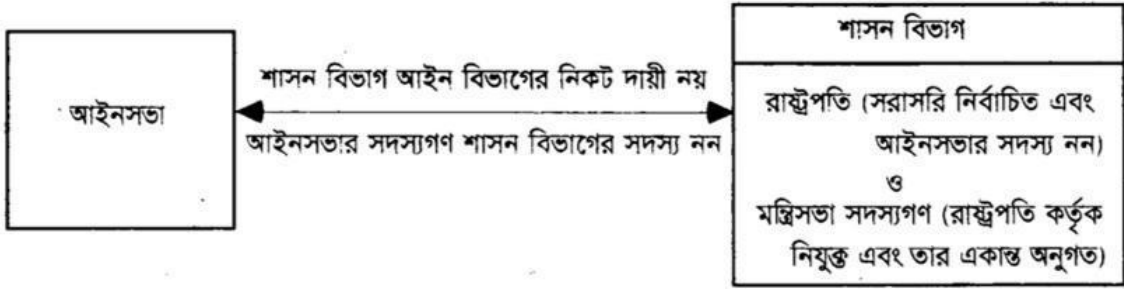
✓ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্ক



রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার (Presidential form of government)

- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা বলতে এমন শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকে এবং রাষ্ট্রপতি সাধারণত আইনসভার নিকট দায়ী থাকেনা; বরং তার দায়বদ্ধতা জনগণের নিকট।
- এই ব্যবস্থায় ক্ষমতার কিছুটা কেন্দ্রীকরণ দেখা যায়, কারণ রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী এবং তার হাতেই ক্ষমতার একটি বড় অংশ ন্যস্ত থাকে।
- মন্ত্রিসভা আইনসভার সদস্য নন।

- রাষ্ট্রপতি সাধারণত আইনসভার কাছে সরাসরিভাবে দায়ী থাকেন না।
- রাষ্ট্রপতি তার পছন্দের ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং তাদের কাজের জন্য তিনিই দায়ী থাকেন।
- আইনসভা থেকে নির্বাহী বিভাগ (সরকার) সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকে।
- রাষ্ট্রপতি একই সাথে রাষ্ট্রের প্রধান এবং সরকারের প্রধান হন।
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির কারণে সরকারের বিভাগসমূহ নিজ নিজ সীমায় স্বাধীন।
- রাষ্ট্রপতির সকল ক্ষমতার উৎস সংবিধান।
- সাধারণত **দ্বি-ক্ষমাবিশিষ্ট আইনসভা** থাকে। আইনসভা আইন প্রণয়নে স্বাধীন থাকে।
- আইনসভা রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাস করে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।
- যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিলে প্রচলিত আছে।



সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার (Parliamentary and Presidential form of government)***

- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার প্রধান (প্রধানমন্ত্রী) আইনসভার (যেমন সংসদ) কাছ থেকে ক্ষমতা লাভ করেন এবং আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন এবং আইনসভার কাছে সাধারণত দায়ী থাকেন না।
- সংসদীয় সরকারের প্রধানমন্ত্রী প্রথমে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং পরবর্তীতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের রাষ্ট্রপতি সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন।
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতিই সর্বসর্বা, প্রকৃত শাসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। অপরদিকে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান কিন্তু প্রধানমন্ত্রী হলেন প্রকৃত নির্বাহী প্রধান। তাঁর পতন ঘটলে গোটা মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা প্রকৃত শাসন কর্তৃপক্ষ। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ সরকারি নীতি ও কার্যাবলির জন্য একক ও যৌথভাবে আইনসভার নিকট দায়ী থাকেন।। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন বিধায় জনগণের নিকট দায়ী থাকেন।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভার নির্বাচিত সদস্য। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মন্ত্রিসভার সকল সদস্য আইনসভার সদস্য হবেন এমন কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। বরং রাষ্ট্রপতি ইচ্ছা করলে আইনসভার বাইরে থেকে পছন্দমতো ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় আইনসভা ও শাসন বিভাগ পৃথক সত্তা হিসেবে অবস্থান করে না। কারণ মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আইনসভারও সদস্য। সুতরাং এ অবস্থায় ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রয়োগ সম্ভব নয়। অন্যদিকে আইনসভা ও শাসন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতির উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।
- সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় তত্ত্বগতভাবে হলেও আইনসভার প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। কারণ এ ব্যবস্থায় আইনসভাকে সকল কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারে প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

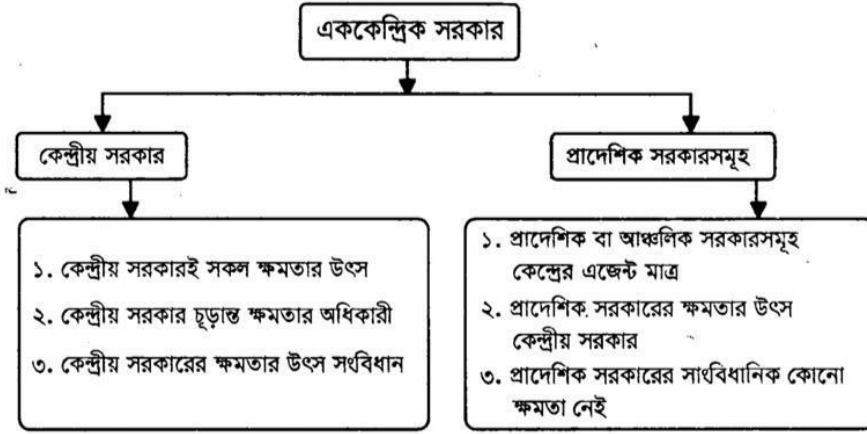
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা জরুরি অবস্থার উপযোগী। সাফল্যের সাথে আপদকালীন বা জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থা উপযোগী। কিন্তু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা উপযোগী নয়। কারণ যে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হলে এ ব্যবস্থায় আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন হয়।
- মন্ত্রিপরিষদ শাসিত ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ স্বেচ্ছাচারী হওয়ার সুযোগ পায় না। কারণ শাসন বিভাগকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আইনসভা ও জনগণের নিকট জবাবদিহিতা করতে হয়। কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী হয়ে উঠতে পারে।
- অধ্যাপক জে. ডব্লিউ গার্নার (Prof. J.W. Garner) বলেন, "যে শাসনব্যবস্থায় নির্বাহী বিভাগ তাদের কার্যকালের মেয়াদ এবং কার্যাবলির জন্য আইনসভার নিয়ন্ত্রণ থেকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ থাকে, তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।
- অধ্যাপক এফ. আর. সিলি (Prof. F.R. Seeley)-এর মতে, "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছায় পরিচালিত সরকার হলো রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার।"

রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার	মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
(১) যে সরকারব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রকৃতই শাসন বিভাগের প্রধান থাকে এবং তিনি জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন তাকে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার বলে।	(১) যে সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগের প্রকৃত ক্ষমতা মন্ত্রিপরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং মন্ত্রিপরিষদ তার সকল নীতি ও কাজের জন্য আইন পরিষদের নিকট দায়ী থাকে তাকে মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার বলে।
(২) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি প্রকৃত প্রধান।	(২) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি নামমাত্র রাষ্ট্রপতি।
(৩) এ সরকারব্যবস্থায় পার্লামেন্টের চেয়ে রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য বেশি স্বীকৃত হয়।	(৩) এ সরকারব্যবস্থায় পার্লামেন্টের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।
(৪) এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা তার কাজকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতি নিকট দায়ী থাকে।	(৪) এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা তার কাজকর্মের জন্য আইনসভার নিকট দায়ী থাকে।
(৫) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ কর্মচারী মাত্র।	(৫) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির আজ্ঞাবহ কর্মচারী নন।
(৬) এ সরকারব্যবস্থায় অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর কোনো ভূমিকাই থাকে না।	(৬) এ সরকারব্যবস্থায় প্রধামন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

(৭) এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীদের মধ্যে যৌথ দায়িত্বশীলতা পরিলক্ষিত হয় না।	(৭) এ সরকারব্যবস্থায় মন্ত্রীদের মধ্যে যৌথ দায়িত্বশীলতা পরিলক্ষিত হয়।
(৮) এ সরকারব্যবস্থায় জরুরি পরিস্থিতি দ্রুত আয়ত্তে আনয়ন সম্ভব হয়।	(৮) এ সরকারব্যবস্থায় জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।
(৯) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতার প্রাধান্য থাকে রাষ্ট্রপতির হাতে।	(৯) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় পার্লামেন্টের ক্ষমতার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।
(১০) এ সরকারব্যবস্থায় অনাস্থা প্রস্তাব প্রযোজ্য নয় বলে এর স্থায়িত্ব নিশ্চিত।	(১০) এ সরকারব্যবস্থায় স্থায়িত্ব অনিশ্চিত।
(১১) রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি আইন পরিষদ ভেঙে দিতে পারেন না।	(১১) এ সরকারব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী আইন পরিষদ ভেঙে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করলে রাষ্ট্রপ্রধান আইন পরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন।
(১২) এ সরকারব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য স্বীকৃত নাও হতে পারে।	(১২) এ সরকারব্যবস্থায় জনমতের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।
(১৩) এ সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কার্যকর হয়।	(১৩) এ সরকারব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি পরিলক্ষিত হয় না।
(১৪) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী এবং একনায়ক হয়ে পড়তে পারে।	(১৪) মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকারব্যবস্থায় শাসন বিভাগ স্বৈরাচারী হবার ভয় থাকে না।

এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary form of government)

- এককেন্দ্রিক সরকার হলো সেই সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। এই ব্যবস্থায় স্থানীয় সরকার বা অন্যান্য প্রশাসনিক ইউনিটগুলির ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছাধীন এবং তারা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ক্ষমতা পেয়ে থাকে। কেন্দ্রীয় সরকারই সকল ক্ষমতার উৎস ও নিয়ন্ত্রক।
- সরকারের সকল ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে।
- স্থানীয় সরকারগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ এবং তাদের নিজস্ব কোনো স্বাধীন ক্ষমতা থাকে না।
- এই ধরনের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা সহজ হয়, কারণ ক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের হাতে থাকে।
- কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারে।
- বাংলাদেশ, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স ইত্যাদি দেশে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রচলিত।



যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Federal form of government)

- যুক্তরাষ্ট্র শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Federation' ল্যাটিন শব্দ 'Foedus' থেকে এসেছে যার অর্থ মিলন। শাব্দিক অর্থে কতকগুলো রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি বা মিলনের ফলে নতুন যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয় তাকে যুক্তরাষ্ট্র বলে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার হল এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ক্ষমতা ভাগ করে এবং এই ক্ষমতা বন্টন একটি লিখিত সংবিধানে উল্লেখ করা থাকে।
- কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা স্পষ্টভাবে সংবিধানে ভাগ করা থাকে।
- একটি লিখিত সংবিধানের মাধ্যমে সরকারের কাঠামো এবং ক্ষমতা বন্টন করা হয়।
- সাধারণত যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি দ্বি-কক্ষ আইনসভা থাকে, যেখানে একটি কক্ষ জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে এবং অন্য কক্ষটি রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করে।
- একটি স্বাধীন বিচার বিভাগ সাধারণত এই ধরনের সরকার ব্যবস্থায় বিদ্যমান থাকে, যা সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং প্রয়োগ নিশ্চিত করে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ভারত, জার্মানি ইত্যাদি দেশ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার উদাহরণ।

এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার (Unitary and Federal form of government) *

- এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে ক্ষমতা কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ভাগ করা থাকে।
- এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান লিখিত বা অলিখিত হতে পারে এবং এটি কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছানুযায়ী পরিবর্তন করা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধান সাধারণত লিখিত ও দুস্পরিবর্তনীয় হয়।
- এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় বিচার ব্যবস্থা থাকে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্র ও প্রদেশের জন্য পৃথক বিচার ব্যবস্থা থাকে।
- এককেন্দ্রিক সরকারে স্থানীয় সরকার কেন্দ্রের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে রাজ্য বা প্রদেশগুলি তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে যুক্ত হতে পারে।
- এককেন্দ্রিক সরকারে এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা থাকে।
- এককেন্দ্রিক সরকারে একক নাগরিকত্ব, যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে দ্বি- নাগরিকত্ব থাকে।
- এককেন্দ্রিক সরকারে স্থানীয় সরকারের স্বায়ত্তশাসন থাকেনা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন থাকে।

এককেন্দ্রিক সরকার	যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার
(১) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় মূলত এক ধরনের সরকারই বিদ্যমান থাকে এবং তা হলো কেন্দ্রীয় সরকার। এরূপ সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বাভাব্য থাকে না।	(১) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দুই প্রকার সরকারের অস্তিত্ব থাকে। যথা- কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্চলিক সরকার। এরূপ সরকারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার প্রায় স্বাধীনভাবে কাজ করে। সেখানে উভয় ধরনের সরকারের আলাদা আলাদা আইনসভা নিজ নিজ ইচ্ছানুযায়ী আইন প্রণয়ন করে।

(২) এককেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টিত হয় না। এরূপ শাসনব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার তার ইচ্ছানুযায়ী অন্যান্য সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে। আবার অর্পিত ক্ষমতা প্রত্যাহারও করে নিতে পারে।	(২) যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারগুলো মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়া হয়। এতে কোন সরকারের কি কি ক্ষমতা থাকবে তা সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এবং আঞ্চলিক অধিকারের সাথে জাতীয় ঐক্যের সমন্বয় সাধন করা হয়।
(৩) এককেন্দ্রিক সরকারে বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য না থাকলেও চলে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব বহাল থাকে। কারণ এ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।	(৩) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে বিচার বিভাগীয় প্রাধান্য অনস্বীকার্য। কেননা সেখানে এ বিভাগই কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা করে।

(৪) এককেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।	(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে সংবিধানের প্রাধান্য দেওয়া হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারব্যবস্থায় সংবিধানের ব্যাখ্যা এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।
(৫) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকদের কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়।	(৫) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে নাগরিকদের দুই ধরনের আনুগত্য প্রকাশ করতে হয়। এতে নাগরিকতা দুভাবে সুযোগ-সুবিধাও ভোগ করার সুযোগ পায়।
(৬) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় সংবিধান লিখিত বা অলিখিত, দুস্পরিবর্তনীয় বা সুপরিবর্তনীয়, যেকোনো রকমের হতে পারে।	(৬) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে আইনের সুস্পষ্টতা ও সুনির্দিষ্টতার জন্য সংবিধান অবশ্যই লিখিত হতে হবে।

(৭) এককেন্দ্রিক সরকারে আঞ্চলিক সরকারে কোনো স্বাধীনতা নেই।	(৭) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারে আঞ্চলিক সরকারগুলো স্ব-স্ব আওতায় স্বাধীন। কেন্দ্রীয় সরকার তাদের কার্যাবলিতে কোনো হস্তক্ষেপ করতে পারে না।
(৮) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রদেশে স্বাধীন আঞ্চলিক সরকার থাকে না বলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় থাকে।	(৮) যুক্তরাষ্ট্রে আইন ও কর্মপদ্ধতির সমতা রক্ষা করা কঠিন বলে জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।
(৯) এককেন্দ্রিক ব্যবস্থায় একটি মাত্র সরকার থাকে বলে যেকোনো জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় অধিক কার্যকর ভূমিকা রাখে।	(৯) সীমাবদ্ধ ক্ষমতার জন্য জরুরি অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম হয় না।
(১০) দুই ধরনের সরকারের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে বলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অত্যন্ত ব্যয়বহুল।	(১০) এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র সরকার বিদ্যমান থাকায় ব্যয় অত্যন্ত কম।

সর্বাঙ্গিকবাদী সরকার (Federal form of government)

- সর্বাঙ্গিকবাদী সরকার বলতে বোঝায় এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সরকার তার নাগরিকদের জীবনে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখতে চায় এবং তাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকারকে সীমিত করে। এই ধরনের সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা ব্যক্তির চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকার প্রায় সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে।
- একটি সর্বাঙ্গিকবাদী সরকার একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অধীনে থাকে, যেখানে ক্ষমতা মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের হাতে কুক্ষিগত থাকে।
- এই সরকার ব্যবস্থায় নাগরিকদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও অধিকার খুবই সীমিত থাকে অথবা প্রায় থাকেই না।
- সরকার সমাজের প্রায় সকল ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে, যেমন- অর্থনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, এবং ব্যক্তিগত জীবন।
- সর্বাঙ্গিকবাদী সরকার জনগণের সমর্থন লাভের জন্য ব্যাপক প্রচারণা ও প্রোপাগান্ডা ব্যবহার করে।
- এই ধরনের সরকার ব্যবস্থায় ভিন্ন মতাবলম্বীদের দমন করা হয় এবং ভয় ও আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হয়।
- উদাহরণঃ ইতালির ফ্যাসিবাদী সরকার এবং জার্মানির নাৎসি সরকার ছিল সর্বাঙ্গিকবাদী।

ফরাসি ধাঁচের সরকার ব্যবস্থা (French model government)*

- অর্ধ-রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত ও সংসদীয় ব্যবস্থার সমন্বয় যা ১৯৫৮ সালে পঞ্চম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে চালু হয়।
- ৪র্থ প্রজাতন্ত্রের রাজনৈতিক অস্থিরতা দূর করার জন্য প্রবর্তিত হয়।
- দ্বৈত নির্বাচনঃ রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রী সরকার প্রধান।
- রাষ্ট্রপতি- জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন (মেয়াদ ৫ বছর), প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ, জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দেয়া, গণভোট আহ্বানের ক্ষমতা, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ন্ত্রণ করেন।
- প্রধানমন্ত্রীঃ রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেন, জাতীয় পরিষদের সমর্থন সাপেক্ষে সরকারের অভ্যন্তরীণ নীতি ও দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য দায়ী এবং জাতীয় পরিষদের নিকট দায়বদ্ধ এবং অনাস্থা প্রস্তাবে অপসারিত হতে পারেন।
- আইনসভাঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট (জাতীয় পরিষদ ও সিনেট)
- জাতীয় পরিষদ- সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত, আইন প্রণয়ন ও সরকারি ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও সরকারকে নিন্দা করার ক্ষমতা রাখে ও প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারে।

- সিনেট- পরোক্ষভাবে নির্বাচিত, স্থানীয় প্রশাসনিক সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে।
- বিচারবিভাগঃ নির্বাহী ও আইনসভা থেকে স্বাধীন, সাংবিধানিক পরিষদ আইন সংবিধান সম্মত কিনা যাচাই করে, রাজ্য পরিষদ সরকারকে আইন বিষয়ে পরামর্শ দেয় ও সর্বোচ্চ প্রশাসনিক আদালত হিসেবে কাজ করে।
- প্রজাতন্ত্রবাদঃ জাতীয় পরিচয় ও নাগরিক ঐক্যের উপর জোর দেয় যাতে সকল নাগরিক আইনের চোখে সমান। ধর্মনিরপেক্ষতা নীতির লক্ষ্য ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে ধর্মীয় মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা
- সহাবস্থানঃ যখন রাষ্ট্রপতির দল জাতীয় পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ না হয় তখন বিরোধী দলের একজন প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হতে পারেন। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি শুধু পররাষ্ট্রনীতি দেখেন, প্রধানমন্ত্রী অভ্যন্তরীণ নীতি দেখেন।

ধর্মতান্ত্রিক সরকার/Theocracy

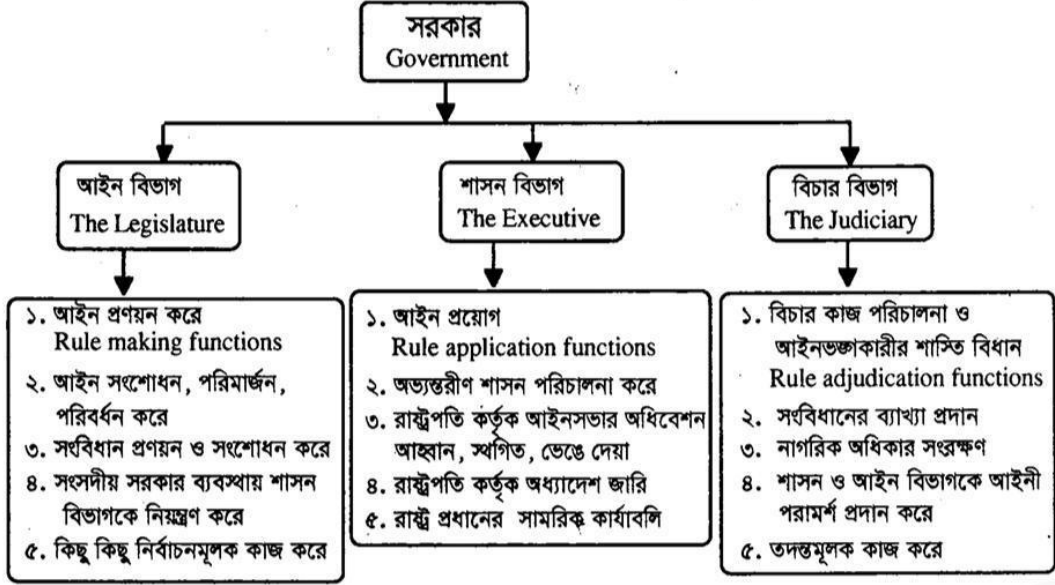
- ধর্মীয় বিধি-বিধান এবং আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা পরিচালিত
- অনেক সময় ধর্মীয় নেতার নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত সরকারকেও ধর্মতান্ত্রিক সরকার বলা হয়।
- যেমন- মধ্যযুগের সরকার
- আধুনিক যুগে শিল্প বিপ্লব, রেনেসা বা পুনর্জাগরণ, জাতীয় রাষ্ট্র, সার্বভৌমত্ব এবং সবশেষে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটতে থাকলে ধর্মীয় রাষ্ট্র এবং ধর্মতান্ত্রিক সরকারেরও প্রভাব কমে থাকে।
- ভ্যাটিকান সিটিতে ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত। অতি সম্প্রতি ইরানে, আফগানিস্তানে ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনেক দেশে মৌলবাদী ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা প্রসারিত হচ্ছে। চলমান রাজনীতির ব্যর্থতাই ধর্মতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার আবেদনকে অনেক দেশে কোণঠাসা করে তুলছে।

Lecture: 02
সরকারের অঙ্গসমূহ: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচক, রাজনৈতিক দল, স্বার্থগোষ্ঠী, চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, জনমত, আমলাতন্ত্র, এলিট, স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন।

বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গ

বাংলাদেশ সরকারের প্রধান অঙ্গ প্রতিষ্ঠান বা বিভাগ ৩টি। এ ৩টি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সরকার ব্যবস্থা পরিচালিত হয়।

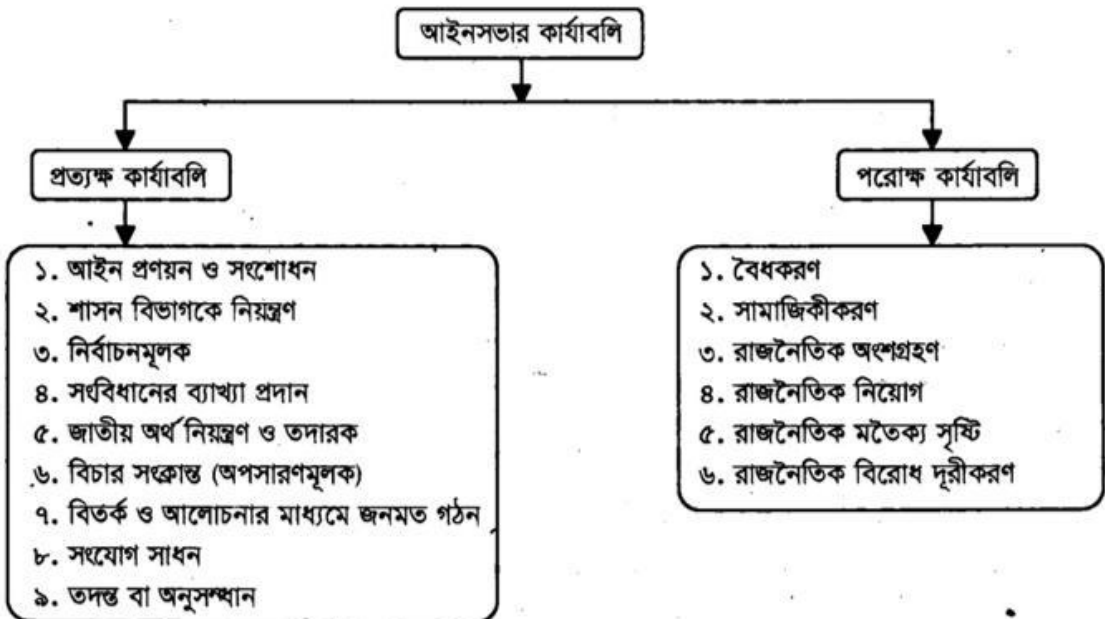
- আইন বিভাগ
- শাসন বা নির্বাহী বিভাগ
- বিচার বিভাগ



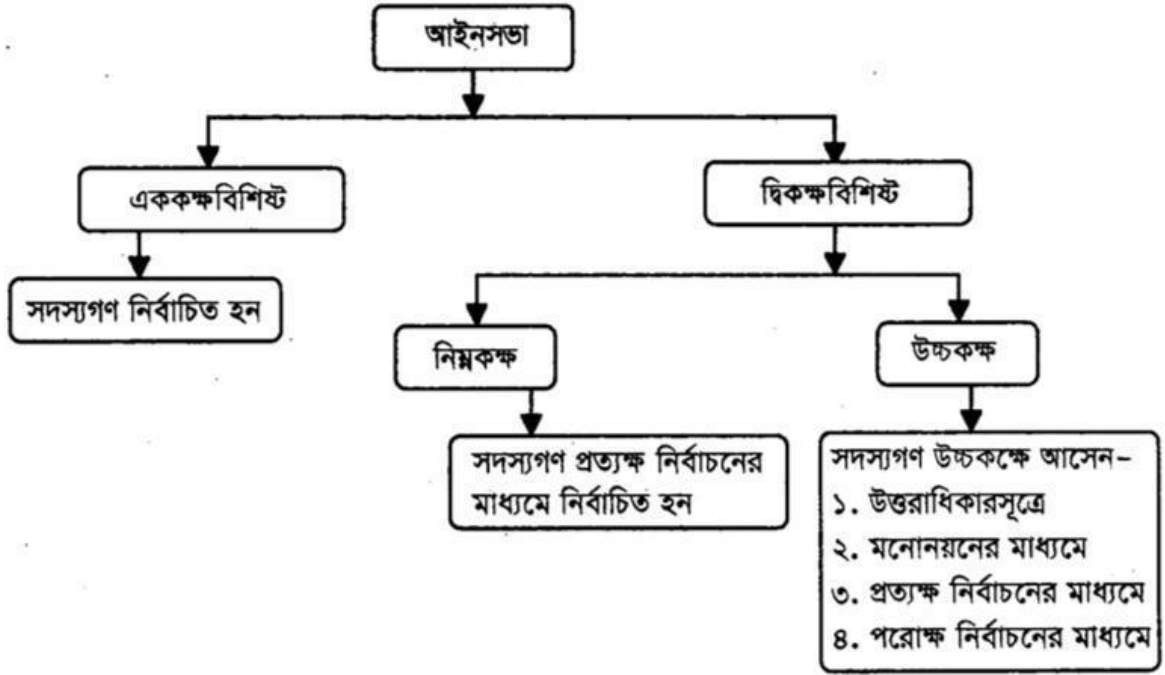
. আইন বিভাগ

- আইন বিভাগ যে বিভাগ রাষ্ট্রের শাসন কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের তাকে আইন বিভাগ বা আইনসভা বলে। আইন বিভাগ একটি যৌথ সংগঠন। এটি ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত।
- আইন বিভাগের কাজ হলো আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন ও আইন সংরক্ষণ।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনের প্রধান উৎস হলো আইনসভা বা সংসদ। বাংলাদেশের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ (House of the Nation)। বাংলাদেশে যেহেতু কোন প্রাদেশিক সরকার নেই তাই এর সরকার ব্যবস্থা এককেন্দ্রীক এবং জাতীয় সংসদ এক কক্ষবিশিষ্ট।

আইনসভার কাজ



আইনসভার গঠন



জাতীয় সংসদ জাতীয় সংসদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনসভা।

- এককক্ষ বিশিষ্ট (৬৫ অনুচ্ছেদ)
- সদস্য সংখ্যা ৩৫০। যার মধ্যে ৩০০ জন সংসদ সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন এবং অবশিষ্ট ৫০টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যগণ নির্বাচিত হন ৩০০ সংসদ সদস্যের ভোটে (পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে) নির্বাচিত হন।
- মেয়াদকাল পাঁচ বছর।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইনসভা।
- জাতীয় সংসদের সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্পিকার।

কোরাম-কোরাম শব্দের অর্থ ন্যূনতম উপস্থিতি সংখ্যা। সংসদের কাজ যে সংখ্যক সদস্যের উপস্থিতিতে পরিচালনা করা যায় তাকে বলে কোরাম। বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে কমপক্ষে ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে জাতীয় সংসদের কাজ পরিচালনা করা হয়।

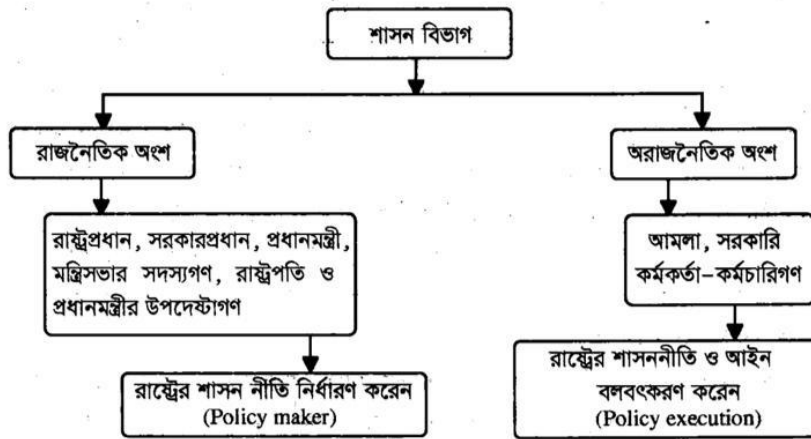
সংসদের অধিবেশন (Session of Jatiya Sangsad): জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের পর সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি সংসদের অধিবেশন আহ্বান, স্থগিত ও সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। জাতীয় সংসদ আহ্বানকালে রাষ্ট্রপতি সংসদের বৈঠকের সময় নির্ধারণ করে দেবেন। সংবিধানের ৭২ (২) নম্বর অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে যে, জাতীয় সংসদের সাধারণ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে।

- বছরে অন্তত ২ বার অধিবেশন বসবে। সংসদের এক অধিবেশনের সমাপ্তি ও পরবর্তী অধিবেশনের প্রথম বৈঠকের মধ্যে ৬০ দিনের বেশি বিরতি থাকবে না।
- জাতীয় সংসদের অধিবেশনের প্রথম বৈঠকে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে একজন স্পিকার এবং একজন ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হবেন।
- প্রথম বৈঠকেই সংসদ সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন সংসদীয় স্থায়ী কমিটি (Standing Committee) গঠিত হবে। সংবিধানের ৭৬ (১) নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তিন ধরনের স্থায়ী কমিটির কথা বলা হয়েছে। যথা- ১. সরকারি

হিসাব কমিটি, ২. বিশেষ অধিকার কমিটি এবং ৩. অন্যান্য স্থায়ী কমিটি। সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য জাতীয় সংসদের নিজস্ব কার্যপ্রণালি বিধি আছে।

শাসন বিভাগ/নির্বাহী বিভাগ

- আইন বিভাগ কর্তৃক প্রণীত আইন প্রয়োগ করে শাসনকার্য নির্বাহ করে থাকে শাসন বিভাগ বা নির্বাহী বিভাগ। রাষ্ট্রের প্রধান পরিচালক থেকে গ্রাম্য চৌকিফের শাসন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।
- শাসনবিভাগকে রাষ্ট্রের কর্ণধার বলে।
- সর্বোচ্চ কর্মকর্তা- রাষ্ট্রপতি।
- শাসন বিভাগের প্রধান- মধানমন্ত্রী
- দুটি অংশ-
 - রাজনৈতিক/অস্থায়ী- জনগণের ভোটে নির্বাচিত। এরা শাসননীতি নির্ধারণ করে
 - রাজনৈতিক/স্থায়ী-স্থায়ী কর্মচারী। সাধারণত সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারী। শাসননীতি ও আইন বলবৎ করে।



বিচার বিভাগ

বিচার বিভাগ সরকারের তৃতীয় অঙ্গ। বিচার বিভাগ আইন অনুযায়ী মামলার রায় প্রদান, আইন ব্যাখ্যা ও সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে কাজ করে।

অর্থাৎ সরকারের যে বিভাগ বিভিন্ন বিরোধ সমস্যার নিষ্পত্তিকল্পে রায় প্রদান করে ও আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে তাকে বিচার বিভাগ বলে।

- অ্যালান বল এর মতে, বিচার বিভাগের সাংবিধানিক কাজ চার প্রকার। যথা: (১) বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনা ও সংবিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কাজ, (২) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিরোধ মীমাংসা সংক্রান্ত কাজ, (৩) রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে সংরক্ষণ ও সমর্থন সংক্রান্ত কাজ, (৪) নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ সংক্রান্ত কাজ।

বিচার বিভাগের গঠন

উচ্চ আদালত (Higher Level Court): এটি দেশের সর্বোচ্চ আদালত। নিম্ন ও মধ্যস্তরের আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল গ্রহণ ও বিচার, উচ্চ অফিসের মামলার বিচার, সংবিধান সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ ও বিচার প্রভৃতি এর মূল কাজ। উচ্চ আদালতের ২টি বিভাগ থাকে; যথা- (ক) হাইকোর্ট বিভাগ ও (খ) আপিল বিভাগ।

মধ্যস্তরের আদালত (Middle Level Court): বিচার বিভাগের অধস্তন আদালতের পরবর্তী আদালত। এতে অধস্তন আদালতের প্রদত্ত রায় পুনর্বিবেচনায় আপিল মামলা, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা ও বড় বড় মামলার বিচার করা হয়।

নিম্নস্তর/অধস্তন আদালত (Lower Level Courts) নাগরিকদের অধিকার, অপরাধ, বিরোধ সংক্রান্ত মামলা নিম্নস্তরের আদালতে সম্পন্ন হয়। এটি ২প্রকার। ক) দেওয়ানি খ) ফৌজদারি।

ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি

- এরিস্টটল সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। আধুনিক কালে ব্যাখ্যা প্রদান করেন মন্টেস্কু। আধুনিক ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা হলেন জ্যা বোঁদা।

সরকারের তিনটি বিভাগ ও কাজ		প্রধান
আইনসভা (Legislature)	আইন প্রণয়ন করে।	স্পীকার
শাসন বিভাগ (Executive)	আইনসমূহ বাস্তবায়ন করে	প্রধানমন্ত্রী
বিচার বিভাগ (Judiciary)	আইন ভঙ্গের বিচার করে এবং নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করে।	প্রধান বিচারপতি

আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে পৃথকভাবে এই তিনটি ক্ষমতা ভাগ করে দেওয়াকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বলে।

- প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল তার 'পলিটিক্স' গ্রন্থে রাষ্ট্রের তিনটি অঙ্গের কথা বলেছিলেন এবং স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অবতারণা করেন। অঙ্গ তিনটি: (ক) আলোচনামূলক, (খ) শাসন সম্পর্কীয় ও (গ) বিচার বিষয়ক।
- মন্টেস্কু ১৭৪৮ সনে তিনি তার "The spirit of laws" গ্রন্থে সর্বপ্রথম পরিপূর্ণভাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির আধুনিক ব্যাখ্যা দান করেন। এজন্য তাকে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল প্রবক্তা বলা হয়।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: এটি হলো ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির একটি আদর্শ উদাহরণ। বাস্তবে চেক এন্ড ব্যালেন্স বা ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতির প্রয়োগ করে।

ভারসাম্য ও প্রতিসাম্য নীতি (Checks and Balances): রাষ্ট্রের প্রতিটি অঙ্গ একে অপরের ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভারসাম্য রক্ষা করে।

- ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি বাস্তবে সম্ভব না, কাম্যও না।

ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতির বৈশিষ্ট্য

- এক বিভাগ অন্য বিভাগে হস্তক্ষেপ করবে না
- প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সীমাবদ্ধ এবং পৃথক ব্যক্তি
- প্রতিটি বিভাগ ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রয়োগে চূড়ান্ত ক্ষমতা ভোগ করবে
- প্রত্যেক বিভাগ নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগে স্বাধীন

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব

নির্বাচনের বিভিন্ন প্রার্থীর সপক্ষে প্রদত্ত ভোট সমূহের সমানুপাতে আইনসভার আসন সমূহ বন্টন পদ্ধতিকে সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation) বলে।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মূল নীতিসমূহ	
আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব	ভোটের শতাংশের সঙ্গে আসনের শতাংশের সরাসরি সম্পর্ক থাকে।
ভোটের মূল্য	কোনো প্রার্থীর পক্ষে ভোট না দিলেও, সেই ভোটটি দলের মোট ভোট সংখ্যায় যোগ হয়।
ভোটের মূল্য বহু-সদস্যীয় নির্বাচনী এলাকা	সাধারণত সিস্টেমে বড় আকারের নির্বাচনী এলাকা থাকে, যেখান থেকে একাধিক প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।।

- ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, ডেনমার্ক, সুইডেন, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দেশে পিআর পদ্ধতি রয়েছে।
- টমাস হেয়ার ১৮৫১ সালে একক হস্তান্তরযোগ্য ভোট ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন।
- "Representative Government" গ্রন্থের লেখক জন স্টুয়ার্ট মিল।

সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা- প্রতিনিধিত্বশীল, ভোটের অপচয় কম, সহযোগিতার সংস্কৃতি

অসুবিধা- অস্থিতিশীল সরকার, ভোটারদের সাথে কম সরাসরি সম্পর্ক, জটিল পদ্ধতি।

ক্ষমতার বিভাজন বৈচিত্র্য এবং আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Separation of Power, variety and Proportional Representation)

মূলত তিনটি দিক থেকে ক্ষমতার বিভাজনের বৈচিত্র্য দেখা যায়-

১. সম্পূর্ণ বিভাজন (Complete Separation of Powers): সরকারের তিনটি অঙ্গ অর্থাৎ আইন, নির্বাহী ও বিচার বিভাগের মধ্যে স্পষ্ট ও কড়াকড়িভাবে ক্ষমতার আলাদা রাখা। উদাহরণ: যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট, কংগ্রেস ও সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণ আলাদা। এক বিভাগের ক্ষমতা অন্য বিভাগ ব্যবহার করতে পারে না। এতে শক্তিশালী "চেকস অ্যান্ড ব্যালান্সেস" ব্যবস্থা থাকে।

২. আংশিক বা নমনীয় বিভাজন (Partial/Flexible Separation): এ পদ্ধতিতে বিভাগগুলোর মধ্যে কিছু ক্ষমতা বা ভূমিকা একে অপরের সাথে ভাগাভাগি করা হয়। উদাহরণ: যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভা (নির্বাহী) সংসদ (আইনসভা) থেকে নির্বাচিত হয়।

৩. ক্ষমতার সংমিশ্রণ বা একীকরণ (Fusion of Powers): আইনসভা ও নির্বাহী প্রায় এক হয়ে যায়, বিচার বিভাগও সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন হতে পারে। উদাহরণ: একদলীয় বা স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায়।

এতে নির্বাহী ও আইনসভা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এবং বিচার বিভাগ তুলনামূলক স্বাধীন।

নির্বাচকমণ্ডলী(Electorate)

- আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি বলা হয়
- রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী যে সকল নাগরিক নির্বাচনে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার লাভ করে তাদের সমষ্টিকে নির্বাচকমণ্ডলী বলে।
- আইনগতভাবে ভোটাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সমষ্টিকে নির্বাচকমণ্ডলী বলে। অন্যভাবে বলা সরকার গঠনের জন্য রাষ্ট্রের সাংবিধানিক আইন মোতাবেক যারা প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষমতা লাভ করে তাদের সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী বলে।
- **উইলোবি বলেন- নির্বাচকমণ্ডলী রাষ্ট্রের চতুর্থ অঙ্গ।**

ইলেক্টোরাল কলেজ: নির্বাচক (elector) বলতে সেইসব ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে বোঝায়, যারা কোনো নির্দিষ্ট প্রার্থী বা প্রস্তাবকে সরাসরি ভোট না দিয়ে, চূড়ান্তভাবে রাষ্ট্রপতি বা অন্য কোনো উচ্চ পদাধিকারীকে নির্বাচন করার জন্য বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত হন। এই নির্বাচকদের নিয়ে গঠিত হয় নির্বাচকমণ্ডলী (Electoral College)।

- বাংলাদেশে ভোট দানের বয়স ১৮ বছর।
- নির্বাচন কমিশন গঠিত হয় সংবিধানের ১১৯ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী।
- নারীরা প্রথম ভোটাধিকার পায় নিউজিল্যান্ড।
- সরকারের চতুর্থ অঙ্গ নির্বাচকমণ্ডলী।
- বাংলাদেশে প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হয় ৩০শে মে ১৯৭৭।

রাজনৈতিক দল

- রাজনৈতিক দল (political party) হলো এমন একটি সুসংগঠিত গোষ্ঠী, যারা একই ধরনের রাজনৈতিক মতাদর্শ, লক্ষ্য ও কর্মসূচিতে বিশ্বাসী এবং যৌথভাবে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনা করতে চায়।
- প্রতিনিধিত্ব মূলক গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি রাজনৈতিক দল।
- প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সরকারিকে “দলীয় সরকার” বলে।

রাজনৈতিক দলের মূল বৈশিষ্ট্য

- সংগঠিত গোষ্ঠী
- একই মতাদর্শ
- ক্ষমতা লাভের আকাঙ্ক্ষা
- সরকার গঠন ও পরিচালনা
- জাতীয় স্বার্থ
- নীতি ও কর্মসূচি প্রণয়ন
- বিরোধী দলের ভূমিকা

রাজনৈতিক দল ব্যবস্থার প্রকারভেদ

- এক-দলীয় ব্যবস্থা যেমন: চীন ও কিউবা।
- দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা যেমন: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য।
- বহু-দলীয় ব্যবস্থা, যেমন: ভারত, জার্মানি এবং ফ্রান্স।



গুরুত্ব

- প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রের ভিত্তি
- সরকারের জবাবদিহিতা
- গণতন্ত্রের প্রাণ।
- জনগণের স্বার্থ রক্ষা
- জনমত গঠন ও প্রকাশ
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা
- জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ স্থাপন

রাজনৈতিক দলের কাজ

জনমত গঠন, সরকার গঠন, বিকল্প সরকার গঠন

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

- চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হলো এমন একটি সুসংগঠিত সংগঠন, যার সদস্যরা কোনো নির্দিষ্ট স্বার্থের দ্বারা একত্রিত হয়।
- এরা রাজনৈতিক দলের মতো নয়। অরাজনৈতিক সংগঠন।
- সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী

প্রকারভেদ

অর্থনৈতিক গোষ্ঠী। যেমন: শ্রমিক ইউনিয়ন: শ্রমিকদের অধিকার, মজুরি ও কাজের পরিবেশ নিয়ে কাজ করে।

পেশাগত সমিতি। যেমন: আইনজীবী সমিতি, ডাক্তারদের সংগঠন।

ব্যবসায়ী সংগঠন: ব্যবসায়ী বা শিল্পপতিদের স্বার্থ রক্ষা করে। যেমন: বণিক সমিতি, শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি।

বিদেশি স্বার্থ গোষ্ঠী: বিদেশি সরকার বা কোম্পানিগুলো যখন কোনো দেশের নীতিকে প্রভাবিত। করার চেষ্টা করে, তখন তারা এই ধরনের গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে।

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য

রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য

- জাতীয় কল্যাণ: রাজনৈতিক দলের সামনে বৃহৎ জাতীয় কল্যাণের লক্ষ্য থাকে, যা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে থাকে না।
- সাংগঠনিক পার্থক্য: সাংগঠনিক দিক থেকে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী রাজনৈতিক দল অপেক্ষা দুর্বল।
- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য: রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর লক্ষ্য হলো সরকারি সিদ্ধান্তকে নিজেদের অনুকূলে প্রভাবিত করা।
- কাজকর্মের পদ্ধতি: রাজনৈতিক দলের কাজকর্ম প্রকাশ্য ও প্রভাস্ক। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কাজকর্ম সাধারণত গোপন বা অপ্রকাশ্য।
- নির্বাচনে অংশগ্রহণ: রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী তা করে না।

- প্রকৃতিগত পার্থক্য: রাজনৈতিক দল গঠিত হয় বিভিন্ন জাতি, ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায় ও পেশার লোকজন নিয়ে। কিন্তু চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গঠিত হয় সমস্বর্ণ ও সমমনোভাবাপন্ন লোকদের নিয়ে।

Political Culture:(রাজনৈতিক সংস্কৃতি)

- রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে সেসব মনোভাব, বিশ্বাস, অনুভূতি ও মূল্যবোধকে বোঝায় যা মানুষের রাজনৈতিক আচরণ ও মূল্যবোধকে নিয়ন্ত্রণ করে।
- অধ্যাপক জি. এ. আলমন্ড (G.A. Almond) বলেন, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি মূলত কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন অংশে ব্যক্তির নিজ ভূমিকা সম্পর্কে রাজনৈতিক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির সুনির্দিষ্ট প্রতিকৃতি বা দিক নির্দেশনা।'
- এ্যালান আর. বল (Allan R. Bal)-এর মতে, 'রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমাজের সে সকল মনোভাব, বিশ্বাস, আবেগ ও মূল্যবোধ নিয়ে গঠিত হয়, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত।'

স্বার্থগোষ্ঠী(Interest group)

- স্বার্থগোষ্ঠী (interest group) হলো এমন একটি সুসংগঠিত দল বা সংগঠন, যার সদস্যরা কোনো নির্দিষ্ট নীতি, পেশা, অর্থনৈতিক অবস্থান, বা সামাজিক বিষয়ে অভিন্ন স্বার্থ বা লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। রাজনৈতিক দল থেকে এটি ভিন্ন।
- এরা বিশেষ অংশের স্বার্থ রক্ষার জন্য একত্রিত হয় এবং সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

স্বার্থগোষ্ঠীর প্রকারভেদ

- অর্থনৈতিক স্বার্থ গোষ্ঠী। যেমন: শ্রমিক ইউনিয়ন: শ্রমিকদের অধিকার, মজুরি ও কাজের পরিবেশ নিয়ে কাজ করে।
- পেশাগত সমিতি। যেমন: আইনজীবী সমিতি, ডাক্তারদের সংগঠন।
- বিদেশি স্বার্থ গোষ্ঠী: বিদেশি সরকার বা কোম্পানিগুলো যখন কোনো দেশের নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে, তখন তারা এই ধরনের গোষ্ঠী হিসেবে কাজ করে।

জনমত

- জনমত (Public Opinion) হলো কোনো নির্দিষ্ট বিষয়, নীতি, বা সমস্যা সম্পর্কে একটি সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সম্মিলিত মনোভাব, ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গি।
- জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এর ভাষায় "কোনো সুনির্দিষ্ট জাতীয় সমস্যার ওপর জনগণের সংগঠিত মতামতই হল জনমত"।
- জনমত শব্দটি প্রথম ব"বহার করেন জাঁ জাঁক রুশো।
- জনমত পরিমাপের উৎকৃষ্ট মাধ্যম সাধারণ নির্বাচন।
- জনমত প্রচারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যম- মুদ্রণযন্ত্র
- "The Social Contact" গ্রন্থের লেখক- জাঁ জাঁক রুশো বলেন- Voice of the people is the voice of the God। Voice of the God অর্থ জনমত।
- গেটেল বলেন- Public opinion is neither public nor opinion.

জনমত গঠনের উপাদান

- গণমাধ্যম (Media)
- পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
- রাজনৈতিক দল ও স্বার্থ গোষ্ঠী

-সামাজিক পরিবেশ ও ধর্ম

আমলাতন্ত্র

- আমলাতন্ত্র হচ্ছে স্থায়ী, বেতনভুক্ত, নিরপেক্ষ, দক্ষ ও পেশাদারী সংগঠন যার দ্বারা সরকারের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয়।
- অধ্যাপক এস ই ফাইনার বলেন, "আমলাতন্ত্র একটি স্থায়ী, বেতনভুক্ত এবং দক্ষ চাকরিজীবী শ্রেণি।"
- ১৭শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ফরাসী অর্থনীতিবিদ জ্যাকুইস ক্লাদে ম্যারি ভিনসেন্ট দ্য পোডে প্রথম এই শব্দের প্রচলন করেন।
- ১৮১৮ সালে প্রথম ইংরেজি ভাষাতে 'Bureaucracy' শব্দের ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়।
- ম্যাক্স ওয়েবার-কে আমলাতন্ত্রের জনক বলা হয়।
- আমলাতন্ত্রের ইংরেজি প্রতিশব্দ 'Bureaucracy' শব্দটি এসেছে ফরাসি থেকে।
- ফরাসিতে শব্দটি এসেছে ফরাসি 'Bureau' এবং গ্রিক 'Kratos' শব্দের সমন্বয়ে।
- 'Bureau' শব্দের অর্থ ডেস্ক বা অফিস এবং 'Kratos' শব্দের অর্থ শাসন বা রাজনৈতিক ক্ষমতা
- 'Bureau' বলতে ডেস্ক গভর্নমেন্ট (Desk Government) বা টেবিলে বসে পরিচালিত সরকারকে বুঝায়।
- 'লালফিতা' প্রত্যয়টি সপ্তদশ শতাব্দীতে ব্রিটেনে প্রচলিত হয়।
- সরকারের অ-রাজনৈতিক অংশ আমলাগণ।
- Lord Acton বলেন- Power corrupts absolute power tends to corrupt absolutely.

আমলাতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্য

- পদসোপান (Hierarchy)
- নিয়ম-কানুন
- পেশাদারিত্ব(Professionalism)
- স্থায়ীত্ব
- লিখিত রেকর্ড
- নিরপেক্ষতা

আমলাতন্ত্রের কার্যাবলি

- আইন কার্যকর করা
- সরকারের নীতিমালা বাস্তবায়ন
- আইন প্রণয়নে সহায়ত
- বিচার সংক্রান্ত
- শাসক-শাসিতের মধ্যে সেতুবন্ধন

অভিজাত শ্রেণি

- Elite এই শব্দটি ফরাসি শব্দ "éine" থেকে এসেছে, যার অর্থ "নির্বাচিত" বা 'শ্রেষ্ঠ'।
- এলিট (Elite) শব্দটি সাধারণত সমাজের প্রভাবশালী, ক্ষমতামালী, বা বিশেষ সুবিধা সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি ছোট এবং প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে বোঝায়।
- T.B. Bottomore বলেন, "যে কারণেই হোক না কেন সমাজে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন বৃত্তিমূলক, বিশেষ করে পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীই হলো এলিট"।

- এলিট আবর্তন (Circulation of elites) তত্ত্বের প্রবক্তা হলেন ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী এবং অর্থনীতিবিদ ভিলফ্রেডো প্যারেটো।
- পাওয়ার এলিট মডেল (Power Elite Model): সমাজবিজ্ঞানী C. Wright Mills এই তত্ত্বটি দেন।

অভিজাত শ্রেণির বিভিন্ন ধরন

- রাজনৈতিক অভিজাত
- অর্থনৈতিক অভিজাত
- সামরিক অভিজাত
- সাংস্কৃতিক অভিজাত
- শাসক এলিট

স্থানীয় সরকার

- স্থানীয় সরকার বলতে বোঝায় জনগণের ভোটে নির্বাচিত এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যা একটি নির্দিষ্ট এলাকার উন্নয়ন এবং জনগণের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে।
- বাংলাদেশে তিন স্তরের স্থানীয় সরকার বিদ্যমান। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জেলা পরিষদ। এছাড়া, শহর এলাকায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন রয়েছে। বাংলাদেশ আটটি বিভাগে বিভক্ত।

স্থানীয় সরকারের কার্যাবলী

- জনপ্রশাসন ও সেবার সর্বনিম্ন স্তর নিশ্চিত করা।
- জনগণের দৈনন্দিন জীবন সম্পর্কিত সমস্যা সমাধান করা।
- স্থানীয় সুযোগ-সুবিধা ও অবকাঠামো উন্নয়ন করা।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হলো একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায় স্থানীয় জনগণের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা, যেখানে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জনগণের নিকট দায়বদ্ধ থেকে স্থানীয় প্রশাসন ও উন্নয়নমূলক কাজ পরিচালনা করে থাকে।
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ৫৯. (১) প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিটের স্থানীয় সরকার আইন অনুসারে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত সংস্থাগুলির উপর ন্যস্ত থাকবে।

স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

- স্থানীয় সরকার হলো একটি প্রশাসনিক কাঠামো, যা আইন দ্বারা গঠিত হয় (যেমন: ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, বা সিটি কর্পোরেশন)।
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হলো সেই ক্ষমতা বা নীতি, যা স্থানীয় সরকারকে স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দেয়।
- স্থানীয় সরকার হলো একটি যন্ত্র আর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন হলো সেই যন্ত্র চালানোর শক্তি।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মূল বৈশিষ্ট্য

- জনগণের অংশগ্রহণ
- দায়বদ্ধতা
- অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক
- স্বাধীনতা
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
- স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন এবং স্থানীয় সরকার

লেকচার-৩

টপিক: Political Thought

পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রচিন্তা:	প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা:
প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্র	কৌটিল্য ও অর্থশাস্ত্র
সক্রেটিস	কনফুসিয়ানিজম
প্লেটো	তাওইজম
এরিস্টটল	ইবনে খালদুন
	ইমাম গাজ্জালী

প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্র

- প্রাচীন গ্রিক নগর রাষ্ট্র, যা পলিস (Polis) নামেও পরিচিত।
- খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে গ্রিসে এই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোর উদ্ভব হয়
- পলিস (Polis) বলতে কেবল একটি শহরকে বোঝানো হয় না, বরং এটি ছিল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক সত্তা।
- গ্রিক পলিসগুলোর মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টা ছিল সবচেয়ে প্রভাবশালী

পলিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য

1. স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Autarky),
2. ক্ষুদ্র আয়তন ও জনসংখ্যা
3. নাগরিকত্ব (Citizenship)
4. জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ

এথেন্স: গণতন্ত্রের সূতিকাগার এবং বিখ্যাত দার্শনিক যেমন সক্রেটিস, প্লেটো, ও অ্যারিস্টটল এই শহরেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

স্পার্টা: সামরিক শক্তির জন্য স্পার্টার বিশেষ খ্যাতি ছিল এবং এর শাসন ব্যবস্থা ছিল মূলত অভিজাত ও দৈত রাজতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে।

গ্রিক নগররাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য

১. আয়তন ক্ষুদ্র ও নাগরিক সংখ্যা কম (নারী, শিশু, দাস, কারিগরি, শ্রমজীবীরা নাগরিক ছিল না)
২. নাগরিকদের সামগ্রিক জীবনের সমন্বয় সাধনের ফলে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভিন্ন জীবন
৩. স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র অর্থাৎ সুখী ও সমৃদ্ধ জীবনের সবকিছু নগররাষ্ট্রের আওতাধীন ছিল।
৪. পৌর প্রকৃতি
৫. কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়ের সমন্বয়সাধনের পাশাপাশি ভূম্যধিকারী, কারিগরি ও ব্যবসায়ীর সমাবেশ
৬. নাগরিকদের প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রের কাজে অংশগ্রহণ
৭. অধিবাসীদের বন্ধন দৃঢ় ছিল এবং জীবনের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন। অর্থাৎ ঐক্য ও অখণ্ডতা বিরাজমান ছিল।
৮. প্রত্যেকটি নগর রাষ্ট্রের একটি মাত্র কেন্দ্রস্থল

এথেন্সের সমাজব্যবস্থা:

জনসংখ্যা তিনভাগে বিভক্ত ছিল-

- দাসস্তর (সর্বনিম্ন স্তর এবং সংখ্যায় বেশি)
- বিদেশিরা (দ্বিতীয় শ্রেণি)
- নাগরিক (সর্বোচ্চ শ্রেণি এবং একমাত্র এরাই রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিতে পারত)

নাগরিকরা ২ভাগে বিভক্ত ছিল-

- অবসরভোগী বা অশ্রমজীবী (সম্ভ্রান্ত শ্রেণি)। এরা সার্বক্ষণিক শাসন কাজে ব্যস্ত থাকত।
- ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী। নিজস্ব কাজের পরে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নিতেন।

এথেন্সের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

সংসদ: পুরুষ নাগরিকদের নিয়ে এক্সেসিয়া বা এসেমবলি নামে সংসদ গঠন যাতে ২০ বছরের যেকোনো নাগরিক এর কার্য পরিচালনায় অংশ নিতে পারত। প্রতি বছর দশটি অধিবেশন হতো।

জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান: পঞ্চাশত পরিষদ(Council of 500), বহু সংখ্যক জনজুরি সংবলিত আদালত (Courts with many popular juries), দশজন সেনাপতি নিয়ে ‘দশাধিনায়ক পরিষদ’ (Council of 10 Generals) উল্লেখযোগ্য।

স্পার্টার শাসনব্যবস্থা:

- সংসদ থাকলেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাসন পরিষদ ছিল সিনেট।
- শাসনব্যবস্থা ছিল মূলত অভিজাত শ্রেণিভুক্ত।

-দৈত রাজতন্ত্র ছিল।

-৫ সদস্য নিয়ে এফরস বোর্ড (Board of Ephors) নিয়ে বোর্ডসভা হত যারা রাজা ও সিনেটের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত।

সক্রেটিস

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

- সক্রেটিস (৪৭০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ ৩৯৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক।
- প্লেটোর বর্ণনা মতে সক্রেটিসের বাবার নাম -সফ্রোনিষ্টাস এবং মায়ের নাম-ফিনারিটি যিনি একজন ধাত্রী ছিলেন। তার স্ত্রীর নাম জানথিপি। সক্রেটিসের বন্ধু ক্রিটো
- তিনি ঠিক কীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতেন তা পরিষ্কার নয়। ফিলাসের টিমোন এবং পরবর্তী আরো কিছু উৎস অনুসারে প্রথম জীবন কেটেছে ভাস্করের কাজ করে।
- এরিস্টোফেনিসের নাটক দ্য ক্লাউডে সক্রেটিসকে দেখানো হয়েছে একজন ভাঁড় হিসেবে যে তার ছাত্রদের শিক্ষা দেয় কীভাবে ঋণের দায় থেকে বুদ্ধি খাটিয়ে মুক্তি পাওয়া যায়।
- তৎকালীন শাসকদের কোপানলে পড়ে তাঁকে হেমলক বিষ পানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাকে পশ্চিম দর্শনের ভিত্তি স্থাপনকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
- সক্রেটিস দার্শনিক জেনোর মত দ্বন্দ্বিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এই পদ্ধতিতে প্রথমে প্রতিপক্ষের মত স্বীকার করে নেওয়া হয়, কিন্তু এর পর যুক্তির মাধ্যমে সেই মতকে খণ্ডন করা হয়। এই পদ্ধতির একটি প্রধান বাহন হল প্রশ্ন-উত্তর।
- সক্রেটিস নৈতিক দর্শন এবং জ্ঞানভিত্তিক অনুসন্ধান ধরনের দর্শনের প্রচার করেছিলেন।
- সক্রেটিসের বিখ্যাত শিক্ষার্থী ছিলেন -প্লেটো (Plato)
- সক্রেটিস নিজে কিছুই লেখেননি; তাঁর চিন্তাগুলো তার শিষ্য প্লেটো ও জেনোফনের রচনার মাধ্যমে জানা যায়।
- সক্রেটিসের দার্শনিক পদ্ধতির নাম- সক্রেটিক পদ্ধতি (Socratic Method)। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জ্ঞান ও সত্য খুঁজে বের করার একটি পদ্ধতি
- সক্রেটিসের বিখ্যাত উক্তি- "আমি জানি যে, আমি কিছুই জানি না।" (I know that I know nothing)
- সক্রেটিসের মতে জ্ঞান অর্জনের উপায়-নিজেকে জানা এবং যুক্তিমূলক প্রশ্ন করা

সক্রেটিসের মৌলিক রাজনৈতিক ধারণা

- জ্ঞানই পুণ্য (Knowledge is Virtue)
সক্রেটিসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক নীতি হলো "জ্ঞানই পুণ্য"। এর অর্থ হলো, একজন ব্যক্তি যদি সত্যিকারে জানে যে কী ভালো এবং কী মন্দ, তাহলে সে খারাপ কাজ করতে পারে না।

নৈতিকতা ও রাষ্ট্র (Moral Foundation of the State)

সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্র কোনো যান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নয়, বরং এটি নৈতিকতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি সম্প্রদায়।

অজ্ঞ শাসকের বিরোধিতা

সক্রেটিস মনে করতেন, রাষ্ট্র পরিচালনা একটি বিশেষ জ্ঞান ও দক্ষতার কাজ, যা শুধুমাত্র জ্ঞানীরাই করতে পারেন।

জ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞের শাসন (Rule of the Wise and Expert)

সক্রেটিস গণতন্ত্রের পরিবর্তে এক ধরনের জ্ঞানভিত্তিক অভিজাততন্ত্রের (Epistemocracy) পক্ষে ছিলেন, যেখানে কেবল জ্ঞানী ও দক্ষ ব্যক্তিরাই শাসন করবেন।

সক্রেটিসের গণতন্ত্রের সমালোচনা

তিনি প্রশ্ন তুলতেন: "আমরা কি একজন নৌকার নাবিক বা একজন ডাক্তারের যোগ্যতা বিচার করি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে? তাহলে কেন একজন রাষ্ট্রনায়কের ক্ষেত্রে তা হবে?"

প্লেটো

- প্লেটোর জন্ম আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৪২৮ বা ৪২৭ অব্দে, এথেন্স ("Athens") শহরে। তার পিতার নাম অ্যারিস্টন এবং মায়ের নাম পেরিকটিওন। প্লেটো খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৭ অব্দে এথেন্সে মৃত্যুবরণ করেন।
- প্লেটো সক্রেটিসের একজন প্রধান শিষ্য ছিলেন।
- প্লেটো খ্রিস্টপূর্ব ৩৯০ অব্দে এথেন্সে "একাডেমি" ("Academy") নামে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই একাডেমিতে তিনি গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, এবং দর্শনের মতো বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দিতেন।
- প্লেটোর রচনাবলী "ডায়ালগ" ("dialogues") নামে পরিচিত, যেখানে তিনি সক্রেটিসের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে কথোপকথনের মাধ্যমে দার্শনিক ধারণা তুলে ধরেছেন। তার বিখ্যাত কাজগুলির মধ্যে "রিপাবলিক" ("Republic"), "থিওয়েটাস" ("Theaetetus"), এবং "ফিডন" ("Phaedo") বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এপোলজি (Apology)।
- তিনি সর্বাঙ্গিকবাদী ছিলেন।
- রাষ্ট্রচিন্তা বিশ্লেষণে তিনি আরোহ বা কল্পনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেন।
- প্লেটোর দার্শনিক তত্ত্ব রূপতত্ত্ব বা Theory of Forms নামে পরিচিত।
- Theory of Forms- বাস্তব জগৎ ছাড়াও একটি আদর্শ জগৎ আছে, যেখানে প্রতিটি বস্তু ও ধারণার নিখুঁত রূপ বা ফর্ম রয়েছে।
- প্লেটোর "অ্যালাগরি অফ দ্য কেভ" বলতে বোঝায়- এটি একটি উপমা যা মানুষ কীভাবে অজ্ঞতা থেকে জ্ঞানের আলোয় আসে, তা বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে।

প্লেটোর দার্শনিক পদ্ধতি

সাধারণত যে নীতি গ্রহণ করা হয় সে নীতি অনুসারে তাঁর দর্শনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

১. ডায়ালেকটিক (Dialectic): ডায়ালেকটিক বা আকার সম্পর্কীয় মতবাদ (Theory of eorms) হলো প্লেটোর পরমতত্ত্বের প্রকৃতি সম্পর্কীয় মতবাদ। প্লেটোর দর্শনে আকার বা ধারণার তাত্ত্বিক, যৌক্তিক এবং উদ্দেশ্যমূলক তাৎপর্য নিরূপণের বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে আছে।

২. পদার্থবিদ্যা (Physics): পদার্থবিদ্যায় দেশকালে অবস্থিত আবাসিক জগতের অস্তিত্বের কথা

আলোচিত হয়েছে। আত্মা সম্পর্কীয় মতবাদ এবং আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তির বিষয়ও একই সাথে আলোচিত হয়েছে।

৩. নীতিবিদ্যা (Ethics): রাষ্ট্রতত্ত্ব নীতিবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত; নাগরিক হিসেবে মানুষের কর্তব্য এবং ব্যক্তির নৈতিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে এ বিভাগে।

রূপের তত্ত্ব (Theory of Forms):

প্লেটোর "রূপের তত্ত্ব" তার দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই তত্ত্ব অনুসারে, আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যা উপলব্ধি করি, তা আসলে "রূপের" বা "ধারণার" অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। "রূপ" বা "ধারণা" হল পরম, শাস্ত্র এবং অপরিবর্তনীয়।

দার্শনিক রাজা (Philosopher King): প্লেটোর "রিপাবলিক" গ্রন্থে তিনি "দার্শনিক রাজার" ধারণা দেন। তার মতে, দার্শনিক জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই ("philosophers") সমাজের শাসক হওয়া উচিত, কারণ তারাই ন্যায্য ও সত্যের পথে পরিচালিত হতে পারেন।

প্লেটোর মৌলিক রাজনৈতিক ধারণা

আদর্শ রাষ্ট্র

- প্লেটো আদর্শ রাষ্ট্রের কাঠামোকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। যথা-
 - ১) দার্শনিক রাজা বা শাসক শ্রেণী- সর্বোচ্চ শ্রেণি। প্লেটোর মতে, "দার্শনিক শাসকগণ কোন আইনের- দ্বারা আবদ্ধ নন।" কারণ তাঁরা সর্বজ্ঞানী। তিনি বলেছেন, যখন শাসক ন্যায়বান হবেন, তখন আইন নিষ্পয়োজন। আবার যখন শাসক হবেন দুর্নীতিপরায়ণ, তখনও আইন হবে নিরর্থক।
 - ২) যোদ্ধা শ্রেণী- রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা
 - ৩) উৎপাদক শ্রেণী- দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর ভার গ্রহণ।

- প্লেটো মানুষের আত্মাকে তিনটি অংশে ভাগ করেছেন। যথা-
 - ১) যুক্তি বা প্রজ্ঞা (Reason/ Wisdom): এটি জ্ঞানের প্রতীক
 - ২) সাহস (Spirit/Courage): এটি আবেগ ও ইচ্ছাশক্তির প্রতীক এবং
 - ৩) ক্ষুধা বা কামন (Appetite): এটি শারীরিক চাহিদা ও লোভের প্রতীক।

জ্ঞান ও জ্ঞানের স্তরভেদ

বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ Intelligible	৪. প্রজ্ঞা Reason ৩. বোধ Understanding	প্রত্যয় বা আকারসমূহ The Forms গণিত বা জ্যামিতি Objects of Mathematics
পরিদৃশ্যমান জগৎ Visible	২. বিশ্বাস Faith ১. কল্পনা Conjecture	বস্তু Physical Objects ছায়া, প্রতিরূপ Shadows Reflections

উপরের চিত্রটির দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায় যে, প্লেটো জগৎকে পরিদৃশ্যমান ও বুদ্ধিগ্রাহ্য এই দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। এরপর তিনি দেখান যে উভয় জগতের প্রত্যেকটিই আবার দু'ভাগে বিভক্ত।

- পরিদৃশ্যমান জগৎ কল্পনা ও বিশ্বাস এ দু'ভাগে এবং
- বুদ্ধিগ্রাহ্য জগৎ বোধ ও প্রজ্ঞা এ দু'ভাগে বিভক্ত।

এ চারটি হলো মানবাত্মার বৃত্তি এবং এদের সাথে সমান্তরাল এমন চার প্রকারের জাগতিক অস্তিত্ব রয়েছে, যাদের অভিমুখে আত্মার বৃত্তিগুলো পরিচালিত।

চিত্রের রেখার নিচের অংশগুলো আত্মার অস্পষ্ট অবস্থার নির্দেশক এবং এ চিত্রের উপরের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় আত্মা ততই অধিক থেকে অধিকতর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে থাকে।

প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থা

প্লেটোর শিক্ষাব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল শাসন ক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সংযোজন।

প্লেটো শিক্ষাব্যবস্থাকে দু'টি প্রধান স্তরে বিভক্ত করেছেন। যেমন-

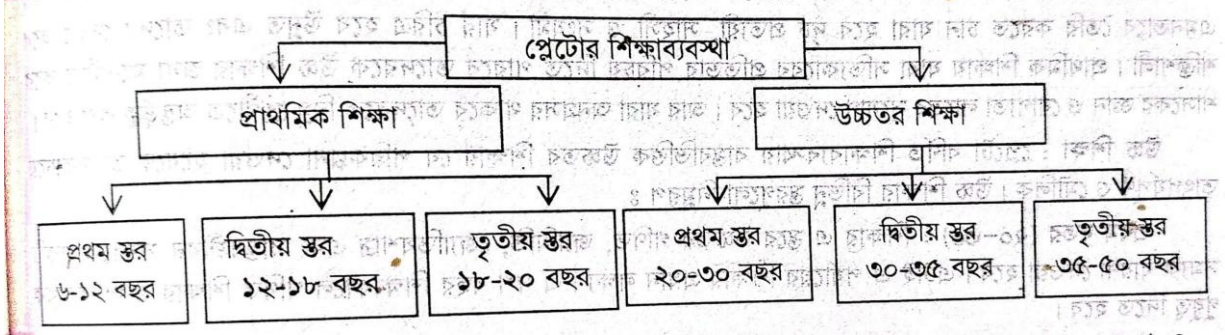
১) প্রাথমিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষা শিক্ষার বয়ঃসীমা হবে শৈশব থেকে ২০ বছর পর্যন্ত।

২) উচ্চতর শিক্ষা তিনটি স্তরে বিভক্ত। যথা-

ক) ২০ থেকে ৩০ বছর: এ সময় গভীরভাবে গণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত ও জ্যোতির্শাস্ত্র শিক্ষা করতে হবে।

খ) ৩০ থেকে ৩৫ বছর: এ পর্যায়ে উচ্চ দর্শনের জ্ঞান অর্জন অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

গ) ৩৫ থেকে ৫০ বছর: এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীগণ রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করবে।



প্লেটোর সাম্যবাদ

১) সম্পত্তির সাম্যবাদ: শাসক ও সৈনিক শ্রেণির কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না। উৎপাদক শ্রেণির (কৃষক, শ্রমিক, ব্যবসায়ী) জন্য এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল না।

২) পরিবারের সাম্যবাদ: প্লেটো শাসক ও সৈনিকদের জন্য যৌথ পরিবার ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন।

ন্যায়বিচার

প্লেটোর ন্যায়বিচার সংক্রান্ত ধারণার দুটি রূপ-

- সামাজিক ন্যায়বিচার
- ব্যক্তিগত ন্যায়বিচার

প্লেটোর রচনাবলি***

নং	গ্রন্থের নাম	বিষয়বস্তু
১.	এপোলজি Apology	এথেন্সের আদালতে সসক্রেটিস কিভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন, এ গ্রন্থে প্লেটো তারই বর্ণনা দিয়েছেন। এখানে সসক্রেটিসকে সর্বপ্রকার ভুল বুঝাবুঝির বিরোধিতার মুখোমুখি হয়ে সত্য সম্প্রদানের আপসহীন সংগ্রামে ব্রতী হতে দেখা যায়।
২.	ক্রিটো Crito	সসক্রেটিসের ধনী বন্ধু ক্রিটো তাকে জেল থেকে পালিয়ে এথেন্স ত্যাগ করার জন্য যে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, সসক্রেটিস তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এবং তা করতে গিয়ে তিনি যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন, এ গ্রন্থে বর্ণনা পাওয়া যায়।
৩.	ইউজিফ্রন Eugyphron	সসক্রেটিসের প্রাণদণ্ডের ব্যাপারে ধর্মধর্মের যে ধারণাকে ব্যবহার করা হয়েছিল তা যে কত অসার ছিল এ গ্রন্থে প্লেটো তাই দেখানোর চেষ্টা করেন।
৪.	ল্যাচেস Laches	যুদ্ধ ও শান্তি এ উভয় সময়েই জীবনের জন্য সাহস যে কত প্রয়োজনীয় একটি গুণ, এ গ্রন্থে তাই আলোচিত হয়েছে।

নং	গ্রন্থের নাম	বিষয়বস্তু
৫.	আইয়ন Ion	ল্যাচেস্ গ্রন্থে সাহসী সেনাপতিরা তাদের কাজ-কর্মে অনুধ্যানিক তৎপরতার অভাবের পরিচয় দিয়ে থাকেন বলে যে মত প্রকাশ করা হয়েছিল, আইয়ন গ্রন্থে কবিদের ব্যাপারেও এ একই অভিযোগ আনা হয়েছে।
৬.	প্রোটাগোরাস Protagoras	প্রোটাগোরাসের ভাষণ পদ্ধতি এবং সফ্রেটিসের প্রশ্ন ও উত্তর পদ্ধতির তুলনার মাধ্যমে পুণ্য (Virtue) শিক্ষা দেওয়া যে সম্ভব এ গ্রন্থে তা বর্ণিত হয়।
৭.	চারমাইডিস Charmides	এ গ্রন্থে প্লেটো এথেনীয় যুবক সম্ভ্রদায়ের সাথে মিথ্যাচার নিয়ে আলোচনা করেন।
৮.	লাইসিস্ Lysis	বন্ধুত্বের স্বরূপ এবং পুণ্যবানদের মধ্যে এর অস্তিত্বের সম্ভবপরতা নিয়ে আলোচনাই এ গ্রন্থের মূল বিষয়।
৯.	রিপাবলিক Republic	ন্যায়পরায়ণতা, আদর্শ রাষ্ট্র প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা। অন্যান্য সংলাপের ন্যায় এ গ্রন্থেও প্লেটো তাঁর মূল বক্তব্য গল্প, প্রাচীন উপাখ্যান ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যক্ত করেন।
১০.	জর্জিয়াস Gorgias	শক্তিশালী বনাম দার্শনিকের অধিকার নিয়ে আলোচনা।
১১.	মেনো Meno	জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট সংজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা, আত্মায় সুপ্ত ধারণাবলিকে পুনর্জাগরিত করার জন্য সহজাত শক্তির প্রয়োজনীয়তা, জ্ঞানের মাত্রাভেদের অস্তিত্ব, লৌকিক ধারণা (Opinion) ও সত্যের পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়ের এ গ্রন্থে আলোচিত হয়।
১২.	ইউথিডেমাস্ Euthydemus	সোফিস্টদের বিরুদ্ধে আলোচনা এবং নির্ভুল চিন্তার জন্য সঠিক মানদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা এ গ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু।
১৩.	ক্র্যাটিলাস Cratylus	ভাব আদান-প্রদানের মুখ্য বাহন ভাষা নিয়ে আলোচনা।
১৪.	সিম্পোজিয়াম Symposium	সসীম মানবাত্মা কি করে না পাওয়া জিনিস পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকে এবং আদর্শ সৌন্দর্য, প্রজ্ঞা এবং প্রত্যয় জগতের জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে থাকে, এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা।
১৫.	ফিডো Phaedo	আত্মার অমরত্ব নিয়ে আলোচনা।
১৬.	ফিড্রাস Pheadrus	রিপাবলিকে আলোচিত বিষয়াদির গভীরতর বিশ্লেষণ এবং অপরাপর মানুষের সাথে আচার আচরণে কৃত্রিমতা পরিহার ও সত্য আবিষ্কারের জন্য আত্মার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনাই এ গ্রন্থের মূল বিষয়।
১৭.	থিয়্যাটিটাস Theaetetus	ইন্দ্রিয় সংবেদন সত্য আবিষ্কারে অক্ষম, সহজ স্বজ্ঞার মাধ্যমে সত্য-মিথ্যা নির্দেশ অসম্ভব, সার্থক জ্ঞানের জন্য স্বজ্ঞা ও বিশ্লেষণের সমন্বয় সাধন আবশ্যিক ইত্যাদি এ গ্রন্থের মূল সিদ্ধান্তাবলির কয়েকটি।
১৮.	পারমেনাইডিস Parmenides	এই একই সমন্বয়বাদের সমর্থন পারমেনাইডিস গ্রন্থেও লক্ষণীয়। এখানে মূর্ত অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্ক বর্জিত বিশুদ্ধ ও বিমূর্ত বুদ্ধিবাদের সমালোচনা করে এক আদর্শ মতবাদের সমর্থন করা হয়।
১৯.	সোফিস্ট Sophist	অসংখ্য সত্তার ধারণা থেকে কি করে পর্যায়ক্রমে একক সত্তার সমন্বিত হতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা।
২০.	ফাইলিবাস Philebus	এ গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় শুভের সাথে সুখের সম্বন্ধ।
২১.	টাইমিয়াস Timaeus	এ গ্রন্থে প্লেটো গোটা বিশ্বকে অনন্তের একটি চলমান ছবি বলে বর্ণনা করেছেন।
২২.	ল'স্ Laws	রিপাবলিক এর ন্যায় এখানেও রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তবে এখানে সামাজিক আচরণের জন্য আবশ্যিক বিধিনিয়ম নিয়ে অধিকতর বাস্তবধর্মী আলোচনা করা হয় এবং সাধারণ মানুষের আবেগ অনুভূতির প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়। এ গ্রন্থে গ্রিক আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা এবং মানবজীবন সম্পর্কেও অনেক মূল্যবান মন্তব্য করা হয়।

এরিস্টটল

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

- এরিস্টটল (খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪-৩২২) ছিলেন প্রাচীন গ্রিক একজন প্রভাবশালী দার্শনিক ও বিজ্ঞানী।
- তিনি যুক্তিবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, রাজনীতি, বিজ্ঞান এবং আরও অনেক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।
- প্লেটোর শিষ্য এবং আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের শিক্ষক হিসেবেও তিনি পরিচিত।
- তাঁকে প্রাণিবিজ্ঞানের জনক বলা হয়।

এরিস্টটল-

- এরিস্টটলের অনুসৃত পদ্ধতি- আরোহ পদ্ধতি
- এরিস্টটল প্লেটোর শিষ্য ছিলেন
- এরিস্টটল আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটকে শিক্ষাদান করেন।
- এরিস্টটল লাইসিয়াম (Lyceum) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন।****
- এরিস্টটলের সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ- Nicomachean Ethics (নৈতিকতা নিয়ে)
- এরিস্টটলের দর্শনের মূল লক্ষ্য ছিল- "সর্বোচ্চ মঙ্গল" (Supreme Good) অর্জনের পথ খোঁজা।
- এরিস্টটলের মতে মানুষের চূড়ান্ত লক্ষ্য-সুখ বা 'ইউডাইমোনিয়া' (Eudaimonia)
- এরিস্টটলের যুক্তিবিদ্যার নাম- সিলোজিজম (Syllogism)
- এরিস্টটল চারটি ভূমি, পানি, বায়ু ও অগ্নি মৌলিক উপাদানের কথা বলেন।
- এরিস্টটলের রাষ্ট্রচিন্তায় ছয়টি শাসনব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে।- তিনটি ভাল (রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, গণতন্ত্র) ও তিনটি খারাপ (সাম্রাজ্যবাদ, অলিগার্কি, গণ Mob Rule)

অনুসন্ধান পদ্ধতি:

প্লেটো:

General to particular --Deductive

এরিস্টটল: Particular to General -- Inductive

দর্শন

প্লেটোর দর্শন- ভাববাদী/Idealist

এরিস্টটলের দর্শন- বাস্তববাদী/Realist

এরিস্টটলের মতে-

- যে নাগরিক শাসন মেনে চলতে পারে তিনিই সূনাগরিক
- দাসরা দুই শ্রেণীর। প্রকৃতিগত ও আইনগত।
- এরিস্টটল শ্রমজীবী শ্রেণীকে অজীব বা যন্ত্রপাতি বলে অভিহিত করেছেন।

- বিপ্লবের সাধারণ কারণকে এরিস্টটল যে তিনভাগে ভাগ করেছেন সেগুলো হলো-(i) মনস্তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য, (ii) মুনাফা বা সম্মান লাভের বাসনা ও (iii) প্রাথমিক অবস্থানসমূহ
- বাস্তবধর্মী ও উত্তম সরকার- পলিটি
- সর্বোৎকৃষ্ট সরকার- রাজতন্ত্র
- শাসনক্ষমতা মধ্যবিভক্ত হতে থাকা উচিত।

অবদান

- রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে নীতিশাস্ত্র থেকে পৃথক করে Master of Science বলেন।
- ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রবক্তা
- বিপ্লব তত্ত্ব- ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে বিপ্লবী হয়। বিপ্লবের দুট কারণ- সাধারণ এবং বিশেষ।
- নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তক।
- আইনের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা- সবার উপরে আইন।
- রাষ্ট্রের লক্ষ্য কল্যাণকর জীবনের নিশ্চয়তা যা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা দেয়। তার মতে আদর্শ রাষ্ট্র-এর জনসংখ্যা ১০০০০ উত্তম তবে ১ লক্ষের বেশি ন।

এরিস্টটলের সরকারের শ্রেণিবিভাগ:

- দু'টি নীতির উপর ভিত্তি করে এরিস্টটল সরকারের শ্রেণিবিভাগ করেন। এগুলো হচ্ছে:
 - ক) শাসন ক্ষমতায় নিয়োজিত ব্যক্তির সংখ্যা/সংখ্যা নীতি
 - খ) সরকারের উদ্দেশ্য।

ক) সংখ্যানীতির উপর ভিত্তি করে: তিনি উল্লেখ করেন যে সরকার তিন ধরনের।

১. একজনের শাসন
 ২. কয়েকজনের শাসন
 ৩. বহুজনের শাসন
- খ) সরকারের উদ্দেশ্যঃ

- সরকারের শুদ্ধরূপ/স্বাভাবিক শাসন
 ১. রাজতন্ত্র
 ২. অভিজাততন্ত্র
 ৩. ন্যায়তন্ত্র
- সরকারের বিকৃতরূপ
 ১. স্বৈরতন্ত্র
 ২. কুলীনতন্ত্র
 ৩. গণতন্ত্র

সরকার		
সংখ্যা নীতি	উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নীতি	
শাসকের সংখ্যা	স্বাভাবিক	বিকৃত
একজনের শাসন (Rule by one)	রাজতন্ত্র (Monarchy)	স্বৈরতন্ত্র (Tyranny)
কয়েকজনের শাসন (Rule by a Few)	অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)	ধনিকতন্ত্র/কুলীনতন্ত্র (Oligarchy)
অনেকের শাসন (Rule by Many)	গণতন্ত্র (Polity)	জনতান্ত্র (Democracy)

- তিনি পলিটিকে উত্তম সরকার এবং জনতান্ত্রকে নিকৃষ্ট সরকার বলেছেন।

তাওবাদ (Taoism)

- তাওবাদ (Taoism) হলো একটি চীনা ধর্ম এবং দার্শনিক ব্যবস্থা, যা 'তাও' বা 'পথ'-এর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। এটি প্রকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে জীবনযাপন এবং অকর্মণ্যতার (wu wei) মাধ্যমে জীবনের সারমর্ম উপলব্ধি করার শিক্ষা দেয়।
- উদ্ভব- চীনে
- তাওবাদের প্রতিষ্ঠাতা- লাওজু(Laozi বা Lao-Tzu)।
- তাওবাদ দর্শন এবং ধর্ম।
- তাওবাদের মহাজাগতিক ধারণাটি এসেছে "ইন-ইয়াং" বা তাইচির মতবাদ থেকে।
- তাওবাদের মূল গ্রন্থ/ধর্মগ্রন্থ হলো তাও তে চিং (Tao Te Ching)। রচয়িতা লাওসু (Lao Tzu)।
- তাওবাদের মূল লক্ষ্য- প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপন ও আধ্যাত্মিক শান্তি লাভ করা
- তাওবাদ নির্দিষ্ট কোনো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না; বরং প্রকৃতি ও শক্তির ভারসাম্যে বিশ্বাস করে।
- মৃত্যুকে জীবনের প্রাকৃতিক অংশ হিসেবে গ্রহণ করা হয়; এটি পুনর্জন্ম বা রূপান্তরের একটি ধাপ।
- চীন, তাইওয়ান, হংকং এবং চীনা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত।

বৈশিষ্ট্য

সরলতা, নম্রতা, প্রাকৃতিকতার প্রতি শ্রদ্ধা ও অনাকাঙ্ক্ষা

তাওবাদের ধর্মীয় আচার

ধ্যান, যোগব্যায়াম, তাওয়িস্ট মন্দিরে উপাসনা, প্রাণশক্তি চর্চা।

নৈতিকতা

প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলার মাধ্যমে নৈতিকতা অর্জন হয়; বাহ্যিক নিয়ম নয় বরং আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য গুরুত্বপূর্ণ।

তাওবাদের মূল ধারণাগুলো হলো:

১) তাও (Tao):

তাও অর্থ পথ, নিয়ম। এটি মহাবিশ্বের মৌলিক নীতি, যা সবকিছু সৃষ্টি করে এবং নিয়ন্ত্রণ করে। এটি একটি অসীম, অরূপ এবং অব্যক্ত শক্তি।

২) ইয়াং (Yin and Yang):

এই দুটি বিপরীত শক্তি তাওবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা।

ইয়িন (Yin) হলো নারী, অন্ধকার, এবং কোমলতা,

আর ইয়াং (Yang) হলো পুরুষ, আলো, এবং কঠোরতা। এই দুটি শক্তির মিলন ও ভারসাম্যই প্রকৃতির নিয়ম।

৩) অকর্মণ্যতা (Wu Wei):

এর অর্থ হলো প্রচেষ্টা ছাড়াই কাজ করা বা প্রকৃতির নিয়মের সাথে সঙ্গতি রেখে কাজ করা। এর মানে নিষ্ক্রিয়তা নয়, বরং কর্মের মাধ্যমে প্রকৃতির সাথে একাত্ম হওয়া।

৪) শারীরিক ও আত্মিক উন্নতি:

তাওবাদ শারীরিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির উপর জোর দেয়। এর মধ্যে কিছু অনুশীলন যেমন ধ্যান, যোগ, এবং তাই চি অন্তর্ভুক্ত।

ইবনে খালদুন***

- ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) ছিলেন একজন আরব পণ্ডিত, যিনি মূলত তার ঐতিহাসিক এবং সমাজতাত্ত্বিক কাজের জন্য পরিচিত।
- পুরো নাম- আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খালদুন আল-হাদরামি।
- ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রমাণ করেন ইতিহাস প্রণয়নে সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা অপরিহার্য। তাকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের জনক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল-মুকাদ্দিমা' (The Muqaddimah)(১৩৮০ সালে রচিত)। এটি তার বিশ্বকোষীয় ইতিহাস 'কিতাব আল-ইবার' (Kitab al-Ibar)-এর ভূমিকা, তার রাষ্ট্রদর্শনের মূল ভিত্তি। এতে রয়েছে ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ও নৃবিজ্ঞান। এটি Kitab al-Ibar নামক বৃহৎ ইতিহাসগ্রন্থের প্রথম খণ্ড। আল-মোকাদ্দিমার তৃতীয় অধ্যায়- 'The Prince' গ্রন্থের সাথে তুলনা করা হয়।
- সমাজের ভিত্তি বা রাষ্ট্রীয় শক্তির মূল প্রেরণা- গোষ্ঠী সংহতি। এটিই আসাবিয়াহ।
- ইবনে খালদুনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ- আর-রিহালা আত-তারিফ।
- ইবনে খালদুনের মতে সভ্যতার চক্র উদ্ভব, বিকাশ ও পতনের মধ্য দিয়ে চলে।

ইবনে খালদুনের মতে-

- আসাবিয়াহ ধর্মনিরপেক্ষ বা আধা ধর্ম নিরপেক্ষ নীতির ভিত্তিতে গঠিত।
- মূলক বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সংহতির মূল লক্ষ্য।
- যেকোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি বলিষ্ঠ অর্থনীতি। এজন্য প্রয়োজন সুষম বাজেট।
- রাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতি স্থাপনে ধর্মের প্রভাব অপরিসীম।

আল মুকাদ্দিমা

বইয়ের ভূমিকা খণ্ডে রয়েছে মোট ছয়টি অংশ।

ক. মানবসমাজ- জাতিতত্ত্ব এবং নৃতত্ত্ব,

খ. গ্রামীণ সভ্যতা,

গ. সরকার ও রাষ্ট্রের ধারণা,

ঘ. শহুরে সভ্যতা,

ঙ. অর্থনীতিও

চ. বিজ্ঞান এবং মানবতা

আসাবিয়াহ/সামাজিক সংহতির তত্ত্ব :***

এটি হলো একটি গোষ্ঠী বা উপজাতির মধ্যকার সংহতি, সংহতি এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার অনুভূতি। খালদুনের মতে আসাবিয়াহ সমাজবিজ্ঞানের কেন্দ্রবিন্দু। রাষ্ট্রের "উৎপত্তি, বিকাশ, শীর্ষারোহণ, অবক্ষয় ও পতন (Origin, Growth, Peak, Decline and Fall) সবকিছু গোষ্ঠী সংহতির আনুপাতিক পরিমাণের উপর নির্ভরশীল।

রাষ্ট্রের প্রকারভেদ

তিন প্রকার রাষ্ট্র বা সরকারের পার্থক্য করেন-

- ধর্মভিত্তিক (সিয়াসা দ্বীনিয়া)
- যুক্তিভিত্তিক (সিয়াসা আকলীয়া)
- দার্শনিকদের আদর্শ রাষ্ট্র (সিয়াসা মাদানীয়া)

রাষ্ট্রের আয়ু

৫ পর্বে রাষ্ট্র বিলীন হয় বা রাষ্ট্রের আয়ু নির্ধারিত হয়। রাষ্ট্র কখনো সহস্রাবর্ষী হতে পারে না

১) প্রথম ধাপ: প্রতিষ্ঠা ও সংহতি (The Stage of Foundation):

একটি শক্তিশালী আসাবিয়াহর অধিকারী উপজাতি বা গোষ্ঠী একটি দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রকে পরাজিত করে।

২) দ্বিতীয় ধাপ: স্থিতিশীলতা ও কেন্দ্রীয়করণ (The Stage of Consolidation):

নতুন শাসক তাদের ক্ষমতাকে সুসংহত করে এবং একটি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

৩) তৃতীয় ধাপ: সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা (The Stage of Luxury):

১. রাজ্য অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়।
২. শাসক এবং অভিজাত শ্রেণি বিলাসবহুল জীবনযাপন শুরু করে।
৩. সামরিক বাহিনী এবং জনগণের মধ্যে দুর্বলতা আসে এবং আসাবিয়াহর শক্তি দ্রুত হ্রাস পায়।

৪) চতুর্থ ধাপ: অবক্ষয় (The Stage of Decline):

শাসক গোষ্ঠী বিলাসিতার কারণে দুর্বল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে।

৫) পঞ্চম ধাপ: পতন (The Stage of Fall):

এই সময়েই একটি নতুন শক্তিশালী আসাবিয়াহর অধিকারী উপজাতি বা গোষ্ঠী তাদের স্থান দখল করার জন্য প্রস্তুত হয়, এবং চক্রটি আবার শুরু হয়।

ইমাম গাজ্জালী

- আল-গাজ্জালী ইরানের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত তুস নগরীতে ১০৫৮ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৪৫০ হিজরি সনে জন্মগ্রহণ করেন।
- আল-গাজ্জালি (আনু. ১০৫৮ ১৯ ডিসেম্বর ১১১১) পূর্ণ নাম আবু হামিদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ তুসী আল-গাজ্জালি।
- গাজ্জাল শব্দের আভিধানিক অর্থ সুতা কাটা।
- ইমাম গাজ্জালীর মাজার ইরানের তুস শহরে অবস্থিত।
- তার অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' বা 'ইসলামের রক্ষক' বলা হয়ে থাকে।
- ৮১টি গ্রন্থ রচনা করেন।
- ইমাম গাজ্জালীর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হল "এহইয়া-উল-উলুমউদ্দীন" (Ihya Ulum al-Din), যেখানে তিনি দর্শন ও ইসলামী ধর্মতত্ত্বের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন।
- ইমাম গাজ্জালী "তাহাফুত আল-ফালাসিফা" (তাহাফত আল-ফালাসিফা) নামক গ্রন্থে দার্শনিকদের মতবাদ ইসলামের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করেন।
- ইসলামের আধ্যাত্মিক দিক থেকে তিনি সুফিবাদ গ্রহণ ও সমর্থন করেন।
- যুক্তি ও চিন্তার মাধ্যমে তিনি বিশ্বাসকে শক্তিশালী করার কথা বলেছেন।
- আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক চরিত্র গঠনে গুরুত্ব দেন।
- ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা যায় না। সত্ত্বার মাধ্যমে পরম সত্ত্বার জ্ঞান লাভ করা যায়।
- তিবরুল মসবুক গ্রন্থে শাসকের গুণ আলোচনা করেন। ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহর প্রতিনিধি।
- জ্ঞান ২ প্রকার। দুনিয়াবি ও আখিরাতের জ্ঞান।

Lecture: 04

টপিক: আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা

ম্যাকিয়াভেলি

টমাস হবস

জন লক

মন্টেস্কু

জ্যা জ্যাক রুশো

কার্ল মার্কস

- অধ্যাপক ওয়েপার (Prof. Wayper) বলেন, "রাষ্ট্র দর্শন বলতে বুঝায় সেই দর্শন যা রাষ্ট্রের গঠন প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করে।"

প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রচিন্তা:

- খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯ অব্দ হতে ২৬ অক্টো পর্যন্ত প্রাচীন যুগের পরিব্যাপ্তি।

- এযুগের রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নৈতিকতা ও যুক্তিবাদের সমন্বয়।
- গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তাবিদ সক্রেটিস প্লেটো ও এরিস্টটল এবং রোমান চিন্তাবিদ পলিবিয়াস সিসেরো ও সেনেকা প্রাচীন যুগের রাষ্ট্রচিন্তা বিকাশে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে।

মধ্যযুগীয় রাষ্ট্রচিন্তা:

- ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগের সময়সীমা বিস্তৃত।
- রাষ্ট্রতত্ত্বের অনুপস্থিতি, স্টোয়িকবাদের প্রভাব, গির্জা ও রাষ্ট্রের মত বিরোধ, বিশ্বজনীনতাবাদ, সামন্তবাদ, পোপ তন্ত্র এবং ধর্মীয় আধিপত্য ছিল মধ্যযুগের অন্যতম রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য।
- সেন্ট অগাস্টিন, সেন্ট টমাস একুইনাস, দান্তে এবং মার্সিলিও অব পদুয়া ছিলেন মধ্যযুগের অন্যতম রাষ্ট্রচিন্তাবিদ।

আধুনিক যুগ:

- পঞ্চদশ শতাব্দীতে সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগের সূত্রপাত।
- আধুনিক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Modern যার উদ্ভব হয়েছে Mode থেকে। Mode অর্থ পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া।
- ম্যাকিয়াভেলি আর রচনাতে রাষ্ট্রীয় আইন ঐশ্বরিক আইন যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তা স্পষ্ট করে বলেন ফলে ধর্ম রাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি রাষ্ট্রকে সার্বভৌম শক্তির প্রতীক বলে মনে করেন।
- আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল জাতি রাষ্ট্রের উদ্ভব, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সাম্য, সামাজিক চুক্তি ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ।
- এছাড়াও উপযোগবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, উদারতাবাদ, কাল্পনিক সমাজবাদ ও পুঁজিবাদ প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য।
- ম্যাকিয়াভেলি, টমাস হবস জন, লক, রুশো, মন্টেস্কু, হেগেল, গ্রীন, কান্ট, বেহ্মাম, যে এস মিল ও কার্ল মারকস আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

সাম্প্রতিককালের রাষ্ট্রচিন্তা:

- ১৮৩১ সাল থেকে আমার পর্যন্ত রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদই সাম্প্রতিককালে রাষ্ট্রচিন্তা।
- হার্বার্ট স্পেন্সার রাষ্ট্রচিন্তা কে বিজ্ঞানসম্মত করে তোলার জন্য বিবর্তনবাদ ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের প্রবর্তন করেন।
- কান্ট তার রাষ্ট্র দর্শনে শান্তি শৃঙ্খলার কথা তুলে ধরেন।
- নিয়মতান্ত্রিক ও পরিকল্পিত রাষ্ট্রের প্রবক্তা হিসেবে হেগেল ও ফিকটে জনপ্রিয়।
- হেগেলের দ্বন্দ্বিক পদ্ধতি জার্মানিতে জাতীয়তাবাদের সূচনা করে।
- কার্ল মার্কস হেগেলের দ্বন্দ্বিক পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যার মূল লক্ষ্য ছিল শ্রেণী বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
- টি এইচ গ্রীন বলেন, "শক্তি নয় স্থায়ী রাষ্ট্রের ভিত্তি।"

রেনেসাঁস (Renaissance):

- ল্যাটিন শব্দ 'Renesance' থেকে এসেছে যার অর্থ নবজাগরণ বা পুনর্জাগরণ।
- রেনেসাঁ হলো একটি বিপ্লব, যার মাধ্যমে একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ মানুষের ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি, চিন্তা ও বিবেকের বিকাশকে রেনেসাঁস বলে।
- রেনেসাঁসের ফলে খ্রিষ্টান ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার সাধিত হয়।
- ইতালিকে রেনেসাঁর সূতিকাগার বলা হয়।
- রেনেসাঁ মূলত একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন।

সংস্কার আন্দোলন:

- সংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement) এর ফলে পোপের ক্ষমতা হ্রাস পায়। মধ্যযুগে ধর্মীয় তথা পোপদের অত্যাচার, নিপীড়ন ও স্বৈচ্ছাচারিতা থেকে মুক্তির লক্ষে সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে।
- মার্সিলিও অব পাদুয়া, উইলিয়াম ওকাম, সিলভিয়াস, পিয়ার ডি. এলিট প্রমুখ দার্শনিকদের অবদানে সংস্কার আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।
- এর ফলে জনগণের যুক্তিবাদিতা ও ব্যক্তিস্বাভিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- মার্সিলিও এবং উইলিয়াম গির্জার সংস্কার সাধনের লক্ষে পরিষদ (Councillor) গঠনের প্রস্তাব করেন।
- গুটেনবার্গ মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কার করেন ১৪৫০ সালে।
- গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Movement) হয় ১৬৬৮ সালে।
- ফরাসি বিপ্লব হয় ১৭৮৯ সালে।

গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ ও তাদের অবদান:

-নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি (Niccolò Machiavelli): আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক হিসেবে তাঁকে ধরা হয়। তিনি রাষ্ট্রের বাস্তববাদী ও ক্ষমতাভিত্তিক চিত্র তুলে ধরেন।

-জ্যা বোঁদা (Jean Bodin): তিনি সার্বভৌমত্বের ধারণাটি প্রবর্তন করেন, যা রাষ্ট্রের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বোঝায়।

-জন লক (John Locke): উদারনীতিবাদ, জনগণের সার্বভৌমত্ব, এবং সীমিত সরকারের ধারণার প্রবক্তা। তিনি সরকারের দায়িত্বশীলতা এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করার ওপর জোর দেন।

-জ্যাঁ-জ্যাক রুশো (Jean-Jacques Rousseau): সামাজিক চুক্তি ও সাধারণ ইচ্ছার (General Will) ধারণার মাধ্যমে জনগণের সার্বভৌমত্বকে আরও শক্তিশালী করেন।

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি

- নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি ১৪৬৯ সালে ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৪৯৪ সালে সরকারি চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং ১৪৯৮ সালে সচিব পদ লাভ করেন।
- ১৫১২ সালে ফ্লোরেন্স শহরে নির্বাসিত হন।
- ১৫২৭ সালে ৫৮ বছর বয়সে মারা যান।
- বিখ্যাত গ্রন্থ হলো- The Prince, The Discourse, Florentine History, The Art of War.
- ১৫১৩ সালে ম্যাকিয়াভেলি The Prince বইটি লিখেছিলেন ফ্লোরেন্সের তৎকালীন রাজা পিয়ারো ডি মেডিচির পুত্র প্রিন্স লরেনজোর প্রতি উপদেশমূলক গ্রন্থ হিসেবে। The Prince গ্রন্থ কাকে উৎসর্গ করা হয়- Lorenzo de Medici
- সর্বপ্রথম জাতীয় রাষ্ট্র ধারণা প্রবক্তা- ম্যাকিয়াভেলি।
- জাতীয় সেনাবাহিনী গঠনের পরামর্শ দেন ম্যাকিয়াভেলি।
- নৈতিকতার দৈতনীতি" তত্ত্বের প্রবক্তা ম্যাকিয়াভেলি।
- আধুনিক কূটনীতির জনক বলা হয় ম্যাকিয়াভেলিকে।
- প্রজাতান্ত্রিক সরকার নিয়ে আলোচনা করেন- The Discourse গ্রন্থে।

অবদান

- জাতীয়তাবাদী ধারণার প্রবর্তন
- রাষ্ট্র সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা
- রাজনীতিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি স্থাপন
- আইনের শাসন

- সার্বভৌম রাষ্ট্রের ধারণা
- ক্ষমতা সম্প্রসারণ নীতি
- ধর্ম থেকে রাজনীতি পৃথকীকরণ
- ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র
- নৈতিকতার আধুনিক ব্যাখ্যা
- উপযোগবাদের প্রবক্তা
- জাতীয় রাষ্ট্রের প্রবক্তা

ম্যাকিয়াভেলিবাদ

"শাসক রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য প্রয়োজনবোধে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কঠোর, নির্মম, বেআইনি ও অন্যায়ের পথে অগ্রসর হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এটিই ম্যাকিয়াভেলিবাদ' (Machiavellism)। এ মতবাদের নির্গলিত অর্থ হচ্ছে "শঠতা, কপটতা, প্রতারণা, ধোঁকাবাজি ও দ্বিমুখী নীতি।" রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে ম্যাকিয়াভেলিবাদকে একটি ঘৃণিত ও কুখ্যাত মতবাদ হিসেবে স্বীকৃত হলেও বর্তমান বিশেষ আন্তর্জাতিক কূটনীতির এটিই হচ্ছে মূলভিত্তি।"

দ্য প্রিন্স (The Prince)***

- নিকোলো ম্যাকিয়াভেলির সবচেয়ে বিখ্যাত এবং প্রভাবশালী গ্রন্থ।
- রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ক বই, যেখানে নতুন রাজকুমারদের জন্য একটি বাস্তবসম্মত নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে।
- ম্যাকিয়াভেলি এই বইটিতে দেখিয়েছেন যে একটি রাষ্ট্র অর্জন এবং তা বজায় রাখার জন্য কখনও কখনও অনৈতিক বা সহিংস পন্থার প্রয়োজন হতে পারে, যা তাকে একজন বিতর্কিত দার্শনিক হিসেবে পরিচিতি দেয়,

ডিসকোর্সেস অন লিভি (Discourses on Livy)

-এই রচনাটি রোমান ইতিহাসবিদ লিভির লেখা "ল্যাটি ইতালীয়" (History of Rome) এর প্রথম দশটি বইয়ের উপর ভিত্তি করে লেখা একটি কাজ।

-এই গ্রন্থে ম্যাকিয়াভেলি প্রজাতন্ত্রের উপর জোর দিয়েছেন এবং একটি প্রজাতন্ত্রের ধারণা ও তার টিকে থাকার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

দ্য আর্ট অফ ওয়ার (The Art of War)

-এটি ম্যাকিয়াভেলির সামরিক বিষয় নিয়ে লেখা একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, যেখানে যুদ্ধের কৌশল এবং সামরিক সংগঠন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাষ্ট্র ও শাসন সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির মতামত:

- ম্যাকিয়াভেলি প্রথম বলেন- রাষ্ট্রই হলো একমাত্র মানবিক প্রতিষ্ঠান।
- W.T. Jones বলছেন "Machiavelli was the child of Florence and of the Renaissance."
- According to Lord Bryce "A Nation is a Nationality when it has organized itself into a political body, either independent or desiring to be independent"
- জাতি রাষ্ট্র হলো এমন একটি জনসমষ্টি যারা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা কায়ম করছে বা কায়ম করতে আগ্রহী।
- ১৬৪৮ সালে ওয়েস্ট ফেলিয়ার শান্তিচুক্তির মধ্যে দিয়ে ভূখণ্ডীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার গোড়া পত্তন হয়।
- জাতীয়তার ভিত্তিতে সৃষ্ট রাষ্ট্রই হলো জাতি রাষ্ট্র (Nation State).

- পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান সাম্রাজ্যের পতনের মধ্যে দিয়ে Landlord (জমিদার) দের অধীনে সামন্তবাদী সমাজের বিকাশ ঘটে যা পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের স্যার সপ্তম হেনরী, ফ্রান্সের ষোড়শ লুই, স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পিটার দ্যা গ্রেট এদের নেতৃত্বে তীব্র আন্দোলনের ফলে সামন্তবাদী সমাজের পতন হয় এবং জাতি রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া দ্রুত হয়।
- সামন্তবাদের অবসানের মধ্যে দিয়ে পুজিবাদের উত্থান হয়।
- ম্যাকিয়াভেলির মতে, "Man do sooner forget the death of their father than the loss of their patrimony." (The Prince)
- ম্যাকিয়াভেলি বলেন- The end of the state is that which rulers and people do actually propose to themselves." (শাসক ও জনগণ প্রকৃতভাবে নিজেরা যা চায় তাই হলো রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য।)
- তার মতে "শাসক রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য প্রয়োজনবোধে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কঠোর, নির্মম, বেআইনি ও অন্যায়ের পথে অগ্রসর হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।" (The Prince)
- End justifies the means, not mean the end ম্যাকিয়াভেলি

সরকার সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির মতামত:

-The Prince Discourse গ্রন্থে সরকারের শ্রেণীবিভাগ নিয়ে তার মতামত ব্যক্ত করেন।

-তার মতে, সরকার দুই প্রকার:

১. প্রজাতন্ত্র: যেখানে জনগণ ন্যায়পরায়ণ, দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত ঐক্যবদ্ধ, বলিষ্ঠ ও স্বাধীন সময় সেখানে প্রজাতান্ত্রিক শাসন সক্ষম

২. রাজতন্ত্র: রাজতান্ত্রিক সরকারের ক্ষেত্রে দুইটি বিশেষ পরিস্থিতির কথা বলেন:

ক. একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনের সময়

খ. একটি দুর্নীতিগ্রস্ত রাষ্ট্রের সংস্কারের জন্য রাজতান্ত্রিক সরকার প্রয়োজন।

-তার মতে রাজা বা শাসক অনেক ক্ষেত্রে আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারেন। শাসকের দুটি বৈশিষ্ট্য-

- সৎ বা আইনি শক্তিসম্পন্ন

- পাশবিক শক্তিসম্পন্ন

ম্যাকিয়াভেলি

-The Prince গ্রন্থে রাজতন্ত্রকে সমর্থন করছেন।

-Discourse গ্রন্থে প্রজাতন্ত্রকে সমর্থন করছেন।

-"আইনের শাসনই হবে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা রক্ষার প্রধান নিয়ামক।" ম্যাকিয়াভেলি

ধর্ম সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির মতামত:

- ম্যাকিয়াভেলি-রাজনীতি থেকে ধর্ম ও নৈতিকতা আলাদা করেন।
- তার মতে ধর্ম হচ্ছে পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপার। তাই রাজনীতিতে দৈব বা অতি প্রাকৃতিক শক্তির হস্তক্ষেপ ঘটে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। তাই রাষ্ট্রকে ধর্মীয় বেডাজাল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে।

নৈতিকতা সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির মতামত:

তিনি দুই ধরনের নৈতিকতার কথা বলেন-

ক. ব্যক্তিগত নৈতিকতা: ব্যক্তি জীবনে দুর্নীতি বা অসৎ পথ পরিহার করা ও সমাজ স্বীকৃত রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা।

খ. সরকারি বা শাসকের নৈতিকতা: রাষ্ট্র রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিকতা। তার মতে, শাসকের কাছে রাষ্ট্রের যুক্তিই হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুক্তি। ধর্ম ও নৈতিকতা হলো রাষ্ট্রের গৌণ উপাদান মাত্র।

ক্ষমতা, আইন ও আইনপ্রণেতা সম্পর্কে ম্যাকিয়াভেলির মতামত:

- তার ক্ষমতা তত্ত্ব অনুযায়ী আইনের তুলনায় বলপ্রয়োগ বা পাশবিকতার পন্থা অধিক স্বীকৃত। তার এই তত্ত্ব সর্বশক্তিমান আইনপ্রণেতার ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।
- তিনি -Everywhere enemies of all civil government বলে উল্লেখ করেন- রাষ্ট্রের অভিজাত শ্রেণিকে।
- তার মতে- "শাসক রাষ্ট্রের স্বার্থের জন্য প্রয়োজনবোধে নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কঠোর, নির্মম, বেআইনি ও অন্যায়ের পথে অগ্রসর হয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে।" (The Prince)
- তার মতে রাজা বা শাসক অনেক ক্ষেত্রে আইনের উর্ধ্বে থাকতে পারেন। The Prince গ্রন্থে রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন।

-বুর্জোয়া (Bourgeoisie): জার্মান শব্দ "বার্গ" থেকে এসেছে যার অর্থ দুর্গ। সুতরাং বুর্জোয়া বলতে বোঝায় দুর্গের মালিকদের।

"A Prince should combine the qualities of a fox and a lion" (The Prince)

টমাস হবস

- টমাস হবস ১৫৮৮ সালের ৫ এপ্রিল ইংল্যান্ডের Malmesbury-এর এক ধর্মযাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৬০৮ সালে হবস মাত্র ২০বছর বয়সে অক্সফোর্ড হতে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।
- হবস ফরাসি ও ইতালিয় ভাষায় শিক্ষকতা করেন।
- হবসের রাজনৈতিক দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্য বস্তুবাদিতা (Materialism)।

টমাস হবসের রচনাবলি হলো:

- মাত্র ১৪ বছর বয়সে "The Media of Europides" গ্রীক হতে ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।
- রাজার চরম কর্তৃত্ব সমর্থন করে ১৬৪০ সালে "The Elements Laws" গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থে রাজার পক্ষাবলম্বন ও পার্লামেন্টের বিরোধিতা করেন।
- "De Cive" গ্রন্থে রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করেন।
- "Human Nature" গ্রন্থে মানুষ ও নাগরিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।
- মানব প্রকৃতির উপর "De Homie" গ্রন্থ রচনা করেন।
- হবসের রাজনীতি বিষয়ক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "Leviathan"। এ গ্রন্থে পদার্থবিদ্যা ও মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

মানব প্রকৃতি সম্পর্কে হবসের ধারণা:

- তার মতে মানুষ অন্যান্য জড়বস্তুর ন্যায় পদার্থ।

- তিনি বলেন- A General inclination of all mankind is perpetual and restless desire for power after power, that ceaseth only in death."
- "তার মতে মানুষ সম্পূর্ণভাবে স্বাতন্ত্র্যবাদী। অপরের সর্বস্ব হরণ করে স্বীয় স্বার্থরক্ষা ও স্বীয় উন্নতি সাধনই তার অন্তর্নিহিত প্রকৃতি।
- তার মতে রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বাবস্থাকে প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature) বলে আখ্যায়িত করেন।
- তার মতে মানুষ স্বভাবতই লোভী, স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক ও আত্মসুখ- সন্ধানকারী। (Human nature is nasty, brutish, solitary, poor and short.)

সার্বভৌমত্ব তত্ত্ব:

- রাষ্ট্র ও শাসকের হাতে অপরিমেয় ক্ষমতা প্রদান করে তিনি চরম সার্বভৌমত্ব (Absolute Sovereignty) ধারণা প্রকাশ করেছিলেন।
- সর্বাঙ্গিকবাদের মূলকথা হলো সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী রাষ্ট্র ব্যক্তি নয়।
- "War of every man Against every man" উক্তিটি হবসের।
- হবস প্রকৃতির রাজ্যের বর্ণনা "মানুষের জীবন নিঃসঙ্গ, দীন, কদর্য, পশুতুল্য এবং স্বল্পায়ু।"

সামাজিক চুক্তি মতবাদ:

-প্রাকৃতিক রাজ্য (State of Nature): হবস বিশ্বাস করতেন যে মানুষ যখন কোনও সংগঠিত সমাজ বা সরকারের অধীনে ছিল না, তখন তাদের জীবন ছিল চরম বিশৃঙ্খলাপূর্ণ ও বিপজ্জনক। এখানে কোন আইন বা ন্যায়বিচার ছিল না, ফলে শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপর অত্যাচার করত।

সামাজিক চুক্তি (Social Contract): ভয়াবহ অবস্থা থেকে বাঁচতে মানুষ পারস্পরিকভাবে একটি চুক্তিতে আসে। তারা তাদের সকল স্বাধীনতা ও ক্ষমতা একটি সর্বশক্তিমান শাসকের হাতে তুলে দেয়।

নিরঙ্কুশ ক্ষমতা (Absolute Sovereignty): এই চুক্তির মাধ্যমে যে সরকার বা শাসক প্রতিষ্ঠিত হয়, তার ক্ষমতা হয় নিরঙ্কুশ। জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই হলো শাসকের প্রধান কাজ এবং জনগণ তাদের সেই ক্ষমতা প্রদান করে। এই শাসক "লেভিয়াথান" (Leviathan) নামে পরিচিত, যার কথা হবস তার বিখ্যাত গ্রন্থ "লেভিয়াথান" এ ব্যাখ্যা করেছেন।

জন লক

- ১৬৩২ সালে ইংল্যান্ডের ব্রিস্টলের অন্তর্গত সমারসেট শহরের Wrington স্থানে জন্মগ্রহণ করেন।
- ১৬৬৬ সালে "হুইক পার্টি" তে যোগদানের মাধ্যমে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন।
- লক বলেন জনগণ রাজনৈতিকভাবে সার্বভৌম এবং পার্লামেন্ট আইনগতভাবে সার্বভৌম।
- জন লককে সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক বলা হয়। কারণ আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের ধারণা সর্বপ্রথম তার নিকট থেকে পাওয়া যায়।
- ১৬৮৩ সালে সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হয়ে হল্যান্ড পলায়ন করে এবং ১৬৮৯ সালে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।
- Bill of Rights ঘোষণা করেন- উইলিয়াম অব অরেঞ্জ।
- জন লক ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডের বস্তুবাদী দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনায় উজ্জীবিত এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রচিন্তা সমর্থক।
- ১৭০৪ সালে ৭২ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন।

জন লকের রচনাবলি হলো:

- "Letters Concerning Toleration": রাষ্ট্রের সঙ্গে গীর্জার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন।

- "Two Treaties on Civil Government" ১৬৯০ সালে প্রকাশিত হয়। এটি ২খন্ডে বিভক্ত। প্রথম খন্ডে রবার্ট ফিলমোর প্রচারিত রাজার দৈব অধিকার সম্পর্কিত তত্ত্বকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় খন্ডে সামাজিক চুক্তি মতবাদ সহ তার প্রকৃত রাষ্ট্র দর্শন প্রকাশ পেয়েছে।
- "Essay on Human Understanding" এই গ্রন্থে লক তার বস্তুবাদী অভিজ্ঞতা এর 'জ্ঞানতত্ত্ব' ব্যাখ্যা করেন।
- "Some Thoughts Concerning Education" এই গ্রন্থে শিক্ষা, শিক্ষা-পদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা করেন।
- "The Conduct of the Understanding" এটি তার অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ:

প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature): লক মনে করেন, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ স্বাধীন ও সমান ছিল। এখানে কোনো সরকার ছিল না, তবে মানুষ প্রাকৃতিক আইন দ্বারা পরিচালিত হতো। তার মত প্রকৃতির রাজ্য ছিলো শান্তিময়, পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষার রাজ্য।

প্রাকৃতিক অধিকার (Natural Rights): মানুষের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির মতো কিছু সহজাত অধিকার রয়েছে, যা কোনো সরকার কেড়ে নিতে পারে না। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ Natural Law দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো এবং নিজের অধিকার ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের পাশাপাশি অন্যের অধিকার ও স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলো।

চুক্তি ও সম্মতি (Contract and Consent): মানুষ নিজের স্বাধীনতা ও অধিকার রক্ষা করার জন্য নিজেদের মধ্যে চুক্তি করে একটি সরকার গঠন করে। এই চুক্তি মানুষের পারস্পরিক সম্মতির ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়। লকের মতে সামাজিক চুক্তির ভিত্তি হলো জনগণের সম্মতি। চুক্তিটি সম্পাদিত হয় সরকার ও জনগণের মধ্যে।

সীমিত ক্ষমতা (Limited Government): সরকারের ক্ষমতা অসীম নয়, বরং এটি জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য সীমিত। সরকার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। চুক্তির ফলে সরকার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়।

বিপ্লবের অধিকার (Right to Revolution): যদি সরকার চুক্তি ভঙ্গ করে জনগণের অধিকার রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়, তবে জনগণের সেই সরকারকে ভেঙে দেওয়ার এবং নতুন সরকার গঠনের অধিকার রয়েছে।

সরকার সম্পর্কে ধারণা:

- লক সরকারকে ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন: ১. গণতন্ত্র ২. কতিপয়তন্ত্র এবং ৩. রাজতন্ত্র। গণতন্ত্রকে সর্বোত্তম সরকার বলেন।
- "Minority should be represented"- জন লক।
- তাকে সংসদীয় গণতন্ত্রের জনক বলা হয়।

সম্পত্তি সম্পর্কে ব্যাখ্যা:

- সংকীর্ণ অর্থে সম্পত্তি বলতে শুধু বৈষয়িক সম্পদকে বুঝিয়েছেন।
- ব্যাপক অর্থে সম্পত্তি বলতে মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, পার্থিব সুখ-শান্তি ও বৈষয়িক সম্পদকে বুঝিয়েছেন।
- লকের মতে মানুষের সবচেয়ে বড় অধিকার হচ্ছে সম্পত্তির অধিকার।
- "Labour creates property" জন লক

সম্মতি তত্ত্ব:

- লকের মতে শাসকের বৈধতা হচ্ছে শাসিতের সম্মতি।
- সম্মতিকে দু'ভাগে ভাগ করছেন। যথা:
 ১. প্রকাশ্য সম্মতি
 ২. মৌন সম্মতি
- লকের মতে সামাজিক চুক্তি হলো জনগণের সাথে জনগণের চুক্তি।
- সরকারের ভিত্তি হলো সম্মতি।

জ্যা জ্যাক রুশো (Rousseau)

- ১৭১২ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে জন্মগ্রহণ করেন।

- ১৭৪৩ সালে তিনি ভেনিসের ফরাসি রাষ্ট্রদূতের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।
- ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়। তার লেখনীতে বিপ্লবের গতি ত্বরান্বিত হয়।
- ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান "সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা" এর রচয়িতা রুশো।
- কার্ল মার্কস রুশোকে প্রকৃতির শিশু (Child of Nature) বলে অভিহিত করেন।
- 'Minority should be forced to be free.'- রুশো।
- ১৭৪৪ সালে ফ্রান্সের প্যারিসে স্থায়ীভাবে চলে যান।
- ১৭৭৮ সালে ফ্রান্সের মেননভিলে মৃত্যু বরণ করেন।

রুশোর রচনাবলি হলো:

- 'Discourse on Political Economy' একটি এনসাইক্লোপিডিয়া। এতে তিনি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক মতবাদ তুলে ধরেন।
- 'The Emile' শিক্ষার উপর রচিত গ্রন্থ।
- 'The Social Contact' গ্রন্থটি ১৭৬২ সালে প্রকাশিত হয়।
- 'Confession' এটি তার আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ।
- "Discourse on the Origin of Inequality"

সামাজিক চুক্তি মতবাদ:

প্রকৃতির রাজ্য: রুশো বলেন, মানুষ প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন ও আবেগপ্রবণ ছিল। কিন্তু সমাজে প্রবেশ করার পর তারা দোষ ও শৃঙ্খলের শিকার হয়।

The Social Contact গ্রন্থে উল্লেখ করেন- "Man is born free and everywhere he is in chains."

The Social Contact গ্রন্থে "প্রকৃতির রাজ্য" সম্পর্কে বলেন প্রকৃতির রাজ্য ছিলো সুখ, স্বাধীনতা ও সমতার রাজ্য। এখানে মানুষ অনাবিল আনন্দে বাস করতো।

সামাজিক চুক্তি: এই চুক্তির মাধ্যমে মানুষ নিজেদের ব্যক্তিগত কিছু স্বাধীনতা রাষ্ট্র বা সমাজের হাতে তুলে দেয়। এর পরিবর্তে তারা collective security বা সম্মিলিত নিরাপত্তা লাভ করে এবং সামাজিক সুশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতে সক্ষম হয়।

তার মতে চুক্তির মাধ্যমে জনগণ তাদের সকল ক্ষমতা সামগ্রিকভাবে সমাজ তথা একটা "সাধারণ ইচ্ছা" (General Will) এর হাতে অর্পণ করে। চুক্তির ফলে সৃষ্টি এই সংস্থাকে সিটি (City), রিপাবলিক (Republic) বা বডি পলিটিক (Body Politic) বলে এবং সদস্যদের সমষ্টিগতভাবে জনগণ (People) ও ব্যক্তিগতভাবে নাগরিক (Citizen) বা সাবজেক্ট (Subject) বলে।

মন্টেস্কু

- ১৬৮৯ সালে ফ্রান্সের প্যারিসের লা-ব্রেডে তে জন্মগ্রহণ করেন।
- মন্টেস্কুর আসল নাম: Charles Louise De Secondat.
- 'The Persian Letters' সমকালীন ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গাত্মক রচনা।
- "The Spirit of Laws" গ্রন্থ ১৭৪৮ সালে প্রকাশিত হয়।
- মন্টেস্কু ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে ব্রিটিশ সংবিধানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, যা তার নীতিতে প্রতিফলিত হয়।
- ১৭৫৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নীতি:

ফরাসি দার্শনিক মন্টেস্কু তার বিখ্যাত গ্রন্থ "The Spirit of Laws" গ্রন্থে বলেন- "যখন একই ব্যক্তি বা শাসকবর্গের হাতে আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়, তখন স্বাধীনতা থাকতে পারে না। আবার শাসন

ক্ষমতার সাথে বিচারক ক্ষমতা যুক্ত হলে ন্যায়বিচার থাকতে পারে না। সুতরাং এ তিন ক্ষমতা অবশ্যই পৃথক হতে হবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তিদের ব্যক্তিদের দ্বারা এমনভাবে ব্যবহৃত হবে যাতে একটি অপরটির সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে।"

নীতিটির মূল কথা:

- ক্ষমতার বিভাজন: রাষ্ট্রের ক্ষমতাকে তিনটি স্বতন্ত্র বিভাগে ভাগ করা হয়-আইনসভা (Legislative), নির্বাহী বিভাগ (Executive), ও বিচার বিভাগ (Judiciary)।
- স্বাধীনতার রক্ষা: এই নীতিটি একটি কার্যকর ব্যবস্থা যেখানে প্রতিটি বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং অন্য বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করে না।
- স্বৈরাচারী ক্ষমতারোধ: কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে যেন সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত না হয়, তার জন্য এই নীতির উদ্ভব।

আইন সংক্রান্ত ধারণা:

-তিনি আইনকে "কার্যকারণ সম্পর্ক" বলে আখ্যা দিয়েছেন।

-তার 'The Spirit of Laws' গ্রন্থে বলেন "Laws are the necessary relations arising from the nature of things."

মন্টেস্কুর মতে আইন ৩ প্রকার। যথা:

১. আন্তর্জাতিক আইন
২. রাজনৈতিক আইন
৩. সামাজিক আইন: নাগরিকেরা যে আইন দ্বারা পরিচালিত হয় তাই সামাজিক আইন।

স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারণা:

- মন্টেস্কুর মতে স্বাধীনতা দুই প্রকার। যথা:
 ১. রাজনৈতিক স্বাধীনতা
 ২. নাগরিক স্বাধীনতা

সরকারের শ্রেণীবিভাগ:

সরকারকে ৩ ভাগে ভাগ করেন। যথা:

১. প্রজাতন্ত্র
 - ক. গণতন্ত্র ও
 - খ. অভিজাততন্ত্র
২. রাজতন্ত্র
৩. স্বৈরাতন্ত্র

কার্ল মার্কস (Karl Marx)

- কার্ল মার্কস ১৮১৮ সালে জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেন।
- বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা কার্ল মার্কস
- মার্কসবাদ বিকাশের ক্ষেত্রে ফ্রেডরিক এঙ্গেলস এর অবদান সবচেয়ে বেশী।
- সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা
- "The Communist Manifesto" প্রকাশিত হয় ১৮৪৮ সালে।
- "Das Capital" প্রকাশিত হয় ১৮৬৭ সালে।
- মার্কসীয় দর্শন মূলত দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- "শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যেই মানবজাতির ইতিহাসের মূল নিহিত।" কার্ল মার্কস

- "গণতন্ত্র একটি অলীক কল্পনা মাত্র" মার্কস
- "রাষ্ট্রের উৎপত্তির মূলে রয়েছে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব।" মার্কস
- "Revolutions are the locomotives of history." কার্ল মার্কস "The Holy Family", "Value, Price and Profit", "The Poverty of Philosophy", "The Civil War in France", "Das Capital", "The German Ideology" তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি।
- কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর শেষ লাইন "দুনিয়ার মজদুর এক হও" (Workers of all land unite)
- ১৮৮৩ সালে মৃত্যু বরণ করেন। তাকে ১৭ মার্চ লন্ডনের হাইগেট সেমিটারি তে সমাহিত করা হয়।

দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism):

- Dialectics শব্দটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে যার অর্থ বিতর্কের মধ্যে দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া।
- হেগেলের মতো, মার্কসও এই ধারণা দেন যে প্রতিটি বিষয়ের মধ্যে দুটি বিপরীত শক্তি থাকে (thesis and antithesis), যাদের সংঘাতের মাধ্যমে একটি নতুন ও উন্নত অবস্থা (synthesis) তৈরি হয়।
- বস্তুবাদ (Materialism): মার্কস হেগেলের বিমূর্ত ধারণার পরিবর্তে বাস্তব, বস্তুগত অবস্থার উপর জোর দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও উৎপাদন ব্যবস্থাই সমাজের ভিত্তি তৈরি করে এবং এটিই ইতিহাসকে চালিত করে।
- দ্বন্দ্ব ও পরিবর্তন: দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদের মূল কথা হলো, বস্তুগত ও সামাজিক জগতে দ্বন্দ্ব (contradiction) বিদ্যমান এবং এই দ্বন্দ্বই পরিবর্তন ও উন্নতির চালিকাশক্তি।
- ইতিহাসের চালিকাশক্তি: এই তত্ত্ব অনুসারে, মানব ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি হলো শ্রেণীসংগ্রাম (class struggle), যা বস্তুগত অবস্থার ওপর নির্ভরশীল।

উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব (Theory of Surplus Value):

- উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব বলতে, শ্রমিক তার মজুরির অতিরিক্ত যে মূল্য সৃষ্টি করে তাকেই বুঝানো হয়েছে। মার্কস এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন।
- দ্রব্যের মূল্য দুই ধরনের। যথা- ১. ব্যবহারিক মূল্য ও ২. বিনিময় মূল্য (বিনিময় মূল্যই হলো উদ্বৃত্ত মূল্য)।
- শ্রম-মূল্য তত্ত্ব: মার্কস বিশ্বাস করতেন যে পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় তার উৎপাদনে ব্যয়িত শ্রম দ্বারা।
- শ্রমিক ও পুঁজিপতির সম্পর্ক: পুঁজিপতি উৎপাদন ব্যবস্থার মালিক এবং শ্রমিকরা তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করে।
- উদ্বৃত্ত মূল্য তৈরি: শ্রমিক তার শ্রমের মাধ্যমে যে পরিমাণ মূল্য উৎপাদন করে, তার একটি অংশ তার জীবনধারণের জন্য মজুরি হিসেবে পায়, এবং বাকি অংশ পুঁজিপতি নিজের লাভ হিসেবে নিয়ে নেয়।

উদ্বৃত্ত মূল্যতত্ত্ব (Theory of Surplus Value):

- শ্রমিকের শোষণ: এই উদ্বৃত্ত মূল্যই হলো শ্রমিককে শোষণ করার প্রক্রিয়া, যেখানে পুঁজিপতি শ্রমিককে তার শ্রমের প্রকৃত মূল্যের চেয়ে কম মজুরি দিয়ে বেশি মুনাফা অর্জন করে।
- পুঁজিবাদের মূল চালিকাশক্তি: উদ্বৃত্ত মূল্য অর্জনই পুঁজিবাদকে সচল রাখে, কারণ এটিই পুঁজিপতিদের সম্প্রসারণ ও বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে।

রাষ্ট্রতত্ত্ব (The State Theory):

- মার্ক্সের মতে রাষ্ট্র হলো এক শ্রেণীর উপর অপর শ্রেণীর কর্তৃক উৎপীড়নের যন্ত্র।
- রাষ্ট্র শ্রেণি শোষণের হাতিয়ার।
- সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের ফলই হলো রাষ্ট্র।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism):

- ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হলো একটি তত্ত্ব যা ব্যাখ্যা করে যে কীভাবে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো সমাজের অন্যান্য দিককে প্রভাবিত করে এবং কীভাবে পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজ এক পর্যায়ে থেকে অন্য পর্যায়ে বিকশিত হয়।
- মার্ক্স দেখিয়েছেন যে সামন্তবাদ থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণের কারণ ছিল উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন। উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় পুরনো সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক অচল হয়ে যায় এবং নতুন বুর্জোয়া-সর্বহারা শ্রেণীর উদ্ভব হয়।
- মার্ক্স ও এঙ্গেলস মানব ইতিহাসকে ৩ভাগ করেন। যথা-
 ১. ইতিহাস পূর্বকাল
 ২. ঐতিহাসিক কাল ও
 ৩. ইতিহাস উত্তর কাল।
- তার মতে ঐতিহাসিক কালে ব্যক্তিগত সম্পত্তির আবির্ভাব ঘটে।

শ্রেণীসংগ্রাম তত্ত্ব (Theory of Class Struggle)

- শ্রেণীর উৎপত্তি ও বিভাজন: মার্ক্সের মতে, প্রতিটি সমাজের প্রধান ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। সমাজের মানুষ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়, যেমন শ্রমিক (সর্বহারা) এবং মালিক (বুর্জোয়া)।
- শ্রেণীসংগ্রামের কারণ: পুঁজিবাদী সমাজে, মালিক শ্রেণী (বুর্জোয়া) শ্রমিকদের শ্রমের মাধ্যমে উদ্ধৃত মূল্য শোষণ করে লাভকরে। এই শোষণের ফলেই শ্রমিক শ্রেণী এবং মালিক শ্রেণীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।
- তিনি Communist Manifesto গ্রন্থে বলেন- প্রচলিত সকল সমাজের ইতিহাস শ্রেণীসংগ্রামের ইতিহাস।
- শিল্প বিপ্লবের সমাজ দুটি শ্রেণীতে ভাগ হয়ে যায়। যথা: ১. পুঁজিপতি শ্রেণী ও ২. শ্রমিক শ্রেণী
- মার্ক্সীয় দর্শনের মূল লক্ষ্য হলো শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক একনায়কত্ব কায়েম করা। এর ফলে, শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিপ্লব তত্ত্ব (Theory of Revolution):

- বিপ্লব ও পরিবর্তন: শ্রেণীসংগ্রামের ফলে শ্রমিক শ্রেণী একটি বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মালিক শ্রেণীকে উৎখাত করে। এই বিপ্লব পুঁজিবাদের অবসান ঘটায় এবং একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে।
- শ্রেণীহীন সমাজের ধারণা: বিপ্লবের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো একটি শ্রেণীহীন, রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে শোষণ থাকবে না এবং সবাই সমানভাবে উপকৃত হবে।
- মার্ক্স বলেন বিপ্লব হলো শ্রেণীসংগ্রামের চূড়ান্ত পর্যায়।
- তার মতে- পুঁজিপতি শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান শোষণের ফলে শ্রমিক শ্রেণী অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তখন তারা নিজেদের দাবি আদায়ের জন্য সংগ্রামের পথ বেছে নিবে।
- মার্ক্সের মতে বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে পুঁজিপতি শ্রেণী ধ্বংস হয়ে যাবে এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিকানা শ্রমিক শ্রেণীর হাতে স্থানান্তরিত হবে।

Lecture: 05
টপিক: রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের পদ্ধতি
1. ব্যবস্থা তত্ত্ব (System Theory) 2. কাঠামো-কার্যগত তত্ত্ব (Structural-Functional Theory) 3. এলিট তত্ত্ব (Elite Theory)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের পদ্ধতি

রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলো হলো মূলত ঐতিহাসিক, তুলনামূলক, দার্শনিক, আচরণবাদী, ব্যবস্থা তত্ত্ব, কাঠামো-কার্যগত পদ্ধতি, এলিট তত্ত্ব এবং অভিজ্ঞতামূলক বা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক আচরণ এবং ক্ষমতার প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়।

ব্যবস্থা তত্ত্ব (System Theory)

- সিস্টেম তত্ত্ব হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষমতা বণ্টন ও প্রয়োগের যাবতীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।
- সিস্টেম মতবাদের প্রবক্তা হলেন চেস্টার আই, বার্নার্ড।
- চেস্টার আই, বার্নার্ডের মতে, একটি সংগঠনকে একটি সামাজিক সিস্টেম হিসেবে দেখা উচিত, যেখানে ব্যবস্থাপক এবং কর্মীরা পারস্পরিকভাবে সম্পর্কিত।
- ডেভিড ইস্টন রাজনৈতিক বিজ্ঞানে সিস্টেম তত্ত্ব প্রবর্তক এবং তিনি ১৯৫৩ সালে এটিকে রাজনৈতিক বিজ্ঞানে প্রয়োগ করেন।
- ডেভিড ইস্টন মতে- রাজনৈতিক ব্যবস্থা মূলত ইনপুট-আউটপুট সম্পর্কিত আলোচনা, যার সাথে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম জড়িত।
- সিস্টেম তত্ত্বের প্রবক্তা ডেভিড ইস্টন (David Easton)
- ডেভিড ইস্টন তার "The Political System"(১৯৫৩ সালে প্রকাশ) গ্রন্থে সর্বপ্রথম সিস্টেম তত্ত্বকে ব্যাখ্যা করেন। এতে একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে এর সামগ্রিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে ব্যাখ্যা করেন।

বৈশিষ্ট্য

ইস্টন ব্যবস্থার ৩টি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছেন। যথা:

১. ব্যবস্থার নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে।
২. ব্যবস্থা বিভিন্ন উপব্যবস্থায় বিভক্ত
৩. ব্যবস্থায় ইনপুট আউটপুট বের করার ক্ষমতা আছে।

উপাদান

Easton এর মতে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয় চারটি উপাদানের মাধ্যমে। যথা:

১. ব্যবস্থা
২. তথ্য প্রেরণ ও অবগতি
৩. পরিবেশ এবং
৪. সাড়া প্রদান।

ডেভিড ইস্টনের সিস্টেম তত্ত্বের মূল ধারণা:

- রাজনৈতিক ব্যবস্থা (Political System): এটি সমাজের জন্য মূল্যবোধের কর্তৃত্বপূর্ণ বরাদ্দ (Authoritative Allocation of Values)। অর্থাৎ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সমাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত ও প্রয়োগ করা হয়।
- ইনপুট (Input): এটি পরিবেশ থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আসা চাহিদা (demands) এবং সমর্থন (supports)।

- আউটপুট (Output): এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নীতি, যা সমাজের উপর প্রয়োগ করা হয়।

ডেভিড ইস্টনের সিস্টেম তত্ত্বের মূল ধারণা:

- পরিবেশ (Environment): রাজনৈতিক ব্যবস্থার চারপাশের সমস্ত বাহ্যিক উপাদান, যা ইনপুট ও আউটপুটে প্রভাব ফেলে।
- রূপান্তর প্রক্রিয়া (Transformation Process): এই প্রক্রিয়াটিতে রাজনৈতিক ব্যবস্থা ইনপুটকে আউটপুটে রূপান্তর করে। এটি নীতি-নির্ধারণ এবং বাস্তবায়নের পর্যায়।
- ফিডব্যাক লুপ (Feedback Loop): সিদ্ধান্ত ও নীতির প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে নতুন ইনপুট তৈরি হয় এবং পুরো প্রক্রিয়াটি পুনরায় চলতে থাকে।

কাঠামো কার্যগত পদ্ধতি (Structural-Functional System)

- কাঠামোগত কার্যগত পদ্ধতি হলো এমন একটি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বিভিন্ন আন্তঃসম্পর্কিত কাঠামোর সমষ্টি হিসেবে দেখে এবং এই কাঠামোগুলো সমাজের স্থিতিশীলতা ও চাহিদা পূরণের জন্য নির্দিষ্ট কাজ বা কার্য সম্পাদন করে।
- এই পদ্ধতি অনুসারে, রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশ, যেমন রাজনৈতিক দল, স্বার্থ গোষ্ঠী এবং সরকারি সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণে কাজ করে, যা সমাজের সামগ্রিক চাহিদা মেটায় এবং স্থিতিশীলতা বজায় রাখে।
- কাঠামো-কার্যগত পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা হলেন Prof. G.A. Almond.
- Almond James Coleman সম্পাদিত "The Politics of the Developing Areas" গ্রন্থে এ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন।
- Gabriel Almond Bingham Powell তাদের "Comparative Politics: A Development Approach" গ্রন্থে এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করেন।
- Almond Powell এর মতে, মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলতে আমরা রাজনৈতিক কার্যাবলিতে জড়িত হতে পারে এমন ব্যক্তির সকল কার্যাবলিকেই বুঝি না, বরং তার কার্যকলাপের সেই অংশকে বুঝি, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত।" যেমন: আইন সভা হলো 'কাঠামো' এবং আইন প্রণয়ন হলো 'কার্য'।
- কাঠামোর উদাহরণ: রাজনৈতিক দল, স্বার্থ গোষ্ঠী, সরকার, বিচার ব্যবস্থা ইত্যাদি রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রধান কাঠামো।
- কার্যের উদাহরণ: রাজনৈতিক দলগুলো জনমত গঠন করে, স্বার্থ গোষ্ঠীগুলো তাদের দাবিগুলো উত্থাপন করে, এবং সরকার আইন তৈরি, প্রয়োগ ও বিচার করে এই সব কার্যের মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূরণ হয়।

আলমন্ডের কাঠামো-কার্যগত পদ্ধতি:

- Almond ও পওএল এর মতে, মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলতে আমরা রাজনৈতিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেন।
- Gabriel Almond Bingham Powell তাদের "Comparative Politics: A Development Approach" গ্রন্থে এই তত্ত্বটি বিশ্লেষণ করেন।
- Almond ও পওএল এর মতে, মানুষের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বলতে আমরা রাজনৈতিক কার্যাবলিতে জড়িত হতে পারে এমন ব্যক্তির সকল কার্যাবলিকেই বুঝি না, বরং তার কার্যকলাপের সেই অংশকে বুঝি, যা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় জড়িত।" যেমন: আইন সভা হলো 'কাঠামো' এবং আইন প্রণয়ন হলো 'কার্য'।
- G.A. Almond তার "The Politics of Developing Areas" গ্রন্থে কাঠামো কার্য তত্ত্বের বর্ণনা করেন। তিনি State এর পরিবর্তে 'Function of Institution' ও ক্ষমতার পরিবর্তে কার্যাবলি উল্লেখ করেন।

আলমন্ডের কাঠামো-কার্যগত পদ্ধতি:

G.A. Almond প্রত্যেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে দু'ভাগে ভাগ করেন। যথা:

ক. ইনপুট কার্যাবলি: Input এ চার ধরনের কার্য সম্পন্ন হয়। যথা:

1. রাজনৈতিক দীক্ষা দান ও লোকসংগ্রহ
2. রাজনৈতিক যোগাযোগ
3. স্বার্থ একত্রীকরণ এবং
4. 8. স্বার্থ জ্ঞাপন

খ. Output এর কার্যাবলি: Output এ তিন ধরনের কার্য সম্পন্ন হয়ে থাকে। যথা:

1. বিধি প্রণয়ন
2. বিধি অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পন্ন এবং
3. বিধি প্রয়োগ

এলিট তত্ত্ব (Elite Theory)

- Elite শব্দের অভিধান অর্থ হলো উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ।
- এলিট তত্ত্ব (Elite theory) বা অভিজাত তত্ত্ব হলো এমন একটি ধারণা যেখানে বলা হয় যে, সমাজের একটি ছোট, বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত গোষ্ঠী (এলিট বা অভিজাত) সমাজের ওপর ব্যাপক ক্ষমতা ও নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্তসমূহ এদের দ্বারাই প্রভাবিত হয়।
- T.B. Bottomore এর মতে, "সমাজে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন যে কোন বৃত্তিমূলক বিশেষ করে পেশাভিত্তিক গোষ্ঠীই এলিট।"
- **মূলকথা:** সমাজে দু'টি প্রধান শ্রেণি বিরাজ করে। যথা:
প্রথম শ্রেণি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গ যারা দক্ষ এবং যাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলি বিদ্যমান। এরা শাসনকার্য পরিচালনা করে। এদের রাজনৈতিক এলিট বলে। এরাই সবচেয়ে বেশি গতিশীল এবং সর্বাধিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

দ্বিতীয় শ্রেণি হচ্ছে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ যারা শাসিত হয়ে থাকে। এটাই এলিট তত্ত্বের মূল কথা।

প্রধান তাত্ত্বিকগণ:

-ভিলফ্রেদো প্যারেটো (Vilfredo Pareto): তিনি অভিজাত তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা, যিনি সমাজে ক্ষমতার নির্দিষ্ট ভারসাম্য এবং অভিজাতদের উত্থান পতনের ব্যাখ্যা দেন।

-গায়েতানো মাস্কা (Gaetano Mosca): মাস্কা মনে করতেন যে, যেকোনো সমাজে শাসনকারী অভিজাতদের একটি ছোট গোষ্ঠী থাকে এবং তাদের শাসন অনিবার্য।

-রবার্ট মিশেলস (Robert Michels):

তিনি "অলিগার্কির লৌহ বিধি" (Iron Law of Oligarchy) ব্যাখ্যা করেন, যেখানে বলা হয় যে যেকোনো সংগঠন, এমনকি গণতান্ত্রিক সংগঠনেও ক্ষমতা অল্প কিছু মানুষের হাতে চলে যায়।

-সি. রাইট মিলস (C. Wright Mills): তিনি আধুনিক সমাজে "পাওয়ার এলিট" বা ক্ষমতামালা অভিজাতদের কথা বলেন, যারা সামরিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।

মসকার এলিট মতবাদ:

- সাংগঠনিক এলিট তত্ত্বের প্রবক্তা ইতালির সমাজবিজ্ঞানী Gaetano Mosca তার বিখ্যাত "The Ruling Class" গ্রন্থে এলিট সম্পর্কে আলোচনা করেন।

- এ তত্ত্বের মূল কথা হলো, সমাজের মুষ্টিমেয় ব্যক্তি সংখ্যাধিক্য ব্যক্তিকে শাসন করে। কারণ সমাজের দুটি ভাগ- এক পক্ষ শাসন করে, অন্যপক্ষ শাসিত হয়। প্রথম পক্ষটিই এলিট। এরাই অধিক সংখ্যক ব্যক্তিদের শাসন করে।
- মসকার মতানুসারে, এলিটদের দুইভাগ।
প্রথম শ্রেণীটি হচ্ছে এলিট বা Political Class এবং

দ্বিতীয় শ্রেণীটি হচ্ছে নন-এলিট বা Non-political Class.

Political Class দুই প্রকার। যথা: 1. Higher stratum (রাজনৈতিক দলের বস)

2. Lower stratum (জনগণের প্রতিনিধি যারা বসদের যন্ত্রবিশেষ)

- তিনি Sub-elite কথা বলেন, যারা হচ্ছে সমাজের মেধাবী, সরকারি কর্মকর্তা সহ সমাজের মধ্যবর্তী শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত একটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ গোষ্ঠী।
- মসকা এলিটের আবর্তন এবং এর মধ্যে দিয়ে সমাজ পরিবর্তনের কথা বলছেন। অর্থাৎ সময়ের ব্যবধানে এলিটরা যোগ্যতা হারিয়ে অ এলিটে পরিণত হয় এবং অ এলিটরা যোগ্যতা অর্জন করে এলিটে পরিণত হয়।
- সংখ্যালঘু রাজনৈতিক দলের শাসন কার্য সম্পর্কে দুটি পদ্ধতির কথা তিনি বলেন-
 1. Political formula
 2. Organisational capacity
- মসকার মতে এলিটদের মধ্যে শাসন যোগ্যতা হ্রাস পেলে এলিট আবর্তন ঘটে অর্থাৎ অএলিটরা এলিটে পরিণত হয়।

প্যারেটোর এলিট মতবাদ:

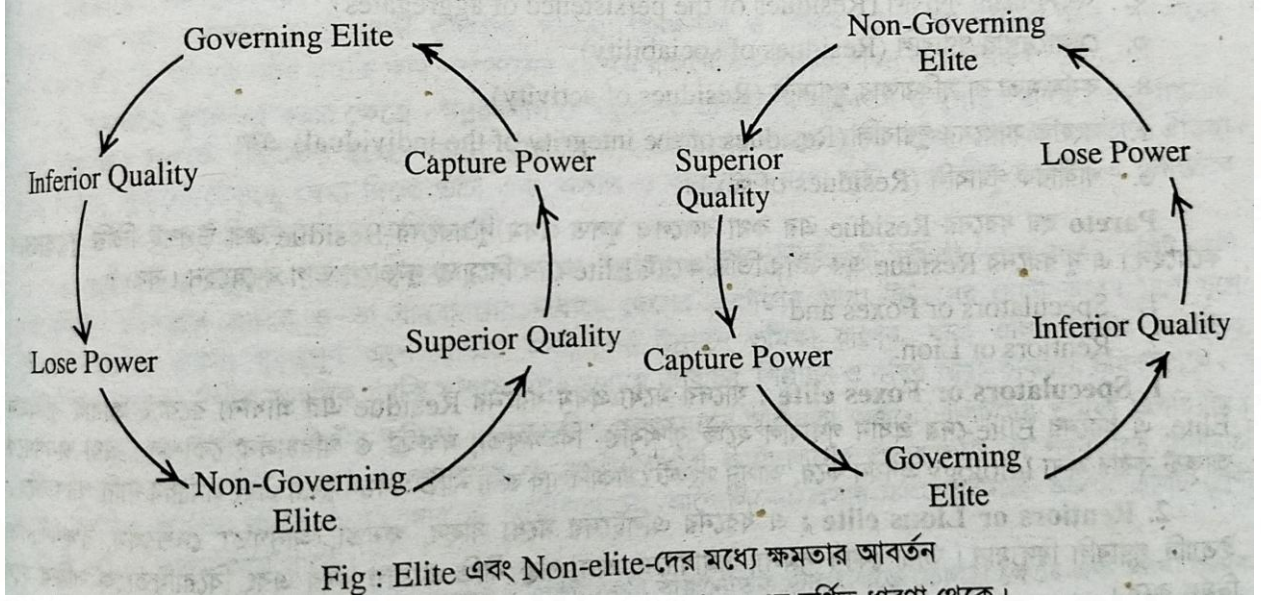
- ভিলফ্রেডো প্যারেটো ১৯৪৮ সালে ইতালিতে জন্মগ্রহণ করেন।
- "History is a graveyard of aristocracies." প্যারেটো।
- প্যারেটো তার "The Mind and Society" গ্রন্থে এলিট তত্ত্বের বর্ণনা করেন। তিনি "Circulation of Elite Theory" (এলিট আবর্তন তত্ত্ব) ব্যাখ্যা করেন।
- প্যারেটোর মতে, এলিট আবর্তন কেবল সামাজিক বিপ্লবের মধ্যেই সংঘটিত হয়।
- তার মতে, এলিট আবর্তনের মূল কারণ হলো Psychological.

Elite Circulation Theory

বিভিন্ন ধরনের শাসক এলিটদের মধ্যে এরূপ আবর্তন ঘটে Cunning এবং Courageous eliteদের মধ্যে এক ধরনের Elite অন্য ধরনের Eliteদের শাসন ক্ষমতা থেকে অপসারিত করে। এরূপ অপসারণ আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ হয়ে পারে। সাহসী এলিটরা হঠাৎ বৈপ্লবিক উত্থানের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় শীর্ষে আসীন হন, কিন্তু বুদ্ধিমান Elite'রা ধীরে ধীরে ক্ষমতায় প্রবেশ করে এবং নিজেরা ক্ষমতা দখল করে। এদের মধ্যকার আবর্তন ব্যাখ্যা করার মধ্যে তিনি বিশ্বাস করতেন যে, সমাজে ক্ষমতায় আবর্তন মূলত Cunning Courageous eliteদের ভূমিকা নগণ্যই। কিন্তু কেন এলিট শাসনের এরূপ আবর্তন ঘটবে। Pareto'র মতে, একটি Governing elite গোষ্ঠীর যখন শাসন করার জন্য প্রয়োজনীয় Residue এর ঘাটতি দেখা দেয় এবং তাদের প্রতিপনে মধ্যে শাসনের জন্য প্রয়োজনীয় Residue বর্তমান থাকে, তখনই আবর্তন সংঘটিত হয়। কাজেই Pareto'র মতে, এলিট আবর্তনের মূল কারণ Psychological. তিনি মানুষের সামাজিক কার্যাদিকে দুইভাগ করেন। যথা:

১. Rational or logical

২. Irrational or non-logical (মানুষের অধিকাংশ কাজই ননলজিক্যাল, কিন্তু তা সম্পাদনের ক্ষমতায় একসময় courageous elite দের অপসারণ করে নিজেরা ক্ষমতা দখল করে)

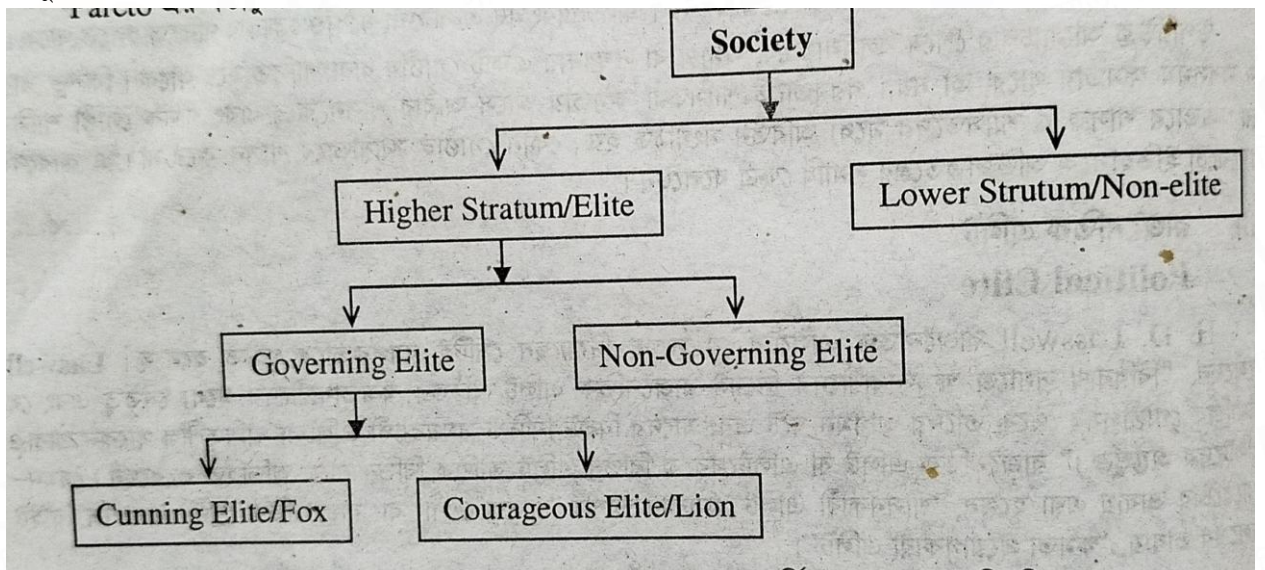


প্যারেটোর এলিট মতবাদ:

- Pareto মনে করেন যে, যে ব্যক্তির দক্ষতা সর্বাধিক তিনিই সমাজে Elite এবং অন্যান্যরা Non-elite. এরূপ দক্ষতার ফলে Elite'রা সমাজে প্রভাবশালী হয় এবং তারা শাসন করে কিংবা তাদের নিজস্ব থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।
- Pareto মানবসমাজের ইতিহাসকে Elite এবং Non-elite দের সম্পর্ক এবং Elite এর Psychological make up এর ইতিহাস হিসেবে দেখেছেন। তিনি সমাজের সকল মানুষকে প্রধান দু'টি স্তর বা Class এ বিভক্ত করেছেন। যথা:
 - ক. উচ্চস্তর বা এলিট শ্রেণী (Higher stratum or elite) এবং
 - খ. নিম্ন স্তর বা অএলিট শ্রেণী (Lower stratum or non-elite.)
- প্যারেটো এলিটদের দুইভাগ করেন। যথা:
 ১. শাসক এলিট ও
 ২. অ-শাসক এলিট

শাসক এলিটকে দুইভাগ করেন। যথা:

১. বুদ্ধিমান এলিট ও ২. সাহসী এলিট।



- শাসকরা যে পদ্ধতিতে তাদের শাসন বজায় রাখে এবং ন্যায্যতা প্রমাণ করে সেটিকে Pareto দু'ভাগে ভাগে ভাগ করেছেন। যথা:

1. Derivation,

2. Residue.

Derivation: Derivation হচ্ছে যার দ্বারা শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণের উপর তাদের শাসনের বৈধতা যৌক্তিক হিসেবে প্রমাণ করার চেষ্টা করে। যেমন- বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক আদর্শ, মতবাদ, নীতি ইত্যাদি প্রবর্তন করা।

Residue: Residue হচ্ছে মানুষের প্রকৃতিজাত গুণাবলির প্রতিফলন। Pareto Elite Theory এর বিশ্লেষণে মূলত এ বিষয়টির উপরই সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন এবং Residue কিভাবে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসনকে প্রতিষ্ঠিত করে তা ব্যাখ্যা করেছেন

- প্যারেটো ছয় ধরনের Residue (গুণ) এর কথা বলেন। যথা:

১. সমন্বয় সাধন করার গুণাবলি

২. অধ্যবসায়ের গুণাবলি

৩. মেলামেশার গুণাবলী

৪. কর্মক্ষমতা বা সক্রিয়তার গুণাবলী

৫. সংহতি সাধনের গুণাবলী

৬. শারীরিক গুণাবলি

Lecture: 06

টপিক: রাষ্ট্রবিজ্ঞান অধ্যয়নের পদ্ধতি:

- গ্রুপ তত্ত্ব (Group Theory)
- ক্রীড়া তত্ত্ব (Game Theory)
- ভূমিকা তত্ত্ব (Role Theory)
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব (Decision-Making Theory)
- সংঘাত তত্ত্ব (Conflict Theory)
- যোগাযোগ তত্ত্ব (Communication Theory)
- মার্ক্সবাদী ও অ-মার্ক্সবাদী পদ্ধতি (Marxist and Non-Marxist Approaches)
- মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Psychoanalytic Approaches)

গ্রুপ তত্ত্ব

গোষ্ঠী তত্ত্বের মূল বিষয়বস্তু:

- গোষ্ঠী গঠন: রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তিরা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দল বা গোষ্ঠীতে একত্রিত হয়।
- ক্ষমতার বিন্যাস: এই গোষ্ঠীগুলো বিভিন্ন ধরনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কিছু গোষ্ঠী (যেমন রাজনৈতিক দল) সরাসরি ক্ষমতা দখল করে, আবার কিছু গোষ্ঠী (যেমন স্বার্থ গোষ্ঠী) সরকারের নীতি নির্ধারণে পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে।

- রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: গোষ্ঠী তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কীভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী রাজনীতিতে অংশ নেয়, যেমন নির্বাচন, লবিং বা প্রচারণার মাধ্যমে।
- In-formal বা formal গোষ্ঠী: রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকারী গোষ্ঠীগুলো শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক দল বা সরকারি সংস্থা নয়, বরং অনানুষ্ঠানিক বা সাধারণ স্বার্থ গোষ্ঠীও এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।
- রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ব্যক্তির নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য দল বা গোষ্ঠীতে একত্রিত হয়।
- গোষ্ঠী দুই প্রকার। যথা: ১. আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠী ২. অনানুষ্ঠানিক গোষ্ঠী
- আধুনিক গ্রুপ গোষ্ঠী তত্ত্বের অবতারণা করেন- আর্থার এস. বেন্টলি
- "The Process of Government" গ্রন্থের লেখক বেন্টলি
- বিশেষ কোন স্বার্থকে উত্থাপন করার জন্য হঠাৎ গড়ে ওঠা গ্রুপগুলোকে বলে- Anomic Groups.
- "There is no group without its interest." বেন্টলি।
- "The Government Process" গ্রন্থের লেখক ডেভিড ট্রুম্যান (David Truman)
- "The Group Basis of Politics" গ্রন্থের লেখক আর্ল ল্যাথাম (Earl Latham)
- গোষ্ঠী আলোচনার মাধ্যমে সভ্যতার উত্থান পতন আলোচনা করেন ইবনে খালদুন
- ইবনে খালদুনের গোষ্ঠী সংক্রান্ত আলোচনা পরিচিত গোষ্ঠী সংহতি বা আসাবিয়া (Asabiyya)
- "Politics, Parties and Pressure Groups" গ্রন্থের লেখক- ভি.ও. কী (V.O. Key)
- বেন্টলি মনে করতেন, রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (যেমন, সরকার বা দল) বিশ্লেষণ করার চেয়ে বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলোর কার্যকলাপ ও তাদের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করা বেশি জরুরি।

ক্রীড়া তত্ত্ব

- ক্রীড়া তত্ত্ব হচ্ছে মানুষের আন্তঃক্রিয়ার এমন এক অবস্থা যাতে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা গ্রুপগুলো কখনো প্রতিযোগিতা আবার কখনো সহযোগিতার মাধ্যমে নিজ নিজ স্বার্থকে অর্জনের চেষ্টা করে।
- ক্রীড়া তত্ত্বের উৎপত্তি হয়- গণিতশাস্ত্রে।
- রাজনীতি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গাণিতিক মডেল- ক্রীড়া তত্ত্ব
- ক্রীড়া তত্ত্বের ৩ টি বৈশিষ্ট্য হলো:
 ১. প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা সসীম
 ২. স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও
 ৩. কৌশল প্রয়োগ
- ক্রীড়া তত্ত্বের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ মডেল হলো-
 ১. চিকেন মডেল
 ২. উভয় সংকট মডেল
- ক্রীড়া তত্ত্বের বিকল্প নাম- Interactive Decision Theory
- আধুনিক ক্রীড়া তত্ত্বের অন্যতম প্রবক্তা জন ভন নিউম্যান (John Von Neumann)

- ক্রীড়া তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন এমিলি বোরেল।
- রাজনীতিতে ক্রীড়া বলতে বোঝায়- কৌশল ক্রীড়াকে
- কৌশলের চেয়ে বৃহত্তর অগ্রগমনকে -সুকৌশল (Strategy) বলে।
- জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে ক্রীড়া তত্ত্বের প্রয়োগ করেন Anthony Downs
- এলাম আর বল (Allan R. Ball) ক্রীড়া তত্ত্বকে Interesting Development বলে অভিহিত করেন।
- "Theory of Games & Economic Behaviour" গ্রন্থের লেখক- জন ভন নিউম্যান ও অস্কার মর্গেনস্টার্ন।
- "The Analysis of International Politics" গ্রন্থের লেখক- কার্ল ডোয়েস (Karl Deutsch)
- "The Economic Theory of Democracy" গ্রন্থের লেখক- অ্যান্থনি ডাউন্স (Anthony Downs)
- **Zero Sum Game**- যেখানে এক পক্ষের লাভ মানেই অপর পক্ষের সমান ক্ষতি। অর্থাৎ, মোট লাভ-ক্ষতি মিলিয়ে ফলাফল হয় শূন্য।

গেম থিওরির মূল ধারণা:

খেলোয়াড় (Player): রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে, একজন খেলোয়াড় হলেন একজন স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, যেমন একজন রাজনীতিবিদ, একটি রাজনৈতিক দল বা একটি দেশ।

কৌশল (Strategy): প্রতিটি খেলোয়াড়ের সিদ্ধান্তের একটি নির্দিষ্ট পথ বা কর্মপন্থাকে কৌশল বলা হয়, যা অন্য খেলোয়াড়দের কর্মের প্রতিক্রিয়া হিসেবে নেওয়া হয়।

পেমেন্ট/পুরস্কার (Payoff): প্রতিটি খেলোয়াড় যে ফলাফল বা সুবিধা লাভ করে, তা-ই হলো পেমেন্ট। এটি রাজনৈতিক ক্ষমতা, লাভ, বা অন্য কোনো কাক্সিত লক্ষ্য হতে পারে।

ন্যাশ ভারসাম্য (Nash Equilibrium): এটি গেম থিওরির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা, যেখানে কোনো খেলোয়াড় তার কৌশল পরিবর্তন করে লাভবান হতে পারে না, যদি না অন্য খেলোয়াড়রাও তাদের কৌশল পরিবর্তন করে।

রাজনীতিতে গেম থিওরির প্রয়োগ:

নির্বাচনী কৌশল: ভোটারদের পছন্দ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের কৌশল বিশ্লেষণ করতে এটি ব্যবহৃত হয়, যা রাজনীতিবিদদের নির্বাচনী প্রচারণার কৌশল নির্ধারণে সাহায্য করে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: যুদ্ধ বা শান্তি, জোট গঠন, বা সংঘাতের মতো পরিস্থিতিতে বিভিন্ন দেশের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া বুঝতে গেম থিওরি ব্যবহার করা হয়।

রাজনৈতিক জোট গঠন: বিভিন্ন দল বা গোষ্ঠী কীভাবে জোট গঠন করে বা ক্ষমতা ভাগাভাগি করে, তা বিশ্লেষণ করতে এটি কার্যকর।

কৌশলগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তির কীভাবে একে অপরের সিদ্ধান্তকে বিবেচনা করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে, তা বুঝতে গেম থিওরি একটি শক্তিশালী হাতিয়ার।

ভূমিকা তত্ত্ব

ভূমিকা তত্ত্বের মূল ধারণা

সামাজিক ভূমিকা: সমাজবিজ্ঞানের এই তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রতিটি ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ভূমিকা থাকে, যেমন- নাগরিক, politician, ভোটার ইত্যাদি।

প্রত্যাশিত আচরণ: প্রতিটি ভূমিকার সাথে নির্দিষ্ট কিছু আচরণ ও প্রত্যাশা জড়িত থাকে, যা ঐ ভূমিকা পালনকারী ব্যক্তির কাছ থেকে আশা করা হয়।

কাঠামোগত সম্পর্ক: ভূমিকাগুলো একে অপরের সাথে যুক্ত থাকে এবং ব্যক্তির ভূমিকা তার সামাজিক অবস্থান ও সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়।

রাজনীতিতে ভূমিকা তত্ত্বের প্রয়োগ

রাজনৈতিক অভিনেতাদের বিশ্লেষণ: ভূমিকা তত্ত্ব ব্যবহার করে রাজনৈতিক অভিনেতাদের (যেমন, রাজনীতিবিদ, নাগরিক, ভোটদানকারী) ভূমিকা বিশ্লেষণ করা যায় এবং তারা কীভাবে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে তা বোঝা যায়।

সামাজিক আন্দোলন: রাজনীতিতে ভূমিকা তত্ত্বের প্রয়োগ বিশেষ করে সামাজিক আন্দোলনগুলো বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন, Black Civil Rights Movement অধ্যয়নের মাধ্যমে সমাজ বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন, কীভাবে আন্দোলনকারীরা নির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সংগঠিত হন।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ: এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে যে, নাগরিকরা কীভাবে তাদের রাজনৈতিক ভূমিকা (যেমন, ভোট দেওয়া, প্রতিবাদ করা, নির্বাচনে অংশগ্রহণ) পালন করে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

প্রত্যাশার সম্পর্ক: রাজনীতিবিদদের ভূমিকা কী এবং তাদের কাছ থেকে সমাজের কী প্রত্যাশা, তা ভূমিকা তত্ত্বের মাধ্যমে বোঝা যায়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব

- সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব হল এমন একটি পদ্ধতি যা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জটিল প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে এবং দেখায় কীভাবে ক্ষমতা, স্বার্থ ও সংঘাত এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্বের মূল ধারণা:

ক্ষমতা ও সংঘাত: এই তত্ত্ব ক্ষমতা ও সংঘাতকে অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখা হয়। সমাজের মধ্যে ক্ষমতা ও সম্পদের অসম বণ্টন সংঘাতের জন্ম দেয় এবং এই সংঘাত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণকে প্রভাবিত করে।

স্বার্থের দ্বন্দ্ব: বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ বা গোষ্ঠী তাদের নিজস্ব স্বার্থ পূরণের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, যার ফলে সংঘাত তৈরি হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া: রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলো প্রায়শই একটি প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার ফল হয়, যেখানে বিভিন্ন পক্ষ তাদের সুবিধা আদায় করার জন্য একে অপরের বিরোধিতা করে। **সাইমনের মতে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের তিনটি প্রধান ধাপ রয়েছে:**

১. অনুসন্ধান (Intelligence activity):

২. সমস্যা চিহ্নিত করা এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা।

৩. পরিকল্পনা (Design activity):

সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভাব্য বিকল্প তৈরি করা এবং সেগুলোর সুবিধা অসুবিধা মূল্যায়ন করা।

সিদ্ধান্ত (Choice activity): একটি নির্দিষ্ট বিকল্প নির্বাচন করা যা সবচেয়ে ইতিবাচক ফলাফল দেবে বলে মনে করা হয়।

Pam Brown divided the decision-making process into seven steps:

1. the goal and outcome.
2. Gather data.
3. Develop alternatives (i.e., brainstorming).
4. List pros and cons of each alternative.
5. Make the decision.

6. Immediately take action to implement it.
7. Learn from and reflect on the decision.

রাজনীতি অধ্যয়নে এর প্রয়োগ:

রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ: সিদ্ধান্ত গ্রহণ তত্ত্ব রাজনৈতিক দল, নীতিনির্ধারক এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের মধ্যকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

নীতি নির্ধারণে প্রভাব: এই তত্ত্ব ব্যবহার করে বোঝা যায় কিভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠী তাদের স্বার্থের পক্ষে কাজ করে এবং কিভাবে তাদের প্রভাব নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক ব্যবস্থার কাঠামো: এটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তি, যেমন ক্ষমতা বা সম্পদ বন্টনের অসমতা, বুঝতে সহায়তা করে, যা সংঘাত সৃষ্টি করে এবং বিদ্যমান কাঠামোকে পরিবর্তন করতে পারে।

সংঘাত তত্ত্ব

- সংঘাত তত্ত্ব অনুসারে, সমাজে ক্ষমতা ও সম্পদের বন্টন ভারসাম্যহীন হওয়ায় একটি শক্তিশালী সংখ্যালঘু গোষ্ঠী কম শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠীর স্বার্থের বিরুদ্ধে শাসন করে, যা সংঘাতের মূল কারণ।

মূল ধারণা:

ক্ষমতা ও সম্পদের অসম বন্টন: এই তত্ত্বের কেন্দ্রবিন্দু হলো ক্ষমতা ও সম্পদের অসম বন্টন।

আধিপত্য ও শক্তি: সমাজে শৃঙ্খলা বজায় থাকে একাত্মতের চেয়ে আধিপত্য ও শক্তির মাধ্যমে।

সংঘাতের উৎস: যাদের সম্পদ ও ক্ষমতা আছে, তারা এটিকে ধরে রাখতে চেষ্টা করে, যা অন্যদের সাথে সংঘাতের জন্ম দেয়।

দ্বন্দ্ব তত্ত্বের তিনটি অনুমান রয়েছে।

- মানুষ স্বার্থপর।
- সমাজগুলি সম্পদের ক্রমাগত অভাবের মধ্যে কাজ করে।
- সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এবং সামাজিক গোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ব্যাপক এবং অনিবার্য।

প্রভাবশালী তাত্ত্বিকগণ

কার্ল মার্কস: সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কস তাঁর তত্ত্বে দেখিয়েছেন কিভাবে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শ্রেণী সংঘাত সমাজের মূল চালিকাশক্তি।

মাক্স ওয়েবার: ওয়েবার সামাজিক কাঠামোতে ক্ষমতার অসম বন্টন এবং তার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

রাইট মিলস: তাকে আধুনিক দ্বন্দ্ব তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। তিনি সামাজিক কাঠামোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্ষমতা ও সম্পদের অসম বন্টনকে গুরুত্ব দিয়েছেন।

যোগাযোগ তত্ত্ব

- রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ভেতরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বোঝার পরিবর্তে, বিভিন্ন রাজনৈতিক পক্ষ ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যমে কীভাবে রাজনৈতিক বার্তা তৈরি, গ্রহণ ও আদান-প্রদান হয়, তা বিশ্লেষণ করে।

যোগাযোগ তত্ত্বের মূল ধারণা:

রাজনৈতিক যোগাযোগ: এই উপক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রচারণা, বক্তৃতা, রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা নিয়ে গবেষণা করা হয়।

তথ্য আদান-প্রদান: যোগাযোগের মৌলিক কাজ হলো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে তথ্য, ধারণা ও অনুভূতি আদান প্রদান করা

থ্রেরক-প্রাপক মডেল: শ্যানন ও ওয়েভারের মডেল অনুসারে, যোগাযোগ একটি থ্রেরক-প্রাপক প্রক্রিয়া, যেখানে থ্রেরক বার্তা তৈরি করে এবং প্রাপক তা গ্রহণ ও ব্যাখ্যা করে।

গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বসমূহ:

সাইবারনেটিক্স: নরবার্ট ওয়েইনারের তৈরি সাইবারনেটিক্স রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যোগাযোগের নিয়ন্ত্রণকে বুঝতে সাহায্য করে।

যোগাযোগমূলক কর্মের তত্ত্ব: ইয়ুর্গেন হ্যাবারমাসের এই তত্ত্ব সমাজে এবং রাজনীতিতে যোগাযোগকে একটি মূল উপাদান হিসেবে দেখে, যা রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও সামাজিক ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করে

- ১৯৬৩ সালে, কার্ল ডয়েচ "দ্য স্নায়ু সরকার: রাজনৈতিক যোগাযোগ ও নিয়ন্ত্রণের মডেল" বইটি লিখেছিলেন যেখানে তিনি যোগাযোগ তত্ত্বটি প্রবর্তন করেছিলেন এবং এই পদ্ধতির প্রধান প্রবক্তা হিসাবে বিবেচিত হন।
- কার্ল ডয়েচের যোগাযোগ তত্ত্ব হলো একটি সাইবারনেটিক বা তথ্য-নিয়ন্ত্রণ মডেল, যা রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি যোগাযোগ নেটওয়ার্ক হিসেবে দেখে এবং তথ্য প্রবাহ, ফিডব্যাক, ও নিয়ন্ত্রণের ওপর জোর দেয়।
- এই তত্ত্বে, একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা তার পরিবেশ থেকে তথ্য গ্রহণ করে, প্রক্রিয়াকরণ করে, এবং ফিডব্যাক লুপের মাধ্যমে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য বজায় রাখে।
- ডয়েচের বিখ্যাত গ্রন্থ "দ্য নার্ভস অফ গভর্নমেন্ট: মডেল অফ পলিটিক্যাল কমিউনিকেশন অ্যান্ড কন্ট্রোল" এই তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়।

মূল ধারণাগুলো:

সাইবারনেটিক্স মডেল: ডয়েচ সাইবারনেটিক্স থেকে ধারণা নিয়ে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে একটি স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন, যেখানে তথ্যই মূল চালিকাশক্তি।

তথ্য, যোগাযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ: একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তথ্য কীভাবে সংগ্রহ, প্রক্রিয়া এবং ব্যবহার করা হয়, তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ফিডব্যাক (Feedback): রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে তথ্য বা ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে, তা ফিডব্যাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়।

চ্যানেল ক্ষমতা (Channel Capacity): একটি যোগাযোগ চ্যানেলের মাধ্যমে কী পরিমাণ তথ্য প্রবাহিত হতে পারে, তা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

মেমরি (Memory): রাজনৈতিক ব্যবস্থার অতীত অভিজ্ঞতা বা তথ্য জমা রাখা, যা ভবিষ্যতের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে

মার্ক্সবাদী ও অ-মার্ক্সবাদী পদ্ধতি

মার্ক্সবাদী ও অ-মার্ক্সবাদী পদ্ধতির পার্থক্য:

- মার্ক্সবাদ সাধারণত অর্থনৈতিক ভিত্তি ও শ্রেণী সংগ্রামের উপর ভিত্তি করে রাজনীতি ব্যাখ্যা করে। অ-মার্ক্সবাদী পদ্ধতিগুলো রাজনীতিকে সমাজের অন্যান্য দিক (যেমন আচরণ, ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান) থেকে আলাদা করে বা তাদের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে বিশ্লেষণ করে।
- মার্ক্সবাদী পদ্ধতি একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রক্রিয়া যা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (historical materialism) ও দ্বন্দ্বিক বস্তুবাদ (dialectical materialism) ব্যবহার করে সামাজিক সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বকে শ্রেণী সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক

কাঠামোর নিরিখে ব্যাখ্যা করে। সম্পর্ক ও দ্বন্দ্বকে শ্রেণি সংগ্রাম এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর নিরিখে ব্যাখ্যা করে।

মার্ক্সবাদী পদ্ধতির মূল ধারণা

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ: এই ধারণা অনুসারে, সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অর্থাৎ উৎপাদন পদ্ধতিই সমাজের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। সমাজ এই অর্থনৈতিক ভিত্তির বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।

শ্রেণি সংগ্রাম: মার্ক্সবাদ বলে যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে (যেমন পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও শ্রমিক) অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকে, যা শ্রেণি সংগ্রামের জন্ম দেয়। এই সংগ্রামই সামাজিক পরিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি।

অর্থনৈতিক কাঠামো: রাজনীতিকে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি অংশ হিসেবে দেখা হয়। ক্ষমতা, রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন এই সবকিছুই মূলত অর্থনৈতিক কাঠামোর দ্বারা প্রভাবিত এবং এর প্রতিফলন।

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক:

কার্ল মার্ক্স ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস: মার্ক্সবাদ এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদ-এর প্রতিষ্ঠাতা, যিনি সমাজ ও রাজনীতির বিশ্লেষণকে শ্রেণিসংগ্রাম ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন।

পরবর্তী তাত্ত্বিকগণ ও তাঁদের অবদান;

ভ্লাদিমির লেনিন:

মার্ক্সবাদের তাত্ত্বিক উৎস এবং বিপ্লবীদের জীবনে মার্ক্সবাদকে প্রয়োগ করার কৌশল নিয়ে কাজ করেছেন।

রল প্রেবিশ, কারডোসো, এবং ফ্রাঙ্ক: নির্ভরতার তত্ত্ব এবং অনুন্নয়নের উন্নয়ন তত্ত্বের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোর অনুন্নয়নের কারণ হিসেবে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণ করেছেন।

অ-মার্ক্সবাদী

- অ-মার্ক্সবাদী পদ্ধতি বলতে সেই সব বিশ্লেষণাত্মক ধারাকে বোঝায় যা মার্ক্সবাদ থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে আচরণবাদ (Behavioralism), ব্যবস্থা বিশ্লেষণ (Systems Analysis), প্রতিষ্ঠানবাদ (Institutionalism) এবং আধুনিক কিছু পদ্ধতি যেমন নারীবাদ ও পরিবেশ-অ-মার্ক্সবাদী পদ্ধতি বলতে সেই সব বিশ্লেষণাত্মক ধারাকে বোঝায় যা মার্ক্সবাদ থেকে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র। এই পদ্ধতিগুলোর মধ্যে রয়েছে আচরণবাদ (Behavioralism), ব্যবস্থা বিশ্লেষণ (Systems Analysis), প্রতিষ্ঠানবাদ (Institutionalism) এবং আধুনিক কিছু পদ্ধতি যেমন নারীবাদ ও পরিবেশবাদ (Feminism and Environmentalism)।

প্রধান অ-মার্ক্সবাদী পদ্ধতিগুলো:

আচরণবাদ (Behavioralism): এই দৃষ্টিভঙ্গি রাজনীতিকে মূলত মানুষের রাজনৈতিক আচরণ এবং তার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে। এটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক উপাদান এবং জনমতকে অধ্যয়নের মূল বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে।

ব্যবস্থা বিশ্লেষণ (Systems Analysis): এই পদ্ধতি রাজনীতিকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা হিসেবে দেখে। এটি ব্যবস্থার মধ্যে বিভিন্ন উপাদানের মিথস্ক্রিয়া এবং তাদের সামঞ্জস্য রক্ষার উপর গুরুত্ব দেয়।

প্রতিষ্ঠানবাদ (Institutionalism): এটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো, যেমন সরকার, দল, নির্বাচন ইত্যাদি, কীভাবে কাজ করে এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় তাদের ভূমিকা কী, তা বিশ্লেষণ করে।

নারীবাদ (Feminism): রাজনীতি অধ্যয়নে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি যুক্ত হয় নারী-পুরুষের অসম সম্পর্ক এবং সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণকে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে।

পরিবেশবাদ (Ecologism/Environmentalism): এই পদ্ধতিটি পরিবেশ ও প্রকৃতির উপর রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রভাব পরীক্ষা করে এবং পরিবেশগত বিষয়গুলোকে রাজনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখে।

তাত্ত্বিকগণ:

ম্যাক্স ওয়েবার: তিনি ক্ষমতা, বৈধতা (legitimacy), এবং আমলাতন্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন, যা মার্কসবাদের চেয়ে ভিন্নভাবে রাষ্ট্র ও সমাজের বিশ্লেষণ করে। ওয়েবার সমাজে বিদ্যমান বিশ্বাস, মূল্যবোধ, এবং ক্ষমতা কাঠামোর উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ডগলাস নর্থ: আধুনিক প্রতিষ্ঠানবাদীরা অর্থনৈতিক কাঠামোর বাইরে রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

গ্যাব্রিয়েল আলমন্ড ও সিডনি ভেরবা: রাজনৈতিক ব্যবস্থার আচরণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ এবং মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করতে সাহায্য করে।

ডাব্লিউ ডব্লিউ রোস্টো: আধুনিকীকরণ তত্ত্ব অনুযায়ী, উন্নত দেশগুলোর মতো পিছিয়ে পড়া দেশগুলোও শিল্পায়ন, নগরায়ন, এবং আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের বিকাশের মাধ্যমে উন্নত হতে পারে।

মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি (Psycho-Analytic Approach)

- মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি বা মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি হলো মানুষের অচেতনমস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি বা মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতি হলো মানুষের অচেতন মন, অতীত অভিজ্ঞতা এবং আবেগ-প্রবণতাকে বিশ্লেষণ করে রাজনৈতিক আচরণ, সিদ্ধান্ত ও সামাজিক গতিপ্রকৃতি বোঝার একটি প্রক্রিয়া। এটি রাজনৈতিক নেতাদের বা জনগণের আচরণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার পেছনের মনস্তাত্ত্বিক কারণগুলো বুঝতে সাহায্য করে।

উদাহরণ:

- কোনো নেতার নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তার শৈশবের কোনো ঘটনা কীভাবে কাজ করছে, তা বিশ্লেষণ করে তার রাজনৈতিক আচরণ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।
- জনগণের মধ্যে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি আকর্ষণ বা বিরোধিতার কারণ অনুসন্ধান করতে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

মূল তাত্ত্বিক:

সিগমুন্ড ফ্রয়েড (Sigmund Freud) (৬ মে ১৮৫৬ ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৩৯):

- মনোবিশ্লেষণ তত্ত্বের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি মানুষের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া, বিশেষ করে অচেতন মনের প্রভাবকে কেন্দ্র করে তাঁর তত্ত্ব তৈরি করেন।
- মনোবিশ্লেষণের সাইকোডায়নামিক পদ্ধতির প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়
- "দ্য সাইকোপ্যাথোলজি অফ এভরিডে লাইফ" মনোবিশ্লেষণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই।
- ১৯১৩ সালে, ফ্রয়েড "টোটম অ্যান্ড ট্যাবু" বইটি প্রকাশ করেন। এই বইটি ছিল ধর্মের জন্ম এবং একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিকাশের প্রক্রিয়া পুনর্গঠনের একটি প্রচেষ্টা।

মনোবিশ্লেষণ পদ্ধতির মূল ধারণা:

- অচেতন প্রক্রিয়া (Unconscious Processes): ফ্রয়েড মনে করতেন যে আমাদের অনেক আচরণ এবং সিদ্ধান্ত সচেতন মনের বাইরে, অর্থাৎ অচেতন স্তরে থাকা আকাঙ্ক্ষা, ভয় এবং স্মৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়।
- ইড, ইগো, সুপার-ইগো (Id, Ego, Superego): ফ্রয়েডের মতে, এই তিনটি অংশ নিয়েই মানুষের মন গঠিত হয়। A.) ইড (Id): ইড হলো জিনগত পটভূমি থেকে উদ্ভূত চালিকাশক্তি এবং আবেগের অচেতন আধার যা জীবনের সংরক্ষণ এবং বংশবিস্তারের সাথে সম্পর্কিত। B.) ইগো (Ego): ফ্রয়েডের মতে, অহংকার সচেতন এবং অচেতন স্তরে সচেতনতার স্তরে কাজ করে। এটি ব্যক্তিত্বের সেই অংশ যা বাস্তবতার কাজগুলির সাথে সম্পর্কিত: উপলব্ধি, জ্ঞান এবং নির্বাহী কর্ম। C.) সুপার-ইগো (Superego): সুপারইগো হলো ব্যক্তির পরিবেশগতভাবে প্রাপ্ত আদর্শ ও মূল্যবোধ এবং পরিবার ও সমাজের নীতিমালা; সুপারইগো হলো অহংকার কার্যকারিতার উপর একটি সেন্সর হিসেবে কাজ করে।

অতীতের প্রভাব:

- ফ্রয়েড বিশ্বাস করতেন যে বর্তমানের মানসিক অবস্থা ও আচরণ বহুলাংশে অতীতের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রভাবিত হয়।
রাজনীতি অধ্যয়নে এই পদ্ধতির প্রয়োগ:
- নেতার মনস্তত্ত্ব: রাজনৈতিক নেতাদের ব্যক্তিগত মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য, তাদের ব্যক্তিত্বের গঠন ও অতীতের অভিজ্ঞতা কীভাবে তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে, তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়।
- জনগণের মনস্তত্ত্ব: জনগণের মধ্যে কীভাবে ভয়, আশা, বা অন্য কোনো আবেগ কাজ করে এবং তা কীভাবে রাজনৈতিক সমর্থন বা বিরোধিতার জন্ম দেয়, তা মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা যায়।
- সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন: মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সামাজিক পরিবর্তনের পেছনের অবচেতন শক্তি, মানুষের মানসিক প্রতিরোধ এবং সামাজিক সংঘাতের মনস্তাত্ত্বিক উৎসগুলো উন্মোচন করতে সাহায্য করে।

Lecture: 07

টপিক: Administration, Bureaucracy

Administration:

- Nature and Meaning of Public Administration:
- Scope and the main elements of Public Administration, Public and Private Administration, Approaches to
- The Study of Public Administration.

Administrative Concepts: Hierarchy, Division of Work, Co-ordination, Span of Control, Unity of Command, Line and Staff, Centralization and Decentralization, Departmentalization.

Bureaucracy: Meaning and Characteristics, Political and Administrative Role, Administrative Accountability: Legislative, Executive and Judiciary

প্রশাসনের অর্থ ও সংজ্ঞা

- প্রশাসনের ইংরেজি 'Administration' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Administrare' থেকে এসেছে, যার অর্থ সেবা প্রদান বা ব্যবস্থাপনা বা পরিচালনা করা।
- কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ব্যক্তিবর্গকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সহ তাদের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন হচ্ছে প্রশাসন।
- কোনো উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একাধিক লোকের কাজকে প্রশাসন বলা হয়।
- Luther Gulick এর মতে, 'কাজ করিয়ে নেওয়া, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যার্জনের সাথে প্রশাসন জড়িত।'
- J.M. Pfiffner & R.V. Presthus: বলেন, 'কাজের লক্ষ্যার্জনের মানবিক ও বস্তুগত সম্পদ কে সংগঠিত ও পরিচালিত করার কার্যক্রমই প্রশাসন।'

লোক প্রশাসনের অর্থ ও সংজ্ঞা

Public Administration (লোক প্রশাসন) এর 'public' অর্থ জনসাধারণ। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে লোক বলতে কোন একক ব্যক্তিকে না বুঝিয়ে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীকে বোঝানো হয়। আর Administration এর অর্থ রাষ্ট্র শাসন। তাহলে দুটি মিলে অর্থ দাঁড়াচ্ছে জনসাধারণের জন্য রাষ্ট্রের শাসন।

লোক প্রশাসনকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে লোক প্রশাসন কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যথা

১। সমগ্রত্বিকরণ মতবাদ (Integral Approach): লোক প্রশাসন ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থেকে। সরকারের বিভিন্ন কাজ লোকপ্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত। এই মতবাদের প্রবক্তা হলেন এল. ডি. হোয়াইট, উইলোবি, উড্রো উইলসন, ই. এম, হোয়াইট, ডিমোক প্রমুখ।

২। ব্যবস্থাপনা মতবাদ Managerial Approach: লোক প্রশাসনকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করার পক্ষপাতী। লুথার গুলিক, হেনরি ফেয়ল প্রমুখ এই মতবাদের প্রবক্তা। আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার জনক জন এফ টেইলর।

- লোক প্রশাসনের জনক হলেন উড্রো উইলসন। তিনি তার ১৮৮৭ সালের "প্রশাসনের অধ্যয়ন" (The Study of Administration) নামক প্রবন্ধে প্রথম লোকপ্রশাসনকে একটি পৃথক অধ্যয়নের ক্ষেত্র হিসেবে তুলে ধরেন এবং এটিকে রাজনীতি বিজ্ঞান থেকে আলাদা করে একটি সুনির্দিষ্ট বিষয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ওপর জোর দেন।
- এল ডি হোয়াইট এর মতে, লোক প্রশাসন হচ্ছে সেসব কার্যক্রমের সমন্বিত সমষ্টি, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারি নীতিমালার যথাযত বাস্তবায়ন।

প্রশাসনের পরিধি ও বিষয়বস্তু

"পসকনিসপ্রবা" হলো POSDCORB***

"পসকনিসপ্রবা" হলো POSDCORB এর বাংলা প্রতিশব্দ, যা লোক প্রশাসনের ক্ষেত্রে একটি বহুল ব্যবহৃত ধারণা এবং লুথার গুলিক (Luther Gulick) এটি প্রস্তাব করেন। POSDCORB একটি সংক্ষিপ্ত রূপ যা প্রশাসনের সাতটি প্রধান কাজকে বোঝায়।

- Planning (পরিকল্পনা): ভবিষ্যতে কী করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, এবং কারা করবে এই বিষয়গুলোর পূর্বনির্ধারণ।
- Organizing (সাংগঠনিককরণ): সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা, যেখানে কাজগুলো সুনির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেওয়া হয় এবং কর্মীদের মধ্যে কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বণ্টন করা হয়।
- Staffing (কর্মীসংস্থান); সঠিক ব্যক্তি নির্বাচন করা, তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া এবং তাদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করা।
- Directing (নির্দেশনা); কর্মীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং সঠিক পথে পরিচালিত করা।
- Coordinating (সমন্বয়): বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যাতে একটি একক উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সবাই মিলে কাজ করতে পারে
- Reporting (প্রতিবেদন): কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা, রেকর্ড রাখা এবং সংশ্লিষ্টদের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।
- Budgeting (বাজেট প্রণয়ন): আর্থিক পরিকল্পনা করা, নিয়ন্ত্রণ করা এবং হিসাব রাখা।

লোক প্রশাসন অধ্যয়নের পদ্ধতিগুলো

লোক প্রশাসন আলোচনায় বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন গবেষক এর অধ্যয়ন পদ্ধতিকে ২ ভাগে ভাগ করেছেন।
সনাতন এবং আধুনিক।

ঐতিহাসিক পদ্ধতি (Historical Method): প্রশাসনিক কাঠামো ও নীতির বিকাশকে ইতিহাসের ধারায় বিশ্লেষণ করে।
অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বর্তমানের সমস্যার সমাধান খোঁজা যায়। উদাহরণ: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমল থেকে বর্তমান
বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিবর্তন।

প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি (Institutional Method): সরকারী দপ্তর, মন্ত্রণালয়, সংস্থা ইত্যাদির কাঠামো, ক্ষমতা ও দায়িত্ব
বিশ্লেষণ করে। প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পর্ক ও কার্যপ্রণালী বোঝা যায়। উদাহরণ মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের গঠন,
ভূমিকা ও কার্যাবলি।

আইনগত পদ্ধতি (Legal Method): প্রশাসনের কাজের আইনগত ভিত্তি, বিধি-বিধান ও সাংবিধানিক কাঠামো
পর্যালোচনা করে। প্রশাসনিক ক্ষমতার সীমা ও দায়বদ্ধতা স্পষ্ট হয়। উদাহরণ: বাংলাদেশ সংবিধানের প্রশাসন সংক্রান্ত
ধারা।

কাঠামোগত-কার্যগত পদ্ধতি (Structural-Functional Method) প্রশাসনের কাঠামো (structure) ও প্রতিটি অংশের
কার্যাবলি (function) বিশ্লেষণ করে। সংগঠন ও কার্যসম্পাদনের কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা যায়। উদাহরণ: জেলা
প্রশাসকের দপ্তরের বিভাগভিত্তিক দায়িত্ব।

আচরণগত পদ্ধতি (Behavioral Method): প্রশাসনে জড়িত ব্যক্তিদের মনোভাব, মূল্যবোধ, প্রেরণা ও আচরণ বিশ্লেষণ
করে। নীতি বাস্তবায়নে মানবিক উপাদানের প্রভাব বোঝা যায়। উদাহরণ সরকারি কর্মচারীদের নৈতিকতা ও
জনসেবামুখী মানসিকতা।

তুলনামূলক পদ্ধতি (Comparative Method) ভিন্ন দেশ বা অঞ্চলের প্রশাসনিক ব্যবস্থা তুলনা করে। উন্নত প্রশাসনিক
চর্চা গ্রহণের সুযোগ তৈরি হয়। উদাহরণ বাংলাদেশ ও জাপানের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার তুলনা।

আন্তঃবিষয়ক পদ্ধতি (Interdisciplinary Method): সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি শাস্ত্রের
ধারণা একত্রে ব্যবহার করা। প্রশাসনের বহুমাত্রিক সমস্যা গভীরভাবে বোঝা যায়। উদাহরণ অর্থনৈতিক নীতি বাস্তবায়নে
সমাজ মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব বিশ্লেষণ।

বৈজ্ঞানিক/প্রায়োগিক পদ্ধতি (Scientific or Empirical Method): পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, জরিপ, পরিসংখ্যান
বিশ্লেষণ ব্যবহার করে প্রশাসন মূল্যায়ন করা। উদাহরণ নীতি বাস্তবায়নের কার্যকারিতা মাপতে জরিপ পরিচালনা।

সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসন

সরকারি প্রশাসনঃ সরকারি প্রশাসন জনগণের সেবা ও নীতি বাস্তবায়নের সাথে জড়িত, যা সরকার পরিচালনা করে এবং
জনগণের কাছে দায়বদ্ধ।

বেসরকারি প্রশাসনঃ বেসরকারি প্রশাসন লাভজনক বা অলাভজনক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, যা নিজস্ব মালিকানা বা
স্টেকহোল্ডারদের কাছে দায়বদ্ধ এবং বাজার প্রতিযোগিতা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

	সরকারি প্রশাসন	বেসরকারি প্রশাসন
উদ্দেশ্য	সরকারি প্রশাসন সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের সেবা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য পরিচালিত হয়।	এটি একটি ব্যবসায়িক বা মুনাফা-ভিত্তিক কার্যক্রম যা একটি নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানির পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার উপর জোর দেয়।
দায়বদ্ধতা	এর প্রধান দায়বদ্ধতা হলো জনগণ ও সরকারের কাছে।	এর দায়বদ্ধতা মূলত কোম্পানির মালিক, শেয়ারহোল্ডার বা অংশীদারদের প্রতি থাকে।
পরিধি	এটি সরকারি নীতি, আইন ও জনগণের সেবা সংক্রান্ত বিষয়গুলো পরিচালনা করে।	এটি পণ্য বা সেবা উৎপাদন, বিপণন, অর্থায়ন এবং কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে।
পরিচালনা	সরকারি প্রশাসন রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর অধীনে পরিচালিত হয়।	বেসরকারি প্রশাসন অধিকতর স্বাধীনতা ও ব্যবসায়িক কৌশলের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সেবা	সরকারি প্রশাসন সার্বজনীন সেবার উপর গুরুত্ব দেয়	বেসরকারি প্রশাসন গ্রাহকদের চাহিদা ও পছন্দের উপর নির্ভর করে সেবা প্রদান করে।
------	---	---

- সরকারি প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য জনকল্যান, বেসরকারি প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য মুনাফা।

পদসোপান নীতি (Principle of Hierarchy)

- পদসোপান কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো উচ্চতর স্তর কর্তৃক নিম্নতর স্তরকে নিয়ন্ত্রণ করা। কেউ কেউ পদসোপান নীতিকে 'Scaler process' বলেও অভিহিত করেছেন।
- পদসোপান নীতি হলো একটি সাংগঠনিক পদ্ধতি, যেখানে পদের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট ধারাক্রমে বিভিন্ন পদকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এই নীতি অনুযায়ী, প্রত্যেকটি নিম্নপদ কোনো না কোনো উচ্চতর পদের অধীনে থাকে এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা একটি কর্তৃত্ব ও জবাবদিহিতার সম্পর্ক তৈরি করে। এটি মূলত আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।
- কোনো উচ্চতর পদের অধীনে থাকে এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা একটি কর্তৃত্ব ও জবাবদিহিতার সম্পর্ক তৈরি করে। এটি মূলত আমলাতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

পদসোপান নীতির বৈশিষ্ট্যগুলো

- কর্তৃত্বের স্তরবিন্যাস
- নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা

- জ্যেষ্ঠতা ও মর্যাদা
- সাংগঠনিক কাঠামো: পদসোপান নীতি প্রতিষ্ঠানের একটি সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করে, যেখানে কে কার কাছে জবাবদিহি করবে তা স্পষ্ট থাকে।
- সুশৃঙ্খল কার্য সম্পাদন

পদসোপান নীতির সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা

- স্পষ্ট নির্দেশনাবলী
- উন্নত নিয়ন্ত্রণ
- জবাবদিহিতা বৃদ্ধি
- সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- কার্যকারিতা বৃদ্ধি

অসুবিধা

- ধীরগতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- যোগাযোগে বাধা
- মনস্তাত্ত্বিক চাপ
- উদ্ভাবনী ক্ষমতার অভাব:
- অতিরিক্ত আমলাতান্ত্রিকতা

নিয়ন্ত্রণ পরিধি (Span of Control)

নিয়ন্ত্রণ পরিধি (Span of Control): নিয়ন্ত্রণ পরিধি প্রশাসনিক সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। নিয়ন্ত্রণ পরিধি প্রশাসনের পবিত্র ও অলঙ্ঘনীয় নীতি। একজন প্রশাসক যতজন অধস্তন ব্যক্তি বা যতগুলো কাজের

ইউনিটকে ব্যক্তিগতভাবে পরিচালনা করতে পারেন নিয়ন্ত্রণ পরিধি বলতে তার সংখ্যাকে বুঝায়। একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পক্ষে কতজন লোকের কাজ তদারক করা সম্ভব, তা নিয়ন্ত্রণ পরিধি বা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপকতার নীতির মাধ্যমেই জানা যায়।

ডিমোক ও ডিমোক (Dimock and Dimock)- বলেছেন, " নিয়ন্ত্রণ পরিধি বা স্প্যান অব কন্ট্রোল বলতে কোন সংগঠনের প্রধান নির্বাহী কর্তা এবং তার প্রধান সহযোগী কর্মকর্তাদের মধ্যকার প্রত্যক্ষ, স্বাভাবিক যোগাযোগ সূত্রাদির সংখ্যা ও আওতাকেই বুঝায়। ডিমোক প্রদত্ত বক্তব্যটি মূলত 'মনোযোগের পরিধি' (Span of Attention) নীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

আদেশগত ঐক্য (Unity of Command)

প্রশাসনিক সংগঠনের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হচ্ছে আদেশগত ঐক্য। আদেশগত ঐক্য বলতে এ কথা বুঝায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তি কর্মচারীই কেবল একজন নিকটতম উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য। তিনি একাধিক উর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশের অধীন নন। আদেশগত ঐক্য এটা নির্দেশ করে যে, সংগঠনের প্রধান কর্মকর্তা অবশ্যই একজন একক ব্যক্তি হবেন; কোন বোর্ড বা কমিশন নয়।

কর্তৃত্ব অর্পণ (Delegation of Authority)

কর্তৃত্ব অর্পণ বলতে বোঝায় একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি (যেমন ব্যবস্থাপক) কর্তৃক অধীনস্থ কোনো কর্মচারীর কাছে কোনো নির্দিষ্ট কাজের দায়িত্ব ও ক্ষমতা হস্তান্তর করা।

কর্তৃত্ব অর্পণের মূল দিকসমূহ

- দায়িত্ব হস্তান্তর
- ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব
- ব্যবস্থাপকের ভূমিকা: তিনি কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন

উদ্দেশ্য

- কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়ানো।
- ব্যবস্থাপকের কাজের চাপ কমানো এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা।
- প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা।

লাইন এবং স্টাফ এজেন্সি (Line & Staff Agency)

- যে কোন দেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার অধিনে দুই ধরনের কর্মচারী কাজ করে। ১) লাইন এজেন্সি ২) স্টাফ এজেন্সি। উভয় শব্দের উৎপত্তি সামরিক বাহিনীতে।

লাইন এজেন্সি

- সরাসরি জনগণের জন্য পরিষেবা প্রদানের সাথে জড়িত।

উদাহরণস্বরূপ, স্বাস্থ্য বিভাগ, জনসেবা বা শিক্ষা বিভাগকে লাইন এজেন্সি হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে, কারণ তারা সরাসরি জনগণের কাছে সেবা পৌঁছে দেয়।

লাইন এজেন্সি এর প্রকারভেদ

- বিভাগ/ মন্ত্রণালয় (Division/ Ministry: শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)
- পাবলিক কর্পোরেশনঃ বেসরকারি বা ব্যবসায়ী প্রশাসন হতে ধার করা
- স্বতন্ত্র নিয়ন্ত্রক কমিশনঃ PSC, EC, CAG, etc..

স্টাফ এজেন্সি

- কর্মপরিকল্পনা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সম্পাদন করে
- কর্মী নিয়োগ করে।
- সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে।
- লাইন এজেন্সিকে সহায়তাদান

একটি স্টাফ ফাংশন বিশেষায়িত পরামর্শ এবং সহায়তা ফাংশন দিয়ে সংস্থাকে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ, মানবসম্পদ, অ্যাকাউন্টিং, জনসংযোগ এবং আইনি বিভাগকে সাধারণত স্টাফ ফাংশন হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

কেন্দ্রীকরণ (Centralization)

- একটি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং নীতি নির্ধারণের মতো ক্ষমতা সর্বোচ্চ স্তরে, অর্থাৎ অল্প সংখ্যক ব্যক্তি বা একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে।
- অধস্তন বিভাগগুলো একটি নির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকে।

বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization)

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তর বা বিভাগের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, যার ফলে নিম্নস্তরের কর্মীরাও সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ নিতে পারে এবং স্বায়ত্তশাসন লাভ করে।
- কেন্দ্রীয় সরকার, আঞ্চলিক বা স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা অর্পণ করে। ফলে স্থানীয় সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ তাদের নির্দিষ্ট চাহিদা অনুযায়ী কাজ করতে পারে এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

বিভাগীয়করণ (Departmentalization)

বিভাগীয়করণ (Departmentalization) হলো একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যেখানে কর্মীদের এবং কার্যাবলীগুলোকে নির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন দলে বা বিভাগে বিভক্ত করা হয়, যেমন কার্যকারিতা, ভৌগলিক অঞ্চল, পণ্য, গ্রাহক বা প্রক্রিয়া। এর মূল উদ্দেশ্য হলো কার্যকারিতা বৃদ্ধি, বিশেষীকরণ, এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য কাজগুলোকে সমন্বিত করা।

উদ্দেশ্য

কাজের দক্ষতাকে বাড়ানো, বিশেষজ্ঞদের একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে মনোনিবেশ করার সুযোগ দেওয়া, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সহজ করা, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা,।

আমলাতন্ত্র

- ফরাসি শব্দ Bureau ও গ্রিক শব্দ kratia শব্দ থেকে ইংরেজি Bureaucracy শব্দটির উদ্ভব যার অর্থ হলো Desk Government বা দপ্তর সরকার।
- আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) বলতে বোঝায় একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে স্থায়ী, অরাজনৈতিক সরকারি কর্মকর্তারা একটি নির্দিষ্ট কাঠামো ও নিয়ম মেনে সরকারের বিভিন্ন কাজ পরিচালনা করেন।
- অধ্যাপক ফাইনার এর মতে, "আমলাতন্ত্র হচ্ছে একটি স্থায়ী বেতনভুক্ত, পেশাজীবী এবং সুদক্ষ কর্মচারীবৃন্দ।
- আমলাতন্ত্রের সদস্যরা রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে কাজ করেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন এবং তারা তাদের প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা দিয়ে সরকারি নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করেন।

মূল বৈশিষ্ট্য

- শ্রেণিবিন্যাস ও দায়িত্ব বিভাজন;
- কঠোর নিয়ম ও পদ্ধতির অনুসরণ
- রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা
- পেশাদারি দক্ষতা

ম্যাক্সওয়েবার এর আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

ম্যাক্স ওয়েবারের আমলাতন্ত্র তত্ত্ব অনুসারে, আমলাতন্ত্র হলো একটি সুশৃঙ্খল, যুক্তিপূর্ণ এবং দক্ষ সংগঠন ব্যবস্থা যা নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া, শ্রম বিভাজন, স্পষ্ট শ্রেণিবিন্যাস এবং ব্যক্তিগত নিরপেক্ষতার মাধ্যমে পক্ষপাতিত্ব দূর করে একটি কার্যকর শাসন নিশ্চিত করে। ওয়েবারকে আদর্শ আমলাতন্ত্রের জনক হিসেবে গণ্য করা হয়, যিনি এই মডেলকে 'আইনি ও যৌক্তিক মডেল' (Legal and rational Model) হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। ('Essays in Sociology' & 'Political Sociology' তার বিখ্যাত দুটি বই)

- ম্যাক্স ওয়েবারের আদর্শ ভিত্তিক আমলাতন্ত্র মূলত বৈধ যৌক্তিক কর্তৃত্বের (Legal Rational Authority) উপর প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গে তিনি ৩ ধরনের কর্তৃত্বের কথা বলেছেন।
 ১. ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব (Traditional Authority)
 ২. সম্মোহনীয়মূলক কর্তৃত্ব (Charismatic Authority)
 ৩. বৈধ যৌক্তিক কর্তৃত্ব (Legal Rational authority)

ওয়েবারের তত্ত্বের উদ্দেশ্য

আধুনিক সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং সমাজের সকল স্তরে সমান ও ন্যায্য শাসন প্রতিষ্ঠা করা

ম্যাক্সওয়েবার এর আমলাতন্ত্রের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ

ওয়েবারের তত্ত্ব অনুযায়ী, একটি আদর্শ আমলাতন্ত্রের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে:

- স্পষ্ট শ্রেণিবিন্যাস (Hierarchy):
- শ্রম বিভাজন ও বিশেষীকরণ (Specialization):
- আনুষ্ঠানিক নিয়ম ও পদ্ধতি (Formal Rules)
- নিরপেক্ষতা (Impersonality):

- পেশাগত দক্ষতা ও মেধাভিত্তিক নিয়োগ (Merit-Based System):
- স্থায়ী ও পেশাদারিত্ব (Permanence)

আমলাতন্ত্রের ক্রটিসমূহ

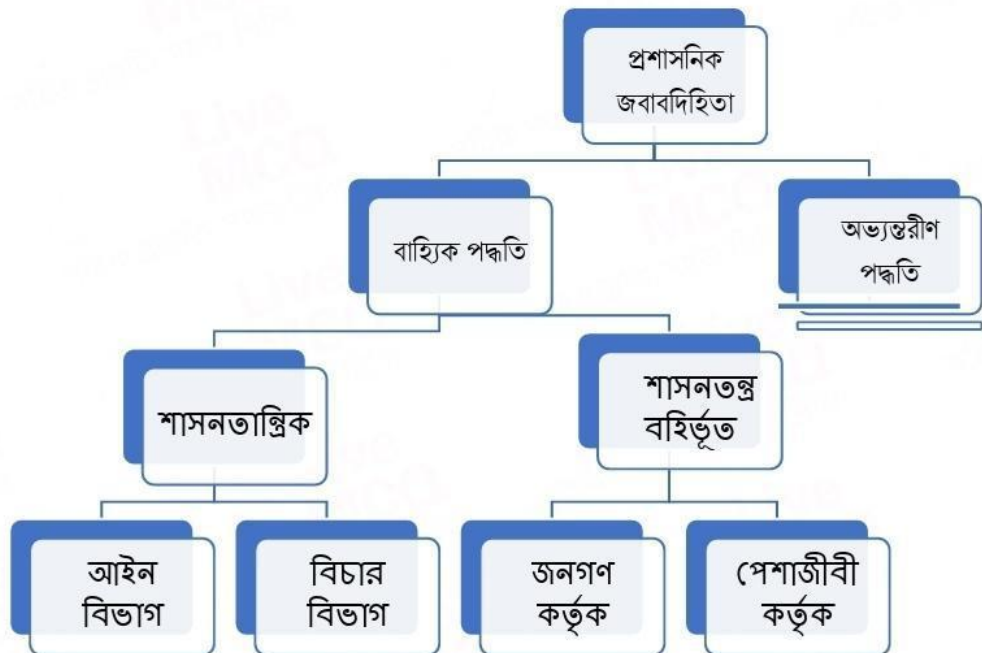
- লালফিতার দৌরাণ্য ও দীর্ঘসূত্রতা: আমলাতন্ত্রে পূর্বের নিয়ম ও পদ্ধতি অন্ধভাবে অনুসরণ করা হয়। ফলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয় এবং কাজে দীর্ঘসূত্রতা দেখা দেয়।
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব:
- জনগণের প্রতি উদাসীনতা ও অমানবিকতা:
- ক্ষমতার অপব্যবহার
- উদ্ভাবনী ও সৃজনশীলতার অভাব
- প্রশাসনিক অদক্ষত

প্রশাসনিক জবাবদিহিতা

- প্রশাসনিক জবাবদিহিতা হলো একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা ও প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে দায়বদ্ধ থাকে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ক্ষমতা অপব্যবহার রোধ করা, আমলাতন্ত্রকে আইনের অধীনে রাখা, এবং প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও দক্ষ করে তোলা। প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, স্বচ্ছতা, এবং নাগরিকদের অংশগ্রহণের মতো বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

প্রশাসনিক জবাবদিহিতার মূল বিষয়গুলো

- > দায়বদ্ধতার নীতি: প্রশাসন বা সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত, কাজ, নীতি ও প্রকল্পের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য থাকে।
- > ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ: আমলাতন্ত্রের ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা এবং ক্ষমতাকে আইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।
- > অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ: প্রশাসনের মধ্যেই বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে, যা কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে।
- > স্বচ্ছতা: তথ্যাদি ও প্রক্রিয়া জনগণের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়, যাতে তারা প্রশাসনের কাজ তদারকি করতে পারে।
- > নাগরিক অংশগ্রহণ: নাগরিকদের তাদের সরকারকে বা প্রশাসনকে জবাবদিহি করার সুযোগ দেওয়া হয়।



Lecture: 08

টপিক: প্রধান প্রধান বৈদেশিক সরকার যুক্তরাজ্য,
যুক্তরাষ্ট্র, PRC (গণপ্রজাতন্ত্রী চীন), জাপান।

গ্রেট ব্রিটেন ও তার সংবিধান

গ্রেট ব্রিটেন একটি বিশাল দ্বীপ, যেখানে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলস অবস্থিত, এবং এটি যুক্তরাজ্যের অংশ।
যুক্তরাজ্য (UK) হল একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র, যা ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড নিয়ে গঠিত। গ্রেট
ব্রিটেন হলো একটি ভৌগলিক শব্দ, যা যুক্তরাজ্য থেকে ভিন্ন, এবং এটি ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বৃহত্তম দ্বীপ।

যুক্তরাজ্য (United Kingdom):

এটি দেশটির মূল রাজনৈতিক নাম যা ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড, ওয়েলস এবং উত্তর আয়ারল্যান্ড এই চারটি সাংবিধানিক রাষ্ট্র
নিয়ে গঠিত।

গ্রেট ব্রিটেন (Great Britain):

এটি যুক্তরাজ্য বৃহত্তম দ্বীপ এবং এতে ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও ওয়েলস অন্তর্ভুক্ত।

সাংবিধানিক নাম (Constitutional Name):

রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিক আনুষ্ঠানিক নাম হলো "গ্রেট ব্রিটেন এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের যুক্তরাজ্য"।

- প্রশাসনিক সদর দপ্তরঃ হোয়াইট হল
- ওয়েস্টমিনিস্টারঃ পার্লামেন্ট ভবন
- গৌরবময় বিপ্লব হয় ১৬৮৮ সালে
- বিল অব রাইটস পাস হয় ১৬৮৯
- ব্রিটেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান
- রাজা দ্বিতীয় চার্লস এর সময় দল ব্যবস্থার উদ্ভব হয়। 'টোরি' ও 'হুইগ'
- ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নাম ১০নং ডাউনিং স্ট্রিট
- বাকিংহাম প্রসাদ হলো রাজা বা রানীর বাসভবন
- অর্থমন্ত্রীর বাসভবনের নাম ১১ নং ডাউনিং স্ট্রিট
- **গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত এবং বিবর্তিত।** এটি নির্দিষ্ট কোনো দলিল নয়, বরং বিভিন্ন লিখিত আইন, ঐতিহাসিক দলিল (যেমন ম্যাগনা কার্টা) এবং দীর্ঘদিনের প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথার সমন্বয়ে গঠিত। এই সংবিধানের মূল ভিত্তি হলো আইনের শাসন, যা একটি মুক্ত সমাজের জন্য অপরিহার্য বলে মনে করা হয়।
- **অধ্যাপক মুনরো, "The British constitution is the mother of all constitution, the British parliament is the mother of all parliament."**

- অধ্যাপক ফাইনার, 'ব্রিটিশ সংবিধান হলো বিরতিহীন ক্রমবিকাশ সংবিধান (The British Constitution is Constitution of never ending evolution.)'।

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান উৎসসমূহ

- অলিখিত রীতিনীতি ও ঐতিহ্য: সাংবিধানিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য, এবং প্রথাও যুক্তরাজ্যের সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- সংসদের আইন (Statute Law):
- আদালতের রায় (Judicial Precedents)
- সাংবিধানিক কনভেনশন (Constitutional Conventions); সরকার, সংসদ এবং রাজার (রাজতন্ত্র) কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে তৈরি হওয়া অলিখিত প্রথা ও নিয়মকানুন।
- ঐতিহাসিক সনদসমূহ (Historical Charters): ম্যাগনা কার্টা (Magna Carta), অধিকারের সনদ (Bill of Rights), অ্যাক্ট অফ সেটেলমেন্ট (Act of Settlement)।
- প্রামাণ্য গ্রন্থাবলী (Authoritative Works):

ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

- অলিখিত সংবিধান
- ধারাবাহিকতা ও বিবর্তনশীলতা
- নমনীয়
- এককেন্দ্রিক সংবিধান
- নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র
- পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব
- মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার
- আইনের শাসন
- সুপরিবর্তনীয় সংবিধান
- দলীয় ব্যবস্থা

ব্রিটেনের রাজতন্ত্র

- নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র বিদ্যমান। যুক্তরাজ্য একটি সাংবিধানিক রাজতন্ত্র, যেখানে রাজা বা রানী কার্যত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।
- রাজা বা রানী গ্রেট ব্রিটেনের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান যিনি উত্তরাধিকার বলে উক্ত পদে আসীন হোন।
- কে সি হুইয়ার রাজাকে 'জাঁকজমকপূর্ণ সাক্ষীগোপাল' বলেছেন।
- বর্তমান রাজার নাম চার্লস ফিলিপ আর্থার জর্জ
- দ্বিতীয় এলিজাবেথ ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ থেকে ৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের রানি ছিলেন। তিনি তার রাজত্বকালে যুক্তরাজ্য ছাড়াও আরও প্রায় ৩২ টি দেশের রানি ছিলেন এবং মৃত্যুকালে তার রাজত্ব ছিল ১৪টি কমনওয়েলথ রাজ্যের উপর। তার ৭০ বছর ২১৪ দিনের রাজত্ব ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ইতিহাসে দীর্ঘতম এবং তিনি ইতিহাসের সবচেয়ে দীর্ঘ সময় যাবত ক্ষমতায় থাকা নারী রাষ্ট্রপ্রধান।

ব্রিটেনের রাজশক্তির ক্ষমতার উৎস দুটি:

- বিশেষাধিকার (Prerogatives) এবং
- পার্লামেন্টের বিধিবদ্ধ আইন (Statute Law)।

ব্রিটিশ রাজতন্ত্র

> রাজার মৃত্যু হয়েছে, রাজা দীর্ঘজীবী হোন। এবং রাজার মৃত্যু নেই (The king can never die.)

> ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার অন্যতম একটি মূলনীতি, 'রাজা কোন অন্যায় করতে পারেন না।'

রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না।

> রাজা বা রাণী শিশুও নন আবার বৃদ্ধও নন।

রাজা বা রাণীর ক্ষমতা

- শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা
- নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা
- পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা
- আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা
- পার্লামেন্টে গৃহীত বিলে স্বাক্ষর
- বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা
- শাসনকার্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা
- সম্মান বিতরণ সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রভৃতি

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট

- ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হলো যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ আইনসভা, যা হাউস অফ কমন্স, হাউস অফ লর্ডস এবং রাজতন্ত্র এই তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত। এই দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংস্থাটি যুক্তরাজ্য (Great Britain and Northern Ireland) সহ ক্রাউন ডিপেন্ডেন্সি এবং ব্রিটিশ বিদেশী অঞ্চলগুলোর জন্য আইন প্রণয়ন করে। হাউস অফ কমন্স হলো জনপ্রিয়ভাবে নির্বাচিত নিম্নকক্ষ, অন্যদিকে হাউস অফ লর্ডস হলো উচ্চকক্ষ।



ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

ব্রিটিশ প্রশাসন ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু এবং আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা পার্লামেন্ট।

ক) লর্ডসভার ক্ষমতা

- আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা
- শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা

- গণতান্ত্রিক নীতি আদর্শের সংরক্ষণ
- বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা
- সমসাময়িক বিষয়াদির আলোচনা
- অন্যান্য ক্ষমতাঃ যেমন; কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর সাথে সম্প্রদায়িক রক্ষা করা

খ) কমন্সভার ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- আইন প্রণয়ন
- সরকার গঠন
- সরকারকে নিয়ন্ত্রণ
- সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ
- জনমত গঠন
- সংবাদ ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ
- সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ সাধন
- জনসাধারণের অধিকার সংরক্ষণ

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এর কমিটি ব্যবস্থা

বর্তমানে ব্রিটিশ কমন্সভাইয় ৫ ধরনের কমিটি গঠিত হয়। যথা

- সমগ্র কক্ষ কমিটি
- স্থায়ী কমিটি
- সিলেক্ট কমিটি
- বেসরকারি বিল কমিটি
- যৌথ কমিটি

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এর কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব

ব্রিটিশ কমিটি ব্যবস্থার গুরুত্ব হলো এটি সরকারকে জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য করে, নির্দিষ্ট নীতি ও সংস্থার কাজ তদারকি করে, আইন প্রণয়নে সহায়তা করে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণ প্রদান করে, যা সুস্থ ও কার্যকর সরকার পরিচালনায় অপরিহার্য।

হাউস অব কমন্স (House of Commons)

- ব্রিটিশ হাউস অব কমন্স হলো যুক্তরাজ্যের সংসদের নির্বাচিত নিম্নকক্ষ
- ৬৫০ জন সংসদ সদস্য (এমপি) জনগণের প্রতিনিধিত্ব করেন।
- জনকল্যাণকর আইন তৈরি করে, সরকারের আর্থিক বিষয়গুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং জনগণের প্রতি
- সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে।
- হাউস অব কমন্স, হাউস অব লর্ডসের চেয়ে শক্তিশালী।
- কার্ঠামো: হাউস অব কমন্সের কক্ষে সবুজ রঙের বেঞ্চ রয়েছে, যেখানে এমপিরা বিতর্ক ও আলোচনায় অংশ নেন।
- স্পিকার পদটি হাউস অব কমন্সের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, যিনি বিতর্কে অংশ নেন না কিন্তু হাউসের কাজ পরিচালনা করেন।

হাউস অব লর্ড (House of Lords)

- ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডস হলো যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ।

- আইন প্রণয়নে হাউস অব কমন্সকে সহায়তা করে এবং সরকারের কাজ তত্ত্বাবধান করে।
- এর সদস্যরা হলেন লর্ড ও ব্যারনেস, যারা বিভিন্ন পেশাগত ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ব্যবহার করে সরকারকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং আইনের খসড়া তৈরি ও সংশোধনে অংশ নেন।

গঠন ও সদস্যপদ

- হাউস অব লর্ডস প্রধানত জীবনব্যাপী সদস্য (Life Peers), বংশানুক্রমিক সদস্য (Hereditary) এবং চার্ট অব ইংল্যান্ডের কিছু বিশপ নিয়ে গঠিত। এতে কোনো রাজনৈতিক দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে না, কারণ এর সদস্যরা কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য নাও হতে পারে, যাদেরকে "ক্রসব্যাঞ্চার" বলা হয়।
- হাউস অব লর্ডস যুক্তরাজ্যের অন্যতম প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট

ব্রিটিশ ক্যাবিনেট হলো যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা, যা প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর নিয়োগকৃত মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত একটি কমিটি। এটি যুক্তরাজ্যের সরকার ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা সরকারের নীতি নির্ধারণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে এবং সরকারের সামগ্রিক পরিচালনার জন্য দায়ী থাকে।

গঠন:

যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেটের সভাপতিত্ব করেন এবং তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। ক্যাবিনেটের সদস্যরা সাধারণত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা হয়ে থাকেন।

ক্ষমতা ও কার্যকারিতা:

ক্যাবিনেট যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী সংস্থা। এটি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং নির্বাহী বিভাগের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

সংসদের কাছে দায়বদ্ধতা:

ক্যাবিনেট এবং তার সদস্যরা সরকারের নীতি ও কার্যক্রমের জন্য সংসদের কাছে দায়বদ্ধ থাকেন। এটি নিশ্চিত করে যে সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

প্রিভি কাউন্সিল

প্রিভি কাউন্সিল হলো যুক্তরাজ্যের সার্বভৌম রাষ্ট্রপ্রধানের পরামর্শদাতা একটি আনুষ্ঠানিক সংস্থা, যার সদস্যরা সাধারণত সিনিয়র রাজনীতিবিদ, আইনজীবী এবং ধর্মীয় নেতা। ঐতিহাসিকভাবে এটি ছিল রাজার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা এবং সরকারের ক্ষমতা কাঠামোর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যদিও এর ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং এটি মূলত মন্ত্রিপরিষদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, এটি এখনও আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সভা আয়োজন করে।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী

- মন্ত্রী পরিষদ শাসিত বা সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। এই ধরনের শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা থাকে মন্ত্রিসভার নিকট। এ মন্ত্রিসভার কেন্দ্রবিন্দু প্রধানমন্ত্রী।
- সবচেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ওয়ালপোল, (১ম প্রধান মন্ত্রী হিসেবে বিবেচনা করা হয়)।
- সবচেয়ে কম সময়ের জন্য দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন লিজ ট্রাস
- বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম কিয়ার স্টারমার (লেবার পার্টি)।
- ১৯৩৭ সালের রাজমন্ত্রী আইনে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পদ সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে।

- সাধারণ নির্বাচনের পর পার্লামেন্ট এর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই রাজা বা রাণী প্রধানমন্ত্রী পদের জন্য মনোনীত করেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হবার যোগ্যতা

- কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে।
- অবশ্যই কমন্সসভার সদস্য হতে হবে।
- নিজ দলে গ্রহণযোগ্যতা থাকতে হবে।
- কেবিনেট এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে ক্ষমতা

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পদমর্যাদা

- কেবিনেট নেতা
- কমন্সসভার নেতা
- দলের নেতা
- জাতির নেতা

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- প্রধানমন্ত্রী সংসদীয় শাসনব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী যুক্তরাজ্যের শাসনব্যবস্থায় তাকে একটি প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত করে।
- সরকার প্রধান
- মন্ত্রিসভা গঠন ও পরিচালনা
- সংসদে নেতৃত্ব
- নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন
- বৈদেশিক সম্পর্ক
- রাজকীয় ক্ষমতা প্রয়োগ
- জনগণের প্রতিনিধিত্ব

ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা

যুক্তরাজ্য দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বিদ্যমান।

- ১৬৭৯ সালে সর্বপ্রথম টোরি (Tory) ও হুইগ (Whig) এই দুই দলের প্রাধান্য ছিল।
- ১৮৩২ সালের সংস্কার আইনের মাধ্যমে টোরি ও হুইগ এই দুই দলের নাম পরিবর্তন হয়ে যথাক্রমে 'রক্ষণশীল (Conservative)' ও 'উদারনৈতিক (Liberal)'।
- ১৮৯৯ সালে শ্রমিক দল (Labour party) গঠিত হয়।
- যদিও এটি একটি বহু-দলীয় ব্যবস্থা, ১৯২০ সাল থেকে কনজারভেটিভ পার্টি এবং লেবার পার্টি এই দুটি দলই ব্রিটিশ রাজনীতিতে প্রধান শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করেছে।
- যুক্তরাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলো দীর্ঘ বিবর্তনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছে এবং বর্তমানে তারা ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
- ব্রিটিশ ব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গঠিত, যেখানে জনগণ ভোটের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আমেরিকা মহাদেশের মধ্যভাগে অবস্থিত। উত্তরে কানাডা এবং দক্ষিণে সংযুক্ত মেক্সিকান রাষ্ট্রসমূহ অবস্থিত। পূর্বে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত এই দেশ। এছাড়া হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা অঙ্গরাজ্য এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচ্ছিন্ন ভূমি এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (United States of America)
- সরকার ব্যবস্থাঃ রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
- আইন সভাঃ দ্বিকক্ষবিশিষ্ট
- সিনেটের সদস্যসংখ্যাঃ ১০০
- প্রতিনিধিসভার সদস্যসংখ্যাঃ ৪৩৫
- মোট অঙ্গরাজ্যঃ ৫০ টি
- ইলেক্টোরাল কলেজের মোট ভোটঃ ৫৩৮
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতিঃ জর্জ ওয়াশিংটন (ফেব্রুয়ারি ২২, ১৭৩২ ১৭৯৯)
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট এর নামঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প (৪৭ তম)
- আমেরিকার স্বাধীনতার মূল লেখকঃ থমাস জেফারসন।
- স্বাধীনতা দিবসঃ ৪ জুলাই ১৭৭৬
- ১৭৮৩ সালে স্বাক্ষরিত প্যারিস চুক্তি-এর মাধ্যমে ব্রিটেন আনুষ্ঠানিকভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা মেনে নেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর সংবিধান

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান হলো দেশটির সর্বোচ্চ আইন এবং বিশ্বের প্রাচীনতম লিখিত সংবিধানগুলোর মধ্যে অন্যতম, যা ১৭৮৯ সালে কার্যকর হয়।
- এটি একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করে, যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলোর মধ্যে ভাগ করা হয়।
- সংবিধানটি একটি প্রস্তাবনা, সাতটি অনুচ্ছেদ এবং পরবর্তীতে যোগ হওয়া ২৭টি সংশোধনী নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে প্রথম ১০টি সংশোধনীকে 'বিল অব রাইটস' বলা হয়, যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকার রক্ষা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এর সংবিধান বৈশিষ্ট্য

- যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা
- ক্ষমতার পৃথকীকরণ
- দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা
- চেকস ও ব্যালেন্স
- মৌলিক অধিকার
- লিখিত ও সংশোধনীয়োগ্য
- সংক্ষিপ্ত সংবিধান
- দ্বৈত-নাগরিকত্ব
- মৌলিক অধিকার

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হলো এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার (ফেডারেল সরকার) এবং রাজ্য সরকারগুলো (অঙ্গরাজ্য সরকার) ক্ষমতা ভাগ করে নেয়। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উভয়ই সংবিধান অনুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ করে এবং উভয়ই নিজস্ব ক্ষেত্রে মৌলিক ক্ষমতার অধিকারী। এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও আইন প্রণয়ন করে, অন্যদিকে অঙ্গরাজ্য সরকারগুলো স্থানীয় চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেদের শাসনকার্য পরিচালনা করে।

প্রধান বৈশিষ্ট্য

- দ্বৈত সরকার ব্যবস্থা
- ক্ষমতার বিভাজন
- লিখিত সংবিধান
- দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
- রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার
- দ্বৈত নাগরিকতা

মার্কিন প্রেসিডেন্ট

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থার গৃহীত হয়েছে।
- সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের প্রধান। তিনিই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসক।
- তিনি রাষ্ট্র প্রধান।
- তার কার্যকাল ৪ বছর।
- একজন ব্যক্তি ২ বারের বেশি রাষ্ট্রপতি হতে পারেন না।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতিঃ জর্জ ওয়াশিংটন (ফেব্রুয়ারি ২২, ১৭৩২-১৭৯৯)। স্বাধীনতার জনক।
- ১৬ তম প্রেসিডেন্ট হলেন আব্রাহাম লিংকন। ১৮৬৩ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি আইনত দাসপ্রথা বিলুপ্ত করেন।
- ২৬ তম প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট। থিওডোর রুজভেল্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম নোবেল বিজয়ী প্রেসিডেন্ট।
- ২৮ তম প্রেসিডেন্ট থমাস উড্রো উইলসন। লোক প্রশাসন বিষয়ের অন্যতম প্রবক্তা বলে গণ্য করা হয়।
- ৩২ তম প্রেসিডেন্ট ফ্রাংকলিন ডি রুজভেল্ট। টানা ১২ বছর ক্ষমতায় ছিলেন।
- ৩৩ তম প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রথম ও একমাত্র ব্যবহারের অনুমোদন দেন ট্রুম্যান।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট এর নামঃ ডোনাল্ড ট্রাম্প (৪৭ তম)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

- যে বছর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হয়, সেই বছরের নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট গ্রহণ করা হয়
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী বেশি সংখ্যক ভোটারের ভোট (পপুলার ভোট) পাওয়ার পরও বিজয়ী নাও হতে পারেন। এর কারণ দেশটিতে ভোটাররা সরাসরি প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করেন না। সেখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হয় 'ইলেক্টোরাল কলেজ' নামে বিশেষ একটি ব্যবস্থায়। এক্ষেত্রে জাতীয় স্তরের নির্বাচনি লড়াইয়ের বদলে প্রার্থীদের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হবে স্থানীয়ভাবে, তথা প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের নির্বাচনি লড়াইয়ের মাধ্যমে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের একটিতে জয়ী হওয়ার অর্থ হলো একজন প্রেসিডেন্ট প্রার্থী সেই অঙ্গরাজ্যের সবকটি 'ইলেক্টোরাল কলেজ' ভোট পেয়ে যাবেন।
- দেশটিতে ইলেকটোরাল কলেজের মোট ভোটের সংখ্যা ৫৩৮টি।

- মাইন ও নেব্রাসকা- এই দু'টি অঙ্গরাজ্য বাদে বাকি ৪৮টি অঙ্গরাজ্যের ইলেকটোরাল ভোট যোগ দিয়ে যে প্রার্থী ২৭০টি বা তারও বেশি 'ইলেক্টোরাল কলেজ' ভোট পাবেন, তিনিই হবেন পরবর্তী মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
- বিজয়ী প্রার্থীর প্রার্থীর রানিং মেট হবেন দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট।
- সাধারণ ভোটারদের ভোটে পিছিয়ে থেকেও ইলেকটোরাল ভোটে যুক্তরাষ্ট্রের এখন পর্যন্ত পাঁচজন ব্যক্তি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন, যার মধ্যে রিপাবলিকান পার্টির ডোনাল্ড ট্রাম্প ও জর্জ ডব্লিউ বুশও রয়েছেন।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট এর ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হলো তিনি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান, কংগ্রেসের পাস করা বিল ভেটো করার ক্ষমতা রাখেন, চুক্তি করতে পারেন, সেনেটের অনুমোদনে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে নিয়োগ দিতে পারেন এবং আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণে ভূমিকা পালন করেন। তার ক্ষমতা মার্কিন সংবিধান দ্বারা নির্ধারিত এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতির অধীনে চেক ও ব্যালেন্সের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়।

সামরিক ক্ষমতা

- আইন প্রণয়নে ভূমিকা
- নিয়োগ ও পদচ্যুতি
- চুক্তি সম্পাদন
- আন্তর্জাতিক নীতি
- নির্বাহী ক্ষমতা
- বিচারিক ক্ষমতা

সীমাবদ্ধতা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী, ক্ষমতা পৃথকীকরণ নীতি অনুসরণ করা হয়, যার ফলে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা এককভাবে কাজ করে না। কংগ্রেস আইন প্রণয়ন ও বাজেট নিয়ন্ত্রণ করে, যা রাষ্ট্রপতির ক্ষমতাকে সীমিত করে। এছাড়া, বিচার বিভাগও রাষ্ট্রপতির কর্মকাণ্ডের উপর নজরদারি রাখে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভা,

- আইনসভা যা 'কংগ্রেস' নামে পরিচিত। দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত।
উচ্চকক্ষ 'সিনেট' এবং নিম্নকক্ষ 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস'।
- এর মূল ক্ষমতাগুলো হলো আইন প্রণয়ন, যুদ্ধ ঘোষণা, আন্তঃরাজ্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, এবং কর আরোপ ও ব্যয় নীতি নির্ধারণ করা।
- কংগ্রেস সরকারে একটি পৃথক শাখা হিসেবে কাজ করে, যা অন্যান্য শাখার (নির্বাহী ও বিচার বিভাগ) কাজের উপর নজর রাখে।

সিনেট:

- এটি কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে সমান সংখ্যক, অর্থাৎ ২ জন করে সিনেটর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হন, রাজ্যের জনসংখ্যা নির্বিশেষে।
- সদস্য ১০০; ৫১ (অথবা ৫০ প্রেসিডেন্ট অব সিনেট) সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য
- মেয়াদঃ ৬ বছর

সিনেট সদস্যদের যোগ্যতা: মার্কিন সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদের দ্বিতীয় ধারায় সিনেট সদস্যদের যোগ্যতা সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ক. প্রার্থীর বয়স হবে সর্বনিম্ন ৩০ বছর;

খ. প্রার্থীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একাধারে ৯ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হবে;

গ. যে নির্বাচনি এলাকা থেকে নির্বাচন করবেন সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।

ঘ. সিনেটের সদস্য থাকাকালীন সময়ে কোনো ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি কোনো চাকরিতে কর্মরত থাকতে পারবেন না।

সিনেটের ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- সিনেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার কংগ্রেসের উচ্চকক্ষ হলেও এর কর্তৃত্ব ও মর্যাদা দ্বিতীয় কক্ষ অপেক্ষা অনেক বেশি। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের উচ্চকক্ষের মধ্যে মার্কিন সিনেট সর্বাধিক শক্তিশালী হিসেবে সর্বজনবিদিত।
- আইনবিষয়ক ক্ষমতা
- আইনবিষয়ক ক্ষমতা
- শাসনবিষয়ক ক্ষমতা
- পররাষ্ট্রনীতিবিষয়ক ক্ষমতা
- বিচার বিষয়ক ক্ষমতা
- নির্বাচনবিষয়ক ক্ষমতা
- তদন্ত করার ক্ষমতা
- সংবিধান সংশোধনমূলক ক্ষমতা
- নির্বাচন সংক্রান্ত ক্ষমতা
- নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা
- চুক্তি ও সন্ধি অনুমোদন ক্ষমতা
- যুদ্ধ ঘোষণা
- প্রশাসনিক ক্ষমতা

হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ (United States House of Representatives) হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিকক্ষবিশিষ্ট কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ।

এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভার একটি অংশ, যা মার্কিন সিনেটের সাথে মিলিতভাবে দেশের জন্য আইন পাস করে। এই প্রতিনিধি সভাটি 1789 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এর সদস্যরা জনগণের দ্বারা নির্বাচিত হন।

- সদস্য সংখ্যা ৪৩৫
- প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে তাদের জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়, যা আসন সংখ্যা নির্ধারণে ভূমিকা রাখে।

ক্ষমতা ও কার্যাবলি

- আইন প্রণয়ন
- কর ও বাজেট
- অভিশংসন
- নির্বাচন
- প্রতিনিধিত্ব
- সিনেটের সাথে যৌথ ক্ষমতা

মার্কিন সংবিধানের নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি

১. কংগ্রেসের উপর অন্যান্য বিভাগের নিয়ন্ত্রণ; মার্কিন রাষ্ট্রপতি কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারে না। আইন প্রণয়নের যাবতীয় ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে ন্যস্ত আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়নের অনুরোধ সম্বলিত বাণী কংগ্রেসে পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রপতির এই বাণী কংগ্রেস আলোচনা করা হয়।

২. শাসন বিভাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ: মার্কিন শাসন বিভাগের চূড়ান্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত আছে। রাষ্ট্রপতি কিন্তু কংগ্রেস ও সুপ্রিমকোর্টের নিয়ন্ত্রণ মুক্ত নন। কিন্তু এই মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কংগ্রেস রাষ্ট্রপতিকে পদচ্যুত করতে পারে।

৩. বিচার বিভাগের উপর নিয়ন্ত্রণ: রাষ্ট্রপতি সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতিদের নিযুক্ত করেন। এই নিযুক্ত সিনেটের অনুমোদন সাপেক্ষ। আবার কংগ্রেস সুপ্রিমকোর্টের আপিল বিষয়ক ক্ষমতা জাতীয় আদালতসমূহের এখতিয়ার বিভিন্ন অধস্তন জাতীয় আদালত গঠন ও বিলোপ প্রভৃতি বিষয়ে ক্ষমতা ভোগ করে।

৪. শাসন বিভাগের ওপর আইন বিভাগের প্রাধান্য:

৫. বিচার বিভাগের উপর আধিপত্য: সুপ্রিমকোর্ট নিজেকে মার্কিন সংবিধানের অভিভাবক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দলীয় ব্যবস্থা মূলত একটি দ্বি-দলীয় ব্যবস্থা, যেখানে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি এবং রিপাবলিকান পার্টি প্রধান রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রভাবশালী। এই দুটি দল ১৯শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হচ্ছে এবং দেশটিতে রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রেখেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে দলীয় ব্যবস্থার কোনো উল্লেখ নেই, এটি প্রথা ও কনভেনশনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।

দলগুলোর পরিচিতি

- ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (Democrats): একটি আধুনিক উদারপন্থী দল। দলীয় প্রতীক গাধা
- রিপাবলিকান পার্টি (Republicans): একটি রক্ষণশীল দল। দলীয় প্রতীক হাতি

PRC/গণপ্রজাতন্ত্রী চীন

চীনের ঐতিহাসিক পটভূমি

- চীনের ইতিহাস প্রাচীনতম এবং অবিচ্ছিন্ন সভ্যতার একটি। হুয়াংহো ও ইয়াংজি নদীর অববাহিকায় এর সূচনা হয়। এই সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল বিভিন্ন রাজবংশের উত্থান-পতন, যার মধ্যে শাং (Shang) রাজবংশ ছিল প্রথম লিখিত ও প্রামাণিক রাজবংশ। কাগজ, গানপাউডার, এবং কম্পাসের মতো যুগান্তকারী উদ্ভাবন এবং কনফুসিয়াসের মতো দার্শনিক চিন্তাধারা এই সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রাচীন চীন (Ancient China)

১. শিয়াং রাজবংশ (Xia Dynasty) (প্রায় ২০৭০- ১৬০০ খ্রিষ্টপূর্ব) চীনের প্রথম রাজবংশ বলে বিবেচিত, যদিও এর অস্তিত্ব নিয়ে বিতর্ক আছে। এটি ছিল একটি প্রাথমিক ব্রোঞ্জ যুগের সভ্যতা।

২. শাং রাজবংশ (Shang Dynasty) (প্রায় ১৬০০ ১০৪৬ খ্রিষ্টপূর্ব) চীনে প্রথম প্রমাণিত ইতিহাসিক রাজবংশ। লিখিত ভাষার সূচনা এবং ব্রোঞ্জ নির্মাণে অগ্রগতি ঘটে।

৩. ঝৌ রাজবংশ (Zhou Dynasty) (প্রায় ১০৪৬ ২৫৬ খ্রিষ্টপূর্ব) "স্বর্গের আদেশ" (Mandate of Heaven) ধারণার সূচনা। দার্শনিক ব্যক্তিত্ব যেমন কনফুসিয়াস (Confucius) ও লাওৎসে (Laozi) এই সময়েই জন্ম নেন।

সাম্রাজ্যিক চীন (Imperial China)

৪. ছিন রাজবংশ (Qin Dynasty) (২২১-২০৬ খ্রিষ্টপূর্ব) প্রথম সম্রাট ছিন শিহুয়াংদি (Qin Shi Huang) পুরো চীন একত্রিত করেন।

- মহাপ্রাচীর (Great Wall) নির্মাণের সূচনা
- অত্যন্ত কঠোর আইনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

৫. হান রাজবংশ (Han Dynasty) (২০৬ খ্রিষ্টপূর্ব-২২০ খ্রিষ্টাব্দ)

- চীনের স্বর্ণযুগ।
- সিল্ক রোড (Silk Road) চালু হয়, যা এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের পথ খুলে দেয়।

৬. তাং ও সঙ রাজবংশ (Tang and Song Dynasties) (৬১৮-১০৭, ৯৬০-১২৭৯)

- সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষ।
- মুদ্রণ প্রযুক্তি, গান পাউডার, এবং কম্পাসের আবিষ্কার।

৭. ইউয়ান রাজবংশ (Yuan Dynasty) (১২৭১-১৩৬৮)

- মঙ্গোল শাসন: চেঙ্গিস খান ও কুবলাই খান।
- বিদেশি প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

৮. মিং ও ছিং রাজবংশ (Ming and Qing Dynasties)- (১৩৬৮-১৯১২)

- শিল্প, স্থাপত্য ও নৌবাহিনীতে উন্নতি।
- ছিং রাজবংশ ছিল শেষ রাজবংশ, মাঞ্চু জাতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।

আধুনিক চীন (Modern China)

৯. চীনা সাম্রাজ্যের পতন (Fall of the Empire) - ১৯১২। শেষ সম্রাট পু ইয়ি (Puyi) কে অপসারণ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টা (Sun Yat-sen)।

১০. গৃহযুদ্ধ ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রতিষ্ঠা

১৯৪৯ সালে মাও সেতুং (Mao Zedong)-এর নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি চীনকে দখল করে।

- "People's Republic of China" প্রতিষ্ঠিত হয়।
- চিয়াং কাই-শেক (Chiang Kai-shek) পালিয়ে তাইওয়ান যান।

সমসাময়িক চীন (Contemporary China)

- ১৯৭৮ সাল থেকে দেং শিয়াওপিং এর নেতৃত্বে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়।
- ধীরে ধীরে বাজার অর্থনীতির দিকে রূপান্তর ঘটে, বিদেশি বিনিয়োগ বাড়ে।
- বর্তমানে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

১. সাংবিধানিক সংস্কারের সূচনা (Qing রাজবংশের শেষ সময়) ১৯০৫ সালের দিকে ছিং (Qing) রাজবংশ বুঝতে পারে যে পশ্চিমা শক্তির মোকাবিলা করতে হলে শাসনব্যবস্থায় সংস্কার আনা জরুরি।

- তারা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy) গঠনের পরিকল্পনা করে।

- ১৯০৮ সালে একটি প্রাথমিক সংবিধান প্রকাশিত হয়: "Outline of the Constitution", যা জনগণের অধিকার সীমিতভাবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এই সংস্কার খুব দীর্ঘে এগোচ্ছিল এবং জনগণের মধ্যে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়নি।

২. ১৯১১ সালের শিনহাই বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রী চীনের জন্ম

- ১৯১১ সালে ছিং রাজবংশ পতনের পর সুন ইয়াত-সেন (Sun Yat-sen) নেতৃত্বে চীনে প্রথমবারের মতো প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯১২ সালে "প্রজাতন্ত্রী চীন" (Republic of China) সংবিধান গ্রহণ করে।
- এটি ছিল চীনের প্রথম গণতান্ত্রিক সংবিধান, যেখানে আইনসভা, নির্বাহী ও বিচার বিভাগের আলাদা ক্ষমতা ছিল।

বর্তমান সাংবিধানিক অবস্থা (গণপ্রজাতন্ত্রী চীন)

- ১৯৪৯ সালে মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (People's Republic of China) প্রতিষ্ঠিত হয়।
- প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় ১৯৫৪ সালে।
- বর্তমান সংবিধান কার্যকর হয় ১৯৮২ সালে, এবং এর পর কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে।

সংবিধান অনুযায়ী:

- চীনা কমিউনিস্ট পার্টি-ই দেশের নেতৃত্ব প্রদান করে।
- রাষ্ট্রপতি, জাতীয় গণকংগ্রেস (NPC), ও প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা নির্ধারিত।
- একদলীয় শাসনব্যবস্থা বলবৎ থাকায় প্রকৃত গণতান্ত্রিক সংবিধানিক কাঠামো সীমিত।

মনে রাখবেনঃ

- > রাজতন্ত্র থেকে সংবিধান ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায় রূপান্তরের প্রচেষ্টা (বিশেষ করে ১৯০৫-১৯১২)
- > প্রজাতন্ত্রী চীনের (ROC) সাংবিধানিক বিকাশ (১৯১২-১৯৪৯)
- > গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের (PRC) আধুনিক সংবিধানিক কাঠামো (১৯৫৪-বর্তমান)

চীনের সংবিধান

- > চীনের সংবিধান (Constitution of the People's Republic of China) হলো দেশটির সর্বোচ্চ আইন।
- > এটি চীনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ও প্রশাসনিক কাঠামোর মৌলিক ভিত্তি নির্ধারণ করে।
- > যদিও এটি লিখিত সংবিধান, বাস্তবে চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (CCP)-র একচ্ছত্র কর্তৃত্বে দেশ পরিচালিত হয়।

- সংবিধানের ধরন: সমাজতান্ত্রিক, একদলীয়
- রাষ্ট্রের নাম: গণপ্রজাতন্ত্রী চীন (People's Republic of China)
- রাষ্ট্রীয় আদর্শ: সমাজতন্ত্র চীনা বৈশিষ্ট্যসহ
- প্রধান দল: চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (CCP)

চীনের সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

1. রাষ্ট্রের কাঠামো

চীন একটি একক ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

সংবিধানের ধারা ১ অনুযায়ী, "চীন একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার নেতৃত্ব দেয় শ্রমিকশ্রেণী, ভিত্তি কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী।"

2. কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব

সংবিধান CCP-কে রাষ্ট্রের নেতৃত্বদানকারী শক্তি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

বাস্তবে, পার্টি আইনের উর্ধ্বে, এবং সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত CCP নিয়ে থাকে।

3. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

সংবিধানে কিছু মৌলিক অধিকার এবং কর্তব্য বর্ণিত রয়েছে, যেমন:

- > মতপ্রকাশের অধিকার
- > ধর্মের স্বাধীনতা
- > শিক্ষা ও কাজের অধিকার
- > সমতার অধিকার

তবে এসব অধিকারের ব্যবহার করতে হয় রাষ্ট্র ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী নয় এমনভাবে।

4. সরকারি কাঠামো

ক) জাতীয় গণকংগ্রেস (NPC):

সংবিধান অনুযায়ী, NPC হল দেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ।

আইন প্রণয়ন, প্রেসিডেন্ট/প্রিমিয়ার নিয়োগ, সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা রয়েছে।

খ) রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী:

রাষ্ট্রপতি: রাষ্ট্রের প্রধান, কিন্তু সীমিত ক্ষমতা।

প্রধানমন্ত্রী: সরকারের প্রধান, নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

গ) বিচার বিভাগ:

সর্বোচ্চ আদালত: Supreme People's Court

স্বাধীনতার কথা বলা হলেও, বিচার বিভাগ পার্টি-নিয়ন্ত্রিত।

5. সংশোধনী (Amendments):

সংবিধান সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ:

- ২০১৮ সালের সংশোধনী: প্রেসিডেন্টের দুই মেয়াদের সীমা তুলে দেওয়া হয়। শি জিনপিং আজীবনের জন্য প্রেসিডেন্ট থাকতে পারেন।

সংবিধানের মূল চারটি অধ্যায়:

1. প্রস্তাবনা (Preamble) বিপ্লব, সমাজতন্ত্র ও CCP-এর ভূমিকা ব্যাখ্যা।
2. মৌলিক নীতিমালা (General Principles) রাষ্ট্রের কাঠামো ও আদর্শ।

3. নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য (Rights and Duties) নাগরিকদের ভূমিকা।

4. রাষ্ট্রীয় কাঠামো (Structure of the State) শাসনব্যবস্থার কাঠামো।

চীনের রাষ্ট্রপতি

- চীনের রাষ্ট্রপতি হলেন দেশের প্রতীকী রাষ্ট্রপ্রধান (Head of State)
- তবে চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে সীমিত প্রকৃত ক্ষমতা থাকে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক (CCP General Secretary) ও সেনাবাহিনী প্রধান (CMC Chairman)-এর হাতে।
- বর্তমান সময়ে এই তিনটি পদ একই ব্যক্তি অধিষ্ঠিত থাকেন শি জিনপিং (Xi Jinping)।
- বর্তমান রাষ্ট্রপতি: শি জিনপিং (Xi Jinping)
- প্রথম রাষ্ট্রপতি: মাও সেতুং (১৯৫৪)
- নিয়োগকারী: জাতীয় গণকংগ্রেস (NPC)
- মেয়াদ: পূর্বে ছিল ৫ বছর (কিন্তু সীমা নেই ২০১৮ থেকে)

> ক্ষমতা ও দায়িত্ব

- চীনের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির কাজগুলো মূলত প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক, যেমন:
-বিদেশি রাষ্ট্রদূত গ্রহণ ও নিযুক্তকরণ
-জাতীয় আইন প্রণয়নের অনুমোদন প্রদান
-প্রধানমন্ত্রীর নাম প্রস্তাব করা
-জাতীয় গণকংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যুদ্ধ বা শান্তির ঘোষণা

চীনের প্রধানমন্ত্রী

- চীনের প্রধানমন্ত্রী হলেন রাষ্ট্রীয় পরিষদের (State Council) প্রধান।
- তিনি দেশের সরকারপ্রধান (Head of Government) হিসেবে প্রশাসন, অর্থনীতি, আইন বাস্তবায়ন ও নীতিনির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
- বর্তমান প্রধানমন্ত্রী: লি কিয়াং (Li Qiang)
- নিয়োগকারী: রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব ও NPC-এর অনুমোদনে
- মেয়াদ: ৫ বছর (সর্বোচ্চ ২ মেয়াদ)
- সরকারের শাখা: রাষ্ট্রীয় পরিষদ (State Council)

প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা

- > প্রশাসনিক নীতি বাস্তবায়ন
- > বাজেট, পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- > মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়োগ ও তদারকি
- > আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ
- > NPC-এর প্রতি দায়বদ্ধ

প্রধানমন্ত্রী মূলত চীনের কার্যকর সরকারের প্রধান। তবে রাজনৈতিক ক্ষমতা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অধীন।

রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে পার্থক্য

দিক	রাষ্ট্রপতি	প্রধানমন্ত্রী
অবস্থান	রাষ্ট্রপ্রধান	সরকারপ্রধান
কাজ	প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক	কার্যকর প্রশাসনিক দায়িত্ব
নিয়োগ	NPC কর্তৃক নির্বাচিত	রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবে NPC অনুমোদন
বাস্তব ক্ষমতা	শর্তসাপেক্ষ	প্রশাসনে কার্যকর কিন্তু দলীয় নিয়ন্ত্রিত

চীনের আইনসভা (Legislature of China)

- > নামঃ জাতীয় গণকংগ্রেস (National People's Congress - NPC)
- > এটি চীনের একক কক্ষবিশিষ্ট (unicameral) আইনসভা।
- > চীনের সংবিধান অনুযায়ী, NPC হল রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক ও আইন প্রণয়নকারী সংস্থা।

মূল তথ্য:

বিষয়	তথ্য
নাম	জাতীয় গণকংগ্রেস (NPC)
প্রতিষ্ঠা	১৯৫৪ সালে
কার্যক্রম	একক কক্ষবিশিষ্ট
সদস্য সংখ্যা	প্রায় ২৯০০+
মেয়াদ	৫ বছর
অধিবেশন	বছরে ১ বার
বৈঠকের স্থান	গ্রেট হল অফ দ্য পিপল, বেইজিং
সর্বোচ্চ ক্ষমতা	সংবিধান সংশোধন, আইন প্রণয়ন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

চীনের আইনসভা (Legislature of China) বাস্তবচিত্র:

যদিও NPC সংবিধান অনুযায়ী চীনের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা, বাস্তবে এটি চীনা কমিউনিস্ট পার্টির (CCP) অধীনেই কাজ করে। বেশিরভাগ সিদ্ধান্ত আগেই পার্টি দ্বারা নির্ধারিত থাকে।

স্থায়ী কমিটি (Standing Committee):

NPC অধিবেশন বছরে ১ বার হয়, তাই স্থায়ী কমিটি সারা বছর দায়িত্ব পালন করে। সদস্য সংখ্যা: প্রায় ১৫০+, এটি আইন সংশোধন, তদারকি ও ব্যাখ্যার কাজ করে।

চীনের শাসন বিভাগ

- > চীনের শাসন ব্যবস্থা চলে ১৯৮২ সালের সংবিধান অনুযায়ী।

> তবে বাস্তবে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (CCP)-এর একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণে।

> চীনের সরকার ৫টি প্রধান শাসন বিভাগ দ্বারা পরিচালিত হয়।

চীনের শাসন বিভাগের প্রধান ৫টি অঙ্গ

জাতীয় গণকংগ্রেস (NPC)- আইনসভা

- সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী সংস্থা
- সদস্য সংখ্যা: ৩০০০+
- সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন করে
- প্রতিবছর ১ বার অধিবেশন হয়
- বাস্তবে CCP-এর নিয়ন্ত্রণে

রাষ্ট্রীয় পরিষদ (State Council) নির্বাহী বিভাগ

- সরকার পরিচালনার মূল কেন্দ্র
- নেতৃত্বে: প্রধানমন্ত্রী (বর্তমানে লি কিয়াং)
- মন্ত্রণালয়, ব্যাংক, প্রশাসন ইত্যাদি তদারকি
- আইন বাস্তবায়ন ও পরিকল্পনা তৈরি করে

বিচার বিভাগ (Judiciary)

- সর্বোচ্চ আদালত: Supreme People's Court
- শাস্তিমূলক ও দেওয়ানি মামলা বিচার করে
- সংবিধান অনুসারে স্বাধীন, কিন্তু বাস্তবে CCP নিয়ন্ত্রণে

সামরিক বিভাগ (Military)

নিয়ন্ত্রণে: Central Military Commission (CMC)

নেতৃত্বে: শি জিনপিং (CMC চেয়ারম্যান)

জনগণের সেনাবাহিনী (PLA) এর ওপর CCP-এর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ

জরদারি বিভাগ (Supervisory Commission)

-২০১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত

-দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম ও পার্টি কর্মকর্তাদের তদারকি করে

-রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তদন্ত সংস্থা

শাসন বিভাগ	সংক্ষিপ্ত ভূমিকা
আইনসভা (Legislature)	আইন প্রণয়ন, সংবিধান সংশোধন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
নির্বাহী বিভাগ (Executive)	প্রশাসন, নীতি বাস্তবায়ন, বাজেট, অর্থনীতি
বিচার বিভাগ (Judiciary)	আইন প্রয়োগ ও বিচার কার্য সম্পাদন
সামরিক বিভাগ (Military)	সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় প্রতিরক্ষা
নজরদারি বিভাগ (Supervisory)	দুর্নীতি ও রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের নজরদারি

চীনের রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা

- চীনের বলা হয় একটি একদলীয় রাষ্ট্র (One-Party State), কারণ এখানে বাস্তবে শুধু চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (CCP)-এর একচ্ছত্র শাসন বিদ্যমান।
- যদিও কয়েকটি "অন্যান্য দল" আছে, তারা CCP-এর অধীনস্থ এবং স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।

চীনা কমিউনিস্ট পার্টি (CCP)

- চীনের প্রধান ও ক্ষমতাসীন দল
- প্রতিষ্ঠা: ১ জুলাই ১৯২১
- প্রতিষ্ঠাতা: মাও সেতুং
- বর্তমান নেতা: শি জিনপিং
- CCP-ই রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসন, সেনাবাহিনী এবং বিচার ব্যবস্থার ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায়রাখে
- সেনাবাহিনী (PLA) সরাসরি CCP-এর অধীনে পরিচালিত হয়
- CCP-এর সাধারণ সম্পাদকই চীনের সবচেয়ে ক্ষমতাসালী ব্যক্তি

অন্যান্য রাজনৈতিক দল

চীনে CCP ছাড়াও ৮টি অনুমোদিত রাজনৈতিক দল আছে। এগুলোর নিজস্ব মতাদর্শ থাকলেও, তারা চীনা কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব মেনে চলে এবং স্বতন্ত্রভাবে কোনো রাজনৈতিক ক্ষমতায় যেতে পারে না।

চীনের দলীয় শাসনের বৈশিষ্ট্য

- দলনির্ভর শাসন: প্রশাসনের সর্বস্তরে CCP-এর প্রতিনিধিত্ব
- নিয়ন্ত্রিত নির্বাচন: প্রার্থীদের নির্বাচন ও ভোট CCP-এর অনুমোদন অনুযায়ী হয়
- গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ: পার্টির স্বার্থবিরোধী প্রচার নিষিদ্ধ
- মত প্রকাশ সীমিত: পার্টির সমালোচনা করলে শাস্তির বিধান
- প্রতিরক্ষা বাহিনী: সরাসরি CCP-এর অধীনে, রাষ্ট্রের অধীনে নয়

চীনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বনাম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা

বিষয়	চীন	গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র
দলীয় সংখ্যা	কার্যত ১টি	একাধিক
বিরোধী দল	নিষ্ক্রিয় বা অনুপস্থিত	সক্রিয়
নির্বাচন	নিয়ন্ত্রিত	মুক্ত ও প্রতিযোগিতামূলক
গণমাধ্যম	দলীয় নিয়ন্ত্রিত	স্বাধীন
মত প্রকাশ	সীমিত	উন্মুক্ত

জাপান

- রূপক: সূর্যোদয়ের দেশ (Land of the Rising Sun)
- জাপানের প্রধান চারটি দ্বীপ হলো হোনশু, হোক্কাইদো, কিউশু ও শিকোকু
- রাজধানী: টোকিও (Tokyo) (হোনশু)
- শাসন ব্যবস্থা: সংবিধানিক রাজতন্ত্র (Emperor হলো রাষ্ট্রপতি সাংকেতিক ভূমিকায়; বাস্তব রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের)।
- জাপানের মুদ্রার নাম হলো ইয়েন

জাপানের সংবিধান

জাপানের বর্তমান সংবিধান ১৯৪৬ সালে গৃহীত হয় এবং ১৯৪৭ সালে কার্যকর হয়, যা "শান্তি সংবিধান" নামে পরিচিত। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গৃহীত হয় এবং যুদ্ধের প্রতিশ্রুতি থেকে জাপানের সরে যাওয়ার বিষয়টি চিহ্নিত করে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে সম্রাটের ভূমিকা মূলত আনুষ্ঠানিক ও সীমিত থাকা এবং যুদ্ধ পরিহার করার নীতি গ্রহণ করা।

ঐতিহাসিক পটভূমি

মেইজি সংবিধান (১৮৮৯): জাপানের প্রথম লিখিত সংবিধান ছিল মেইজি সংবিধান, যা ১৮৮৯ সালে প্রণীত হয়েছিল এবং প্রুশিয়ান সংবিধান দ্বারা প্রভাবিত ছিল।

শান্তি সংবিধান (১৯৪৭): দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, ১৯৪৬ সালে একটি নতুন সংবিধান গৃহীত হয় যা মেইজি সংবিধানকে প্রতিস্থাপন করে।

শান্তি সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য

- শান্তি ও যুদ্ধ পরিহার: এটি জাপানি জনগণের একটি সার্বভৌম অধিকার হিসেবে চিরতরে যুদ্ধ পরিহার করার কথা বলে এবং সামরিক বাহিনী রাখা থেকে বিরত থাকে।
 - রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা: জাপান একটি সংসদীয় রাজতন্ত্র, যেখানে সম্রাটের ক্ষমতা মূলত আনুষ্ঠানিক ও সীমিত।
 - ক্ষমতার বিভাজন: সরকার আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ এই তিন ভাগে বিভক্ত।
- আমেরিকান প্রভাব: বর্তমান সংবিধানের খসড়া তৈরিতে আমেরিকান লেখকদের একটি বড় ভূমিকা ছিল, যদিও কিছু জাপানি পণ্ডিতও এতে পর্যালোচনা ও সংশোধন করেন।

জাপানের সম্রাট

- জাপানের সম্রাটের কোনো ক্ষমতা নেই, তিনি শুধু রাষ্ট্র ও জনগণের ঐক্যের প্রতীক হিসেবে কাজ করেন।

- ১৯৪৭ সালের সংবিধান অনুযায়ী, প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেটের হাতে থাকে।
- তবে, সম্রাট রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী নন হলেও রাষ্ট্রীয় নথিপত্রে স্বাক্ষর এবং গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ও আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।
- নারুহিতো (徳仁) জাপানের বর্তমান সম্রাট।
১ মে ২০১৯ থেকে সম্রাট হিসেবে অধিষ্ঠিত হন।

জাপানের প্রধানমন্ত্রী

- জাপানের প্রধানমন্ত্রী হলেন সরকার প্রধান।
- শিগেরু ইশিবা জাপানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।
- প্রধানমন্ত্রী ভায়েটের উভয় কক্ষ দ্বারা মনোনীত হন। সেই উদ্দেশ্যে, প্রত্যেকে রান-অফ সিস্টেমের অধীনে একটি ব্যালটে ভোট প্রদান করে। যদি দুটি কক্ষ ভিন্ন ব্যক্তিকে বেছে নেয়, তবে উভয় কক্ষের একটি যৌথ কমিটি কর্তৃক একজন সাধারণ মনোনীত প্রার্থীকে নিয়োগ করা হয়।
- প্রধানমন্ত্রী জাপানের মন্ত্রিসভার সভাপতিত্ব করেন
- মন্ত্রীদের নির্বাচন ও বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখেন।
- প্রধানমন্ত্রী জাপান স্ব-প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবেও কাজ করেন এবং
- তিনি হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ বা প্রতিনিধি পরিষদের (নিম্নকক্ষ) একজন সদস্য।
- বিভিন্ন প্রশাসনিক শাখার উপর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করেন।
- সাধারণ জাতীয় বিষয় এবং বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়ে ডায়েটে প্রতিবেদন করেন

জাপানের পার্লামেন্ট

- জাপানের পার্লামেন্টের নাম হলো জাতীয় ডায়েট (National Diet বা কোক্কাই)।
- এটি একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, যার মধ্যে একটি নিম্নকক্ষ প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) এবং একটি উচ্চকক্ষ হাউস অফ কাউন্সিলর (House of Councillors) রয়েছে।
- উভয় কক্ষের সদস্যরা সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হন।
- মোট সদস্য সংখ্যা হলো ৭১৩ জন। এর মধ্যে প্রতিনিধি সভার (House of Representatives) সদস্য সংখ্যা ৪৬৫ জন এবং উচ্চকক্ষ কাউন্সিলরদের হাউস (House of Councillors) বা সাজিন এর সদস্য সংখ্যা ২৪৮ জন।

নির্বাচন পদ্ধতি

- উভয় কক্ষের সদস্যরা সরাসরি সমান্তরাল ভোটিং পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

ক্ষমতা ও কার্যাবলী

- ডায়েট জাপানের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এবং এটিই একমাত্র আইন প্রণয়নকারী সংস্থা।
- ডায়েটের একজন সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করা হয়, যিনি পরবর্তীতে মন্ত্রিসভা গঠন করেন।
- আইনসভা "সরকার সম্পর্কে তদন্ত" পরিচালনা করতে পারে

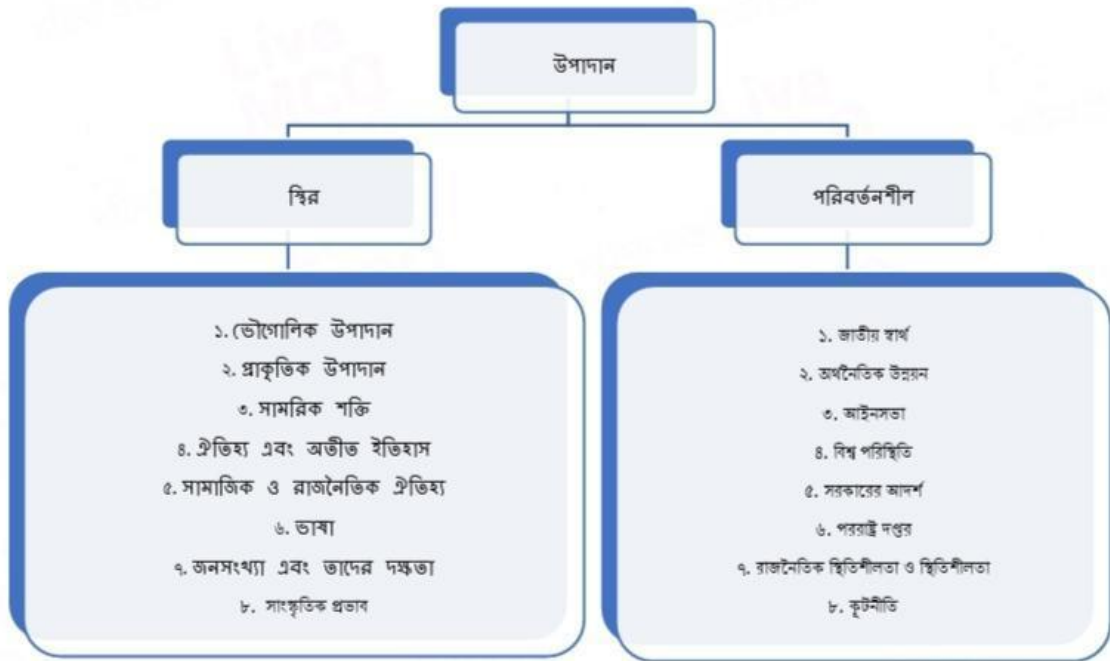
Lecture: 09
টপিক: বাংলাদেশের বৈদেশিক সম্পর্ক

বৈদেশিক নীতি (Foreign Policy)

- কোনো রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ নীতিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-
-অভ্যন্তরীণ নীতি
-পররাষ্ট্র নীতি

- বৈদেশিক নীতি বলতে বুঝায়- একটি রাষ্ট্র তার নিজের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও পরিচালনার জন্য যে কৌশল ও নীতিমালা অনুসরণ করে। এই নীতি নির্ধারিত হয় জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, এবং অন্যান্য বৈশ্বিক বিষয়গুলো বিবেচনা করে।
- অটোডন বিসমার্ক: 'অভ্যন্তরীণ নীতির সম্প্রসারণই হলো পররাষ্ট্র নীতি (The extension of domestic policy is foreign policy.)'
- প্যাডেল, লিংকন এবং ওল্ডে: 'কোনো রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র হলো সে রাষ্ট্রের জাতীয় নীতির সে অংশ যা তার বাহ্যিক পরিবেশের সাথে সম্পর্কযুক্ত।'

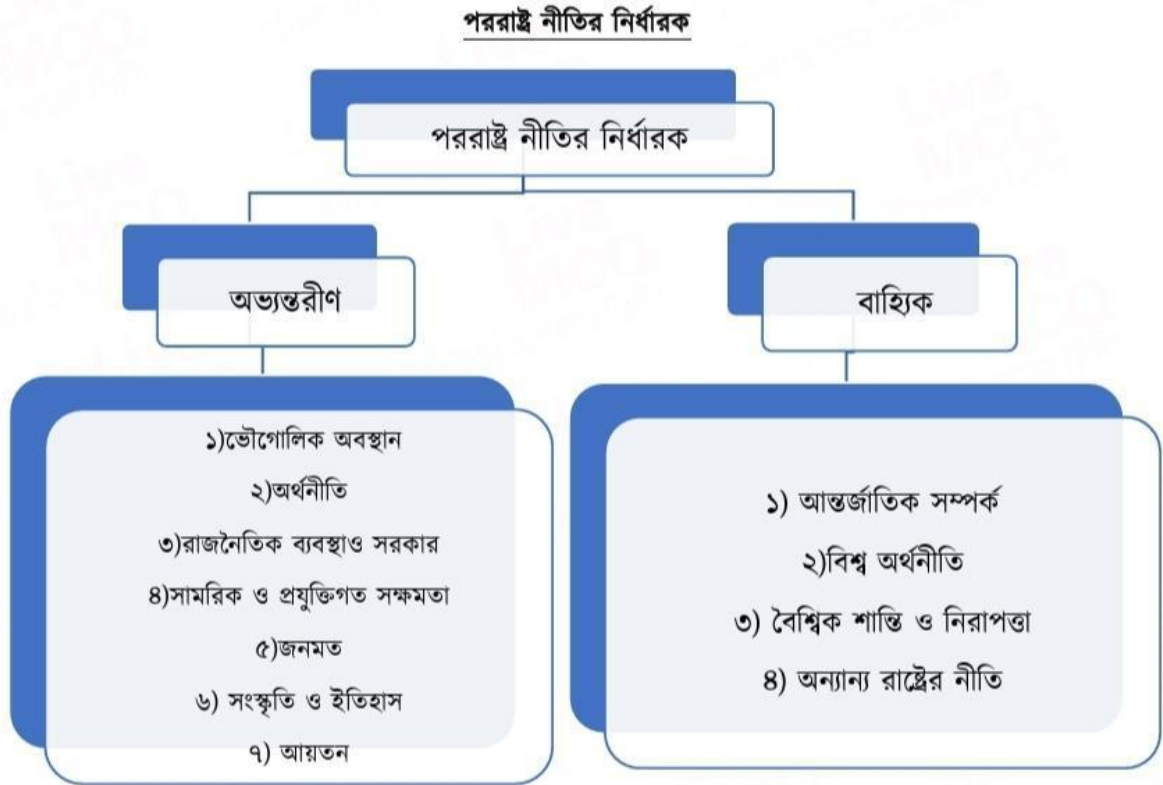
বৈদেশিক নীতির মূল উপাদান



পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ
- সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা
- অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন
- জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও প্রচার
- নাগরিক সুবিধা ও কল্যাণের উন্নয়ন
- জাতীয় মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির প্রচার

● শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান
পররাষ্ট্র নীতির নির্ধারক



কূটনীতি (Diplomacy)

- 'Diplomacy' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Diploun' থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো ভাজ করা।
- > কূটনীতি হলো রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির মধ্যে আলোচনা, যোগাযোগ ও চুক্তির মাধ্যমে সম্পর্ক স্থাপন, বজায় রাখা এবং উন্নত করার প্রক্রিয়া।
- > এর মূল লক্ষ্য হলো নিজ রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করা, সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান খুঁজে বের করা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বাড়ানো।
- > কূটনীতি মূলত একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নের জন্য পরিচালিত সরকারি কার্যক্রম

কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য

- সম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা
- স্বার্থ রক্ষা

- শান্তিপূর্ণ সমাধান
- সহযোগিতা বৃদ্ধি

কূটনীতির প্রক্রিয়া

- আলোচনা
- যোগাযোগ
- চুক্তি
- প্রতিনিধিত্ব

কূটনীতি কেন গুরুত্বপূর্ণ?

* বর্তমান বিশ্বে যেখানে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নানা ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান, সেখানে কূটনীতি একটি অপরিহার্য হাতিয়ার। এর মাধ্যমে একটি রাষ্ট্র তার বৈদেশিক নীতি কার্যকর করতে পারে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করতে পারে।

বাংলাদেশের অভ্যুদয় (Emergence of Bangladesh)

বাংলাদেশের অভ্যুদয় বলতে ১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত বিকাশের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্মকে বোঝায়। এই অভ্যুদয় ছিল দেশের মানুষের দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং শৃঙ্খলমুক্তির এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস, যার জন্মাত যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের কূটনীতি

- মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশের কূটনীতি ছিল প্রধানত বিশ্ব জনমতকে বাংলাদেশের পক্ষে আনা এবং কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা।
- এই প্রক্রিয়ায় প্রবাসী বাঙালি কূটনীতিক ও কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, যারা নিজেদের সরকারি পদ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে সাহায্য করেন।
- বিভিন্ন দেশে ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার চালান এবং ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশ থেকে সমর্থন আদায়ে সফল হন।
- কূটনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলগুলো জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার দাবি তুলে ধরে।
- কলকাতায় অবস্থিত পাকিস্তানের ডেপুটি হাইকমিশন কর্মীদের একটি দল হোসেন আলীর নেতৃত্বে পাকিস্তানকে প্রত্যাখ্যান করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং বাংলাদেশের প্রথম দূতাবাস হিসেবে কাজ শুরু করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনত যুদ্ধে পরাশক্তি সমূহের ভূমিকা

- বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রধান পরাশক্তিগুলোর ভূমিকা ছিল মূলত দুটি বিপরীতমুখী।
- যুক্তরাষ্ট্র ও চীন পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন দিয়েছিল, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা দিয়েছিল।
- অন্যদিকে, সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল এবং নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো দিয়েছিল।
- ভারত ছিল বাংলাদেশের প্রধান মিত্র, যারা সরাসরি সাহায্য ও আশ্রয় দিয়ে যুদ্ধের ফল নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা

- নীতিগতভাবে বিরোধিতা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নীতি ছিল পাকিস্তানপন্থি, এবং তারা এই অঞ্চলের ক্ষমতা কাঠামো ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে চেয়েছিল।
- সামরিক সমর্থন: তারা পাকিস্তানকে অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা দিয়েছিল, যা তাদের নীতি ও স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। যেমনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো সপ্তম নৌবহর
- জনমত ও কংগ্রেসের প্রভাব: মার্কিন সরকার পাকিস্তানের অবস্থানে থাকলেও, কংগ্রেসের সদস্য, সরকারি আমলা ও সাধারণ মানুষ বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। যেমনঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশকে সাহায্য

করার জন্য বিটলস খ্যাত জর্জ হ্যারিসন এবং পণ্ডিত রবি শংকর আয়োজন করেছিলেন 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'। জ্যা পল সাত্রসহ বহু বুদ্ধিজীবী দার্শনিক বাংলাদেশের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন

- গণমাধ্যমের ভূমিকা: মার্কিন গণমাধ্যম ও জনমত বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে।
- কৌশলগত স্বার্থ ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের সম্পর্ক বদলে যাওয়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক ও ভূ অর্থনৈতিক স্বার্থে প্রভাব ফেলেছিল।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকা

- সামরিক ও আর্থিক সহায়তা: সোভিয়েত ইউনিয়ন সরাসরিভাবে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সামরিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।
- ভারতকে সমর্থন: সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পরোক্ষ সমর্থন দিয়েছিল, যা ছিল আমেরিকা ও চীনের বিপরীত অবস্থান।
- রাজনৈতিক সমর্থন: তারা গণহত্যার তীব্র নিন্দা জানায় এবং যুদ্ধ বন্ধের জন্য পাকিস্তানকে আহ্বান জানায়।
- ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ: নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে বাধাগ্রস্ত করার চেষ্টা প্রতিহত করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
- গণহত্যার নিন্দা
- আন্তর্জাতিক সমর্থন

চীনের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে চীনের ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ বিরোধী ও নেতিবাচক।

- পাকিস্তানকে সমর্থন: চীন বাংলাদেশকে স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থন করেনি, বরং পাকিস্তানকে সমর্থন দিয়েছিল এবং তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দিতে সামরিক বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়েছিল।
- পাকিস্তানকে সর্বাঙ্গিক সহায়তা: চীন পাকিস্তানকে সমরাস্ত্র, গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে এবং জাতিসংঘে তাদের পক্ষ সমর্থন করে।
- রাজনৈতিক বিরোধিতা: তাদের এই নীতি ছিল পূর্ব ও পশ্চিমের ভূ রাজনৈতিক মেরুকরণের অংশ।
- জাতিসংঘে ভেটো ০৯: ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ যখন জাতিসংঘের সদস্যপদের জন্য আবেদন করে, তখন চীন এর বিরোধিতা করে ভেটো প্রদান করে।
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারত একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছে।

ভারতের ভূমিকা

- ভারত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে আশ্রয় দিয়েছে, মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সহায়তা করেছে। এছাড়াও, ভারত বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করেছে।
- বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠন করে ১৯৭১ সালের চূড়ান্ত যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে, যা বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশে সহায়তা করে।
- মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর ৩ টি পর্যায় ছিল যথা-

ভারতীয় নীতির ১ম পর্যায় (এপ্রিল-জুলাই)

- > সীমান্ত উন্মুক্তকরণ ও এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় ও সহায়তা।
- > মে মাসে ভারতের গোয়েন্দা সংস্থা 'Research And Analysis Wing (RAW)' কর্তৃক 'মুজিব বাহিনী' গঠন, প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ
- > প্রবাসী সরকার গঠন ও স্বাধীন বাংলা বেতার স্থাপনে সহায়তা।

> মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার ভারত সফর করে, মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সহযোগিতা প্রত্যাহারের অনুরোধ করলে, ইন্দিরা গান্ধী তা প্রত্যাখান করেন।

ভারতীয় নীতির ২য় পর্যায় (আগস্ট- নভেম্বর)

> মার্কিন ও চীন এর সাথে পাকিস্তান সমঝোতায় পৌঁছালে, শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী সেপ্টেম্বর এ সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। মস্কো- দিল্লী চুক্তির আওতায় সোভিয়েত ভারত কে সহায়তার আশ্বাস দেয়।

> ২৩ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান ১০ দিনের মধ্যে যুদ্ধ শুরুর ঘোষণা দলে, ভারতের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য হয়।

ভারতীয় নীতির ৩য় পর্যায় (৩ ১৬ ডিসেম্বর)

> মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ৪ ১৬ ডিসেম্বর পাক ভারত যুদ্ধ শুরু হয়।

> ৬ ডিসেম্বর ভারত বাংলাদেশ কে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেয়।

> যৌথ বাহিনী গঠন ও স্থল, নৌ ও বিমান পথে যুদ্ধ শুরু ও প্রতিটি ক্ষেত্রে পাক কাহিনীর পরাজয়।

> ১৫ ডিসেম্বর ভারতীয় মিত্র বাহিনী ও বাঙ্গালি মুক্তিবাহিনীর সম্মিলিতভাবে ঢাকা প্রবেশ।

► ১৬ ডিসেম্বর পাক অধিনায়ক নিয়াজি ৯৩ হাজার সৈন্য নিয়ে যৌথ বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে।

যুক্তরাজ্যের ভূমিকা

> যুক্তরাজ্যও এই যুদ্ধে পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল, যদিও তাদের ভূমিকা যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মতো সরাসরি ছিল না।

> বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা ছিল মূলত নৈতিক সমর্থন ও তথ্য প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন।

> ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের সমর্থন, ব্রিটিশ গণমাধ্যম (বিশেষ করে বিবিসি) কর্তৃক গণহত্যার চিত্র তুলে ধরা, এবং শরণার্থীদের জন্য সাহায্য পাঠানোর মাধ্যমে যুক্তরাজ্য পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকে সমর্থন করে।

> সরাসরি সামরিক বা আর্থিক সহায়তা না দিয়ে তারা একটি নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রেখেছিল, যদিও তাদের মূলধারার নীতি পাকিস্তানের পক্ষে ছিল।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy)

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মূলত 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়' এই নীতির উপর ভিত্তি করে গঠিত, যা দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ও আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠায় কাজ করে।
- স্বাধীনতার পর থেকে এই নীতি জোট নিরপেক্ষতার ওপর জোর দেয়।
- সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতিকে সমর্থন করে।

সংবিধান ও পররাষ্ট্রনীতি

- বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন সমর্থন, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতার বিরোধিতা, বর্ণবাদ ও সকল প্রকার বৈষম্যের বিলোপ এবং জনগণের মধ্যে বন্ধুত্ব, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে"।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্য

- 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয় (Friendship to all and malice to none)'

- জোট নিরপেক্ষতা: Non-Aligned Movement (NAM)-১৯৬১ সাবেক যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড জন্ম হয়। বর্তমান সদস্য ১২১। স্থায়ী সদর দপ্তর নেই।
- স্বাধীন ও নিরপেক্ষ
- সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী
- মুসলিম বিশ্বের সাথে সখ্যতা
- জাতীয় স্বার্থ রক্ষা
- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা
- অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য
- উন্নয়নের নীতি
- সমমর্যাদা ও সম-সার্বভৌমত্ব নীতিতে বিশ্বাসী
- আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নিরাপত্তার নীতি

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নির্ধারকসমূহ হলো এর সাংবিধানিক স্তম্ভসমূহ। যার মধ্যে রয়েছে ভৌগোলিক অবস্থান।
- ভূ-রাজনৈতিক পরিবেশ
- ভূ অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিত
- জনমত
- রাজনৈতিক নেতৃত্ব
- আঞ্চলিক পরিবেশ
- বিশ্ব রাজনীতি
- জাতীয় সার্বভৌমত্ব ও সমতার প্রতি শ্রদ্ধা
- বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান
- শক্তি প্রয়োগ পরিহার
- নিরস্ত্রীকরণ প্রচেষ্টা
- নিজস্ব আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা
- আন্তর্জাতিক শান্তি ও সংহতি উন্নয়ন
- জাতীয় স্বার্থ রক্ষা
- অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা
- শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাস

বাংলাদেশ ও অর্থনৈতিক কূটনীতি

- অর্থনৈতিক কূটনীতি (Economic Diplomacy) হলো একটি দেশের জাতীয় অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য অর্থনৈতিক সরঞ্জাম, যেমন চুক্তি, বিনিয়োগ, বাণিজ্য, সাহায্য, এবং মুক্ত বাণিজ্য ব্যবহার করে অন্য দেশের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও বজায় রাখা।
- বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কূটনীতি বলতে বোঝায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ, যেমন বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বিনিময়ের মাধ্যমে জাতীয় লাভ অর্জনের জন্য কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করা।
- এটি একটি দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক সরঞ্জাম ব্যবহার করার একটি প্রক্রিয়া।

অর্থনৈতিক কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য

- অর্থনৈতিক স্বার্থ রক্ষা ও বৃদ্ধি: বৈদেশিক বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক বিনিময়ের মাধ্যমে জাতীয় লাভ সর্বাধিক করা।
- বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য অর্জন: নির্দিষ্ট বৈদেশিক নীতি অর্জনের জন্য অর্থনৈতিক সম্পদ ব্যবহার করা।
- আন্তর্জাতিক নীতিতে ভূমিকা: অর্থনৈতিক কূটনীতি একটি দেশের আন্তর্জাতিক নীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এর প্রধান অর্থনৈতিক শাসন ও দৈনন্দিন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

অর্থনৈতিক কূটনীতি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সরকারি কৌশলসমূহ

- বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ:
- রপ্তানি বৃদ্ধি ও বহুমুখীকরণ:
- নতুন বাজার সৃষ্টি:
- অর্থনৈতিক সহায়তা ও ঋণ:
- মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি:
- নীতিগত অবস্থান ও বাস্তবায়ন:
- সমন্বিত ও 'সমগ্র সরকার' ভিত্তিক কৌশল:
- দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা: 'ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' এর মতো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে অর্থনৈতিক কূটনীতিকে ব্যবহার করা, যা ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গঠনে সহায়তা করবে।
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক: UN, WTO, WEF, IMF, World Bank

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির রাজনৈতিক ভিত্তি

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূল রাজনৈতিক ভিত্তি হলো "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়" মূলনীতি, যা জাতীয় শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চায়।
- বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগের ২৫ নং অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যকে পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
- এর মধ্যে রয়েছে জাতীয় সমতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, শক্তি প্রয়োগ পরিহার করা এবং বিশ্ব শান্তি ও নিরস্ত্রীকরণে প্রয়াস চালানো, আন্তর্জাতিক আইন ও সনদের প্রতি শ্রদ্ধা।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির অর্থনৈতিক ভিত্তি

- বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক ভিত্তি বলতে বোঝায় অর্থনৈতিক কূটনীতি (Economic Diplomacy) ও অর্থনৈতিক স্বার্থ (Economic Interests) রক্ষার মাধ্যমে জাতীয় সমৃদ্ধি অর্জন করাকে।
- বাণিজ্য, বিনিয়োগ, ও অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধির জন্য অন্যান্য দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন, নতুন বাজার খোঁজা, প্রভাবশালী দেশগুলোর সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।
- সংবিধানে 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে শত্রুতা নয়' নীতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়, যা দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

অর্থনৈতিক ভিত্তির মূল দিকগুলো

- অর্থনৈতিক কূটনীতি:

- নতুন বাজার অনুসন্ধান:
- প্রভাবশালী দেশগুলোর সাথে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক:
- আঞ্চলিক সহযোগিতা:
- জাতীয় স্বার্থ রক্ষা:

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রণয়নের প্রক্রিয়া

১. সাংবিধানিক নির্দেশনা: বাংলাদেশের সংবিধানের ২৫ নং অনুচ্ছেদে আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতি উন্নয়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, যা পররাষ্ট্রনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

২. জাতীয় স্বার্থ রক্ষা: পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য হলো দেশের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। এর মধ্যে রয়েছে:

- সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তা:
- অর্থনৈতিক উন্নয়ন:
- ভূ-খণ্ডিত বিরোধ:

৩. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়: বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (Ministry of Foreign Affairs) সংবিধানের নির্দেশ অনুযায়ী এবং জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে।

৪. মৌলিক নীতি: বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন অনুসরণ করে এবং "সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারও সাথে বৈরিতা নয়" নীতি মেনে চলে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকে।

৫. কূটনৈতিক সম্পর্ক: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণ করে এবং জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৬. কৌশলগত পরিবর্তন: জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে কৌশলগত পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নিজের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ এবং তার দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশী রাষ্ট্র

- বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ
- উত্তর অক্ষাংশ: ২০°৩৪' থেকে ২৬°৩৮' উত্তর
- পূর্ব দ্রাঘিমাংশ: ৮৮°০১' থেকে ৯২°৪১' পূর্ব
- উত্তর: পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম
- পূর্বে: ভারত (ত্রিপুরা, মিজোরাম), মিয়ানমার
- পশ্চিমে: ভারত (পশ্চিমবঙ্গ)
- দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর
- সীমান্তরেখার দৈর্ঘ্য:
- ভারতের সাথে: ৪১৫৬ বা ৩৭১৫ কিমি (বিশ্বে ৫ম দীর্ঘতম দ্বিপাক্ষিক সীমান্ত)
- মিয়ানমারের সাথে: ২৭১, ২৮০ কিমি
- সমুদ্র উপকূলরেখা: ৭১১ বা ৭১৬ কিমি
- মোট সীমারেখা: ৫১৩৮ কিলোমিটার
- স্থল সীমারেখা: ৪৪২৭ কিলোমিটার

ভৌগোলিক গুরুত্ব:

- দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত।

- ভারত, চীন, মিয়ানমার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগস্থল।
- বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে প্রবেশদ্বার।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

ভারত ও বাংলাদেশ দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্র যাদের সম্পর্ক ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভাষা ও রাজনৈতিক ঘটনাবলির মাধ্যমে গভীরভাবে জড়িত।

- ১৯৭১ স্বাধীনতা ও সূচনাঃ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের ভূমিকা
- ১৯৭২-১৯৭৫- মুজিব-ইন্দিরা যুগ
- ১৯৭২: বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি (২৫ বছর মেয়াদি)
- ১৯৭৪: ইন্দিরা-মুজিব সীমান্ত চুক্তি
- ১৯৭৫-১৯৯০ রাজনৈতিক পরিবর্তন ও টানা পোড়েন: ১৯৭৫: বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সামরিক শাসন ভারত-বিরোধী রাজনীতি প্রবল হয়
- সীমান্ত উত্তেজনা ও অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের অভিযোগ
- ১৯৯১-২০০৪- গণতন্ত্র, কিছু অগ্রগতি
- ১৯৯৬: গঙ্গা পানি বন্টন চুক্তি (৩০ বছর মেয়াদি)
- তিস্তা পানি চুক্তি আলোচনা হলেও চূড়ান্ত হয়নি
- ২০০৯-২০২৪ সম্পর্কের নতুন দিগন্ত
- শেখ হাসিনা সরকারের ভারতপন্থী নীতি
- ২০১৫: ছিটমহল বিনিময় চুক্তির বাস্তবায়ন (১১১টি ভারতীয় ও ৫১টি বাংলাদেশি ছিটমহল)
- রেল, সড়ক, নৌপথে সংযোগ বৃদ্ধি (মৈত্রী এক্সপ্রেস, আখাউড়া-আগরতলা রেল, ইত্যাদি)
- বর্তমান সম্পর্ক

বাংলাদেশে নতুন সরকার হওয়ার পর ভারতের প্রতি কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে বিশেষত ভারত যে দীর্ঘদিন যাবৎ শেখ হাসিনার সরকারের সঙ্গে কাজ করে এসেছে, সেই নীতি এখন পরিবর্তনের মুখে। কিছু ঘটনা, যেমন ভারতের মেডিকেল ভিসা ইস্যু, ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অবস্থান, সংখ্যালঘুদের বিষয় ইত্যাদিতে উত্তেজনা বাড়েছে। এখনও বাণিজ্য ও অবকাঠামো, সংযোগ বজায় রাখতে উৎস রয়েছে। ভারতের বিদেশ সচিব বাংলাদেশের interim সরকারের সঙ্গে কাজ করার দৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশের নতুন সরকারের কাছে চীন একটি বিকল্প হয়ে উঠে, বিশেষ করে ভারত বাংলাদেশ সম্পর্ক হয়তো কিছুটা স্নান হওয়ার কারণে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের বিদ্যমান সমস্যা (২০২৪-২০২৫)

- তিস্তা নদীর পানি বন্টন সমস্যা
- সীমান্ত হত্যা ও গুলির ঘটনা
- NRC (National Register of Citizens); CAA (Citizenship Amendment Act) ও অবৈধ
- অভিবাসী ইস্যু
- বাণিজ্য ভারসাম্যহীনতা (Trade Imbalance)
- পণ্য রপ্তানি ও আমদানিতে অনিশ্চয়তা
- ট্রানজিট ইস্যু ও আঞ্চলিক ভারসাম্য
- চীনের প্রভাব ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা
- সংখ্যালঘু ও মানবাধিকার ইস্যু
- সীমান্ত চিহ্নিতকরণ ও অনুপ্রবেশ সমস্যা

- গণমাধ্যমে নেতিবাচক প্রচারণা ও ভুল বোঝাবুঝি

বাংলাদেশ-মিয়ানমার সম্পর্ক

- ভৌগোলিক সম্পর্ক: মিয়ানমার বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত প্রতিবেশী দেশ
- স্থলসীমান্ত: প্রায় ২৭১ কিলোমিটার
- সীমান্ত নদী: নাফ নদী
- বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা: কক্সবাজার (টেকনাফ), বান্দরবান

মিয়ানমারের পূর্ব নাম ছিল বর্মা বা বার্মা। ১৯৮৯ সালে দেশটির নাম পরিবর্তন করে মিয়ানমার

দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক:

- কূটনৈতিক সম্পর্ক শুরু: ১৯৭২ সালে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৩ জানুয়ারি, ১৯৭২
- বাংলাদেশের দূতাবাস: ইয়াঙ্গুনে
মিয়ানমারের দূতাবাস: ঢাকার বারিধারায়
- সম্পর্ক বর্তমানে উত্তেজনাপূর্ণ (রোহিঙ্গা ইস্যু কেন্দ্র করে)

রোহিঙ্গা সংকট:

- প্রথম ঢল: ১৯৭৮ সালে
- বড় আকারে আগমন: ২০১৭ সালের আগস্ট

বর্তমান সংখ্যা (২০২৫ পর্যন্ত): প্রায় ১১ লাখ রোহিঙ্গা (বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির, কক্সবাজারে)। জাতিসংঘ একে "জাতিগত নিধন (Ethnic Cleansing)" বলে আখ্যায়িত করেছে

বাংলাদেশ চায়: স্বেচ্ছা, নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসন

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট:

- গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার মামলা: চলছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) ICC ও OIC মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত করছে
- চীন ও রাশিয়া মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে

বাণিজ্যিক সম্পর্ক:

- বাংলাদেশ মিয়ানমার: ওষুধ, খাদ্য, পোশাক
- মিয়ানমার বাংলাদেশ: মাছ, ডাল, কাঠ
- সীমান্ত বাণিজ্য পয়েন্ট: টেকনাফ মংডু
- সঠিক প্রস্তুতি, সহজ প্রিলি
- ফেরি সার্ভিস ও সীমান্ত হাট স্থগিত (রোহিঙ্গা সংকটে)

দ্বিপাক্ষিক সমস্যা:

- রোহিঙ্গা সংকট
- সীমান্তে গোলাবর্ষণ
- মাদক পাচার (বিশেষ করে ইয়াবা)
- সেনা উপস্থিতি ও সীমান্ত উত্তেজনা

বাংলাদেশ-নেপাল সম্পর্ক

- ভৌগোলিক সম্পর্ক: বাংলাদেশ ও নেপালের সরাসরি সীমান্ত নেই,, দুই দেশ ভারতের মাধ্যমে সংযুক্ত

- বাংলাদেশ থেকে নেপালের নিকটতম সীমান্ত: পঞ্চগড় (বাংলাদেশ) জোগবনি (নেপাল)
- সড়কপথ ও ট্রানজিট: ভারতের সিলিগুড়ি করিডোর দিয়ে

কূটনৈতিক সম্পর্ক:

- সম্পর্ক স্থাপন: ১৯৭২ সালে। ১৯৭২ সালের ১৬ই জানুয়ারি বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
- বাংলাদেশে নেপালের দূতাবাস: ঢাকা
- নেপালে বাংলাদেশের দূতাবাস: কাঠমান্ডু
- সম্পর্ক: বন্ধুত্বপূর্ণ, বাণিজ্য ও সহযোগিতামূলক

বাণিজ্যিক সম্পর্ক:

- বাংলাদেশ নেপাল রপ্তানি: ওষুধ, তৈরি পোশাক, খাদ্যপণ্য
- নেপাল বাংলাদেশ আমদানি: পশমজাত পণ্য, ফলমূল, হস্তশিল্প
- বিশেষ চুক্তি: Preferential Trade Agreement (PTA)
- ট্রানজিট চুক্তি: ভারত হয়ে পণ্য পরিবহন

জ্বালানি ও বিদ্যুৎ:

নেপাল চায় জলবিদ্যুৎ রপ্তানি। বাংলাদেশ ৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা করেছে। ভারত এই ট্রানজিটের অনুমতি দিয়েছে

শিক্ষা ও সংস্কৃতি:

- বাংলাদেশে অনেক নেপালি শিক্ষার্থী পড়াশোনা করে (বিশেষত মেডিকেল)
- কূটনৈতিক পাসপোর্টধারীদের জন্য ভিসামুক্ত ভ্রমণ সুবিধা
- সংস্কৃতি বিনিময় চুক্তি রয়েছে

আঞ্চলিক সহযোগিতা:

- উভয় দেশ নিম্নোক্ত সংস্থার সদস্য: SAARC, BIMSTEC, BBIN (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal), SASEC(South Asia Sub-regional Economic Cooperation)

পরিবহন ও বন্দর ব্যবহার:

- বাংলাদেশ দিয়েছে মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অনুমতি
- নেপালের পণ্য পরিবহন হয় ভারত হয়ে
- প্রস্তাবিত রুট:
নেপাল >ভারত> বাংলাবান্ধা (বাংলাদেশ) >মোংলা/চট্টগ্রাম বন্দর

বাংলাদেশ-ভুটান সম্পর্ক

- স্বাধীনতা ও স্বীকৃতি: ভুটান ছিল প্রথম দেশ যারা ১৯৭১ সালে ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। ভারত একই দিনে স্বীকৃতি দিলেও, ভুটান কিছুক্ষণ আগে দেয় তাই ঐতিহাসিকভাবে প্রথম স্বীকৃতিদাতা দেশ ভুটান।

কূটনৈতিক সম্পর্ক:

- কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়: ১২ এপ্রিল, ১৯৭৩।

- বাংলাদেশে ভুটানের দূতাবাস রয়েছে: বারিধারা, ঢাকা।
- ভুটানে বাংলাদেশের দূতাবাস রয়েছে:

বাণিজ্যিক সম্পর্ক:

২০২০ সালে বাংলাদেশ ও ভুটান একটি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (Preferential Trade Agreement - PTA) স্বাক্ষর করে এটি বাংলাদেশের প্রথম PTA চুক্তি অনুসারে:

- বাংলাদেশ ভুটানের ১০০টি পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়।
- ভুটান বাংলাদেশকে ৩৪টি পণ্যে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেয়।
- ভুটান থেকে বাংলাদেশে আমদানি হয়: পাথর, বোল্ডার, ডলোমাইট, ফলমূল, মিনারেল ওয়াটার
- বাংলাদেশ থেকে ভুটানে রপ্তানি হয়:

ওষুধ, পোশাক, প্লাস্টিক সামগ্রী, খাদ্যপণ্য

- **পরিবহন ও ট্রানজিট:** বাংলাদেশ চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর ভুটানকে ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে।

জলবিদ্যুৎ খাত: ভারত হয়ে ভুটানের পণ্য বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ থেকে ভুটানে যাতায়াত করে। ভুটান জলবিদ্যুৎ সমৃদ্ধ দেশ। বাংলাদেশ ভুটান থেকে জলবিদ্যুৎ আমদানি করতে চায় এটি ত্রিপাক্ষিক উদ্যোগে (বাংলাদেশ-ভুটান-ভারত) বাস্তবায়িত হতে পারে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা:

বাংলাদেশ ও ভুটান উভয়েই SAARC, BIMSTEC, BBIN এর সদস্য।

BBIN (Bangladesh-Bhutan-India-Nepal) Motor Vehicle Agreement-এর মাধ্যমে আন্তঃদেশীয় যাতায়াত সহজীকরণ প্রক্রিয়াধীন, যদিও ভুটান এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করেনি।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য:

- ভুটানি শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজে পড়াশোনা করে।
- ভুটানি নাগরিকরা বাংলাদেশে চিকিৎসা গ্রহণ করে।

উল্লেখযোগ্য দিবস:

৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ-ভুটান মৈত্রী দিবস হিসেবে পালিত হয়।

বাংলাদেশ-মালদ্বীপ সম্পর্ক

কূটনৈতিক সম্পর্ক: বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়: ১৯৭৮ সালে।

- উভয় দেশেরই রাজধানীতে দূতাবাস রয়েছে:
- শ্রম ও অভিবাসন: বাংলাদেশি কর্মীরা মূলত কাজ করেন: নির্মাণ খাত, হোটেল ও পর্যটন খাত, চিকিৎসা ও শিক্ষকতা পেশায় বাংলাদেশি চিকিৎসক ও শিক্ষকরা মালদ্বীপে জনপ্রিয় এবং প্রভাবশালী। মালদ্বীপের অনেক শিক্ষার্থী বাংলাদেশের মেডিকেল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে।

বাণিজ্যিক সম্পর্ক:

বাংলাদেশ থেকে মালদ্বীপে প্রধান রপ্তানি পণ্য: খাদ্যপণ্য (বিশেষ করে চাল, ডাল, সবজি), ওষুধ, পোশাক মালদ্বীপ থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি খুবই সীমিত।

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা:

উভয় দেশ SAARC, OIC, BIMSTEC, এবং UN-এর সদস্য।

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা সম্পর্ক

কূটনৈতিক সম্পর্ক:

- বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়: ১৯৭২ সালে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরপরই।

বাণিজ্যিক সম্পর্ক:

- বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি রয়েছে।
- বাংলাদেশ থেকে শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি হয়: ওষুধ, তৈরি পোশাক (RMG), প্লাস্টিক পণ্য, সিরামিক
- শ্রীলঙ্কা থেকে বাংলাদেশে আমদানি হয়: চা, সুতা, নারিকেলজাত পণ্য, কসমেটিকস

শ্রম ও অভিবাসন:

বাংলাদেশি কিছু শ্রমিক ও পেশাজীবী (ডাক্তার, প্রকৌশলী) শ্রীলঙ্কায় কাজ করেন। শ্রীলঙ্কার কিছু নাগরিকও বাংলাদেশে শিক্ষা ও ব্যবসার কারণে অবস্থান করেন।

ঋণ ও সাহায্য:

২০২১ সালে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কাকে ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মুদ্রা বিনিময় (currency swap) এর মাধ্যমে সাহায্য করে। এটি বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মুদ্রা ঋণ প্রদান।

সম্ভাবনাময় খাত:

পর্যটন, বাণিজ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও নৌ পরিবহন খাতে দুই দেশের মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক

- **ইতিহাসভিত্তিক সম্পর্ক:** ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিল পাকিস্তানের অংশ (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান)। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বাধীনতার মাধ্যমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের আলাদা রাষ্ট্রীয় পরিচয় শুরু হয়। পাকিস্তান প্রথম দিকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।
- **কূটনৈতিক সম্পর্ক:** ১৯৭৬ সালে দুই দেশের মধ্যে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।
- **বাণিজ্য সম্পর্ক:** বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানে রপ্তানি: তৈরি পোশাক, ওষুধ, পাট ও পাটজাত পণ্য।
- পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশে আমদানি: কাগজ, কসমেটিকস, কেমিক্যাল, কনস্ট্রাকশন ম্যাটেরিয়াল

জনগণের অভিমত ও ভিসা:

দুই দেশের নাগরিকদের মধ্যে সরাসরি যাতায়াত সীমিত, ভিসা প্রক্রিয়া কঠিন। পর্যটন বা ব্যবসার জন্য সীমিত সংখ্যক ভিসা দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক

- **কূটনৈতিক সম্পর্ক:** যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়: ৪ এপ্রিল, ১৯৭২
- উভয় দেশের রাজধানীতে দূতাবাস রয়েছে:
 - ঢাকায়: যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস (US Embassy)
 - ওয়াশিংটনে: বাংলাদেশ দূতাবাস

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বৃহৎ অংশীদার

- সবচেয়ে বড় রপ্তানি গন্তব্য (বিশেষ করে পোশাক/গার্মেন্টস পণ্য)
- দাতা দেশ (USAID-এর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন সহায়তা)
- শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে সহায়তাকারী

বাণিজ্যিক সম্পর্ক:

- বাংলাদেশ থেকে আমেরিকায় রপ্তানি: গার্মেন্টস, পাটজাত পণ্য, ওষুধ, আইটি সার্ভিস
- আমেরিকা থেকে বাংলাদেশে আমদানি: কটন, সোয়াবিন, মেশিনারি, বিমান খুচরা যন্ত্রাংশ

শ্রম ও অভিবাসন:

যুক্তরাষ্ট্রে বহু বাংলাদেশি স্থায়ীভাবে বসবাস করেন (প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি)

আমেরিকায় বহু বাংলাদেশি শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেন (Fulbright, Humphrey স্কলারশিপ ইত্যাদি)

বাংলাদেশ- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক

- উচ্চপর্যায়ের সফর ও রাজনৈতিক যোগাযোগ: বিভিন্ন সময়ে দুই দেশের রাষ্ট্রপতি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, বা প্রতিনিধিদল সফর করেছেন।
- "US-Bangladesh Partnership Dialogue" নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়।

বিতর্ক ও টানা পোড়েন: নির্বাচন, মানবাধিকার, শ্রম অধিকার, এবং গণতন্ত্র নিয়ে মাঝে মাঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদ্বেগ প্রকাশ করে।

- ২০২১-২২ সালে মার্কিন ভিসা নিষেধাজ্ঞা ও র‍্যাংক কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আলোচিত হয়।

প্রতিরক্ষা সহযোগিতা:

সামরিক প্রশিক্ষণ ও সরঞ্জাম বিনিময়, যৌথ মহড়া, কোস্টগার্ড সহযোগিতা ইত্যাদি রয়েছে।

বাংলাদেশ- সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া) সম্পর্ক

- স্বাধীনতার পর সম্পর্ক স্থাপন: সোভিয়েত ইউনিয়ন (USSR) বাংলাদেশকে ২৫ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বীকৃতি দেয়। এটি ছিল বাংলাদেশের অন্যতম প্রথম স্বীকৃতিদাতা "বিশ্বশক্তি" (superpower) দেশ।
- বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন (১৯৭১): সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশ ও ভারতের পক্ষে নেয়। পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেওয়া চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ঠেকাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে চুক্তি করে (Indo-Soviet Treaty, 1971)।
- জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বীকৃতিতে চীন ভেটো দিলে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কৌশলগত সহায়তা দেয়।

চট্টগ্রাম বন্দরের মাইন অপসারণ: ১৯৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের পর চট্টগ্রাম বন্দরে মাইন অপসারণ করে সোভিয়েত নৌবাহিনী।

- এটি ছিল বন্ধুত্বের অন্যতম বড় প্রতীক।

বর্তমান রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক:

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক অব্যাহত থাকে।

রাশিয়া বর্তমানে বাংলাদেশের:

- পারমাণবিক শক্তি সহযোগী (রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র)
- অস্ত্র সরবরাহকারী
- শিক্ষা, প্রযুক্তি ও বাণিজ্যিক অংশীদার

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: এটি বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নির্মাণ করছে রাশিয়ান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান Rosatom

অবস্থান: ঈশ্বরদী, পাবনা

শুরু হয়: ২০১৭

প্রধান অর্থায়ন ও প্রযুক্তি: রাশিয়া

বাণিজ্য সম্পর্ক:

- বাংলাদেশ রাশিয়াতে রপ্তানি করে: পোশাক, ওষুধ, চামড়াজাত পণ্য
- রাশিয়া থেকে বাংলাদেশে আমদানি হয়: গম, সার, বিদ্যুৎ যন্ত্রপাতি, অস্ত্র ও প্রযুক্তি

বাংলাদেশ- যুক্তরাজ্য সম্পর্ক

- ঐতিহাসিক পটভূমি: ভারতীয় উপমহাদেশে ২০০ বছরের ব্রিটিশ উপনিবেশের অংশ ছিল বর্তমান বাংলাদেশ। ব্রিটিশ আমল শেষে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের অংশ হয়ে যায় এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীন হয়।
- যুক্তরাজ্য ৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।
- ব্রিটিশ সংসদে প্রথম বাংলাদেশ নিয়ে জোরালো অবস্থান নেন নির্মল সেন ও পিটার শোর।

কূটনৈতিক সম্পর্ক:

- ১৯৭২ সাল থেকে পূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক চালু হয়।
- ঢাকায় রয়েছে যুক্তরাজ্যের হাইকমিশন, এবং লন্ডনে বাংলাদেশ হাইকমিশন।

বাণিজ্যিক সম্পর্ক:

- যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ রপ্তানির গন্তব্য (বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতে)।
- বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি: গার্মেন্টস, চামড়াজাত পণ্য, কৃষিপণ্য, হস্তশিল্প
- UK থেকে আমদানি: মেশিনারি, কেমিক্যাল, ওষুধ, প্রযুক্তি পণ্য

প্রবাসী বাংলাদেশি ও রেমিট্যান্স:

- যুক্তরাজ্যে প্রায় ৬ লাখের বেশি বাংলাদেশি প্রবাসী রয়েছেন, যাদের বেশিরভাগই সিলেট অঞ্চল থেকে। তারা রেমিট্যান্স প্রেরণ ও ব্যবসায়িক উদ্যোগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছেন। ব্রিটেনে বহু বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

উন্নয়ন সহযোগিতা:

যুক্তরাজ্যের Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) এবং British Council বাংলাদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও জলবায়ু প্রকল্পে সহায়তা করে।

শিক্ষা ক্ষেত্রে

Chevening Scholarship জনপ্রিয়।

রাজনৈতিক সম্পর্ক ও উচ্চ পর্যায়ের সফর:

ব্রিটেনের রাজপরিবারের সদস্যসহ উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশ সফর করেছেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ব্রিটেনে কমনওয়েলথ সম্মেলনসহ বিভিন্ন সফরে অংশ নিয়েছেন।

কমনওয়েলথ সদস্যপদ:

বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্য উভয়েই Commonwealth of Nations এর সদস্য।

বাংলাদেশ- চীন সম্পর্ক

কূটনৈতিক সম্পর্ক:

- চীন প্রথমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নেয়নি।
- তবে পরে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে ৪ অক্টোবর ১৯৭৫ সালে, বঙ্গবন্ধু হত্যার পর।
- বর্তমানে চীন ঢাকায় এবং বাংলাদেশ বেইজিংয়ে দূতাবাস পরিচালনা করছে।

বাণিজ্যিক সম্পর্ক:

- চীন বাংলাদেশের বৃহত্তম আমদানি উৎস (China is Bangladesh's largest import source).
- বাংলাদেশ চীন থেকে আমদানি করে: মেশিনারি, ইলেকট্রনিক পণ্য, বস্ত্র, রাসায়নিক, নির্মাণ উপকরণ
- বাংলাদেশ চীনে রপ্তানি করে: পাটজাত পণ্য, গার্মেন্টস, চামড়া, সামান্য পরিমাণ ওষুধ
- ২০২০ সালে চীন বাংলাদেশের ৯৭% পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেয়।

অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন:

চীন বাংলাদেশের অবকাঠামো খাতে অনেক বিনিয়োগ করেছে:

- পদ্মা সেতু (চীনা প্রতিষ্ঠান: China Major Bridge Engineering Company)
- কর্ণফুলী টানেল
- পাওয়ার প্ল্যান্ট, রেললাইন, এক্সপ্রেসওয়ে, বিমানবন্দর উন্নয়ন
- চীন বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) এর অধীনে বাংলাদেশে কাজ করছে।

সামরিক সম্পর্ক:

- চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ।
- নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী ও সেনাবাহিনীতে চীনা প্রযুক্তির অস্ত্র ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষা ও সংস্কৃতি:

- চীন বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তি ও উচ্চশিক্ষা সুযোগ দেয়।
- কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে চীনা ভাষা শিক্ষা চালু রয়েছে।

COVID-19 মহামারির সময় সহায়তা:

- চীন বাংলাদেশকে Sinopharm টিকা উপহার ও বিক্রি করে।
- PPE, মাস্ক, মেডিকেল যন্ত্রপাতি সহায়তা পাঠায়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সহযোগিতা:

- রোহিঙ্গা ইস্যুতে চীন আংশিকভাবে মিয়ানমারের পক্ষে অবস্থান নেয়।
- জাতিসংঘে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে বাংলাদেশকে পুরোপুরি সমর্থন দেয়নি।

বাংলাদেশ ও মুসলিম সম্পর্ক

ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংযোগ:

- বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর প্রায় ৯০% মুসলিম, ফলে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে ধর্মীয় সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

- বাংলাদেশ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্য, যেমন:
 - OIC (Organization of Islamic Cooperation)
 - IDB (Islamic Development Bank)
 - D-8 (Developing Eight Islamic Countries)

OIC (অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন):

- বাংলাদেশ OIC-এর সদস্য হয় ১৯৭৪ সালে।
- ঢাকায় ১৯৮৩ সালে OIC পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
- OIC রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নেয়।

IDB (Islamic Development Bank):

- বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।
- অবকাঠামো, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য ও শিল্পক্ষেত্রে সহায়তা করে।

D-8 (Developing Eight):

- ৮টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক সংগঠন।
- সদস্য: বাংলাদেশ, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, মালয়েশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক।
- বাংলাদেশের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নেওয়া হয়।

রেমিট্যান্স ও শ্রম বাজার:

- সৌদি আরব, কাতার, ওমান, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত (UAE) এগুলো বাংলাদেশের প্রধান শ্রমবাজার।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি রেমিট্যান্স আসে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো থেকে।

হজ ব্যবস্থাপনা:

- প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে প্রায় ১ লাখের বেশি মুসল্লি হজ করতে সৌদি আরব যান।
- সৌদি সরকারের সঙ্গে হজ ব্যবস্থাপনা ও চুক্তি রয়েছে।

শিক্ষা ও ধর্মীয় স্কলারশিপ:

- সৌদি আরব, মিশর, মালয়েশিয়া ইত্যাদি মুসলিম দেশ থেকে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা ধর্মীয় ও উচ্চশিক্ষার স্কলারশিপ পান।

বাংলাদেশ ও জাতিসংঘ

জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদ: স্বাধীনতার পর জাতিসংঘে যোগদান: ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৪। এর আগে চীন কয়েকবার ভেটো দিয়ে সদস্যপদ আটকে রেখেছিল।

বাংলাদেশ ও শান্তিরক্ষা মিশন (UN Peacekeeping): বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম বৃহৎ শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ।

বর্তমানে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী কাজ করছে।

সেনাবাহিনী, পুলিশ ও চিকিৎসা কর্মী অংশগ্রহণ করে।

জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থায় সদস্যপদ ও কার্যক্রম:

বাংলাদেশ জাতিসংঘের অনেক সংস্থার সদস্য এবং অংশগ্রহণকারী, যেমন: UNDP (United Nations Development Programme)

UNICEF (Children's Fund)

UNESCO (Education, Science & Culture)

WHO (World Health Organization)

FAO, ILO, UNHCR ইত্যাদি

রোহিঙ্গা ইস্যুতে জাতিসংঘের ভূমিকা:

- জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা (বিশেষত UNHCR, UNDP) রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সহায়তা করছে।
- জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলে (UNHRC) বাংলাদেশ সরকারের পক্ষেও বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও বাংলাদেশ:

- জাতিসংঘ ঘোষিত ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অগ্রগামী দেশগুলোর একটি।
- ভিশন ২০৪১ এবং Delta Plan 2100-এসডিজি বাস্তবায়নের অংশ।

বাংলাদেশি কূটনীতিকদের ভূমিকা:

- ড. আবদুল মোমেন, জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন।
- ড. মুহম্মদ ইউনূস জাতিসংঘের SDG ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রচেষ্টায় নোবেল বিজয়ী হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আন্তর্জাতিক রাজনীতি

দক্ষিণ এশিয়া (South Asia)

- অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ: ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, মালদ্বীপ
- (আফগানিস্তানকে অনেক সময় দক্ষিণ এশিয়ার অংশ হিসেবে ধরা হয়)

আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য

- ভারত-পাকিস্তান দ্বন্দ্ব: কাশ্মীর ইস্যু
- পরমাণু প্রতিযোগিতা; ক্রমাগত সামরিক উত্তেজনা
- ভারতের আঞ্চলিক নেতৃত্ব: SAARC BIMSTEC-এর নেতৃত্ব, "Neighborhood First" ও "Act East" নীতি
- চীন-ভারত সম্পর্ক: সীমান্ত বিরোধ (লাদাখ, ডোকলাম), বেস্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (BRI) বনাম ভারতের প্রতিক্রিয়া
- আফগানিস্তান ইস্যু ও নিরাপত্তা: তালেবান শাসন, সন্ত্রাসবাদ এবং উদ্বাস্তু সমস্যা
- বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক: পানি বণ্টন (তিস্তা), সীমান্ত, বাণিজ্য ও জ্বালানি সহযোগিতা

আন্তর্জাতিক শক্তির প্রভাব

- চীন: BRI, বিনিয়োগ, সামরিক আধিপত্য
- যুক্তরাষ্ট্র: ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল, কৌশলগত জোট (QUAD)
- রাশিয়া: অস্ত্র বিক্রি ও নিরাপত্তা সহযোগিতা
- জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউরোপীয় ইউনিয়ন: অর্থনৈতিক সহযোগিতা

দক্ষিণ এশিয়া: ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট

- অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহ: ১০ টি দেশ
মালয়শিয়া; থাইল্যান্ড; ভিয়েনাম; ফিলিপাইন; ইন্দোনেশিয়া; লাওস; মায়ানমার; ব্রুনাই; কম্বুডিয়া; সিঙ্গাপুর

আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রধান ইস্যুসমূহ

- দক্ষিণ চীন সাগর বিরোধ: চীনের "Nine-Dash Line" দাবী, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়ার বিরোধ
- চীনের প্রভাব: বন্দর, রাস্তা, অবকাঠামো নির্মাণে BRI বিনিয়োগ
- ASEAN-এর ভূমিকা: আঞ্চলিক সহযোগিতা, কিন্তু চীনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ অবস্থান দুর্বল
- যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ: ইন্দো প্যাসিফিক কৌশল, চীন প্রতিরোধে সামরিক জোট
- মিয়ানমার সংকট: সামরিক অভ্যুত্থান (২০২১), গণতন্ত্র আন্দোলন, রোহিঙ্গা ইস্যু
- সম্ভাব্য দাবি: ফিলিপাইন (আবু সায়াফ), ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে ইসলামি জঙ্গিবাদ

গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:

- ASEAN প্রতিষ্ঠিত: ১৯৬৭, সদর দফতর: জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া
- UNCLOS রায়: ২০১৬ সালে আন্তর্জাতিক আদালত চীনের দাবী খারিজ করে
- AUKUS গঠিত: ২০২১ (অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য চীন প্রতিরোধে। সাবমেরিন প্রযুক্তি শেয়ার ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় নিরাপত্তা জোট)
- QUAD(Quadrilateral Security Dialogue) গঠিত: ২০০৭, পুনরুজ্জীবন: ২০১৭ (ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, অস্ট্রেলিয়া)। চীনের মোকাবিলায় নিরাপত্তা সংলাপ।
- BRI (Belt & Road Initiative): চীনের বৈশ্বিক অবকাঠামো প্রকল্প, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার
- IMEC (India-Middle East-Europe Corridor): BRI-র বিকল্প রূপে ভারতের নতুন ভূরাজনৈতিক কৌশল

চলমান কিছু গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু (২০২৫ পর্যন্ত)

- QUAD বনাম BRI প্রতিযোগিতা
- ভারত-মধ্যপ্রাচ্য-ইউরোপ করিডোর (IMEC)
- মিয়ানমার সংকটে ASEAN-এর ভূমিকা
- দক্ষিণ চীন সাগরে সামরিক উত্তেজনা
- বাংলাদেশে নির্বাচন পরবর্তী রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পরিস্থিতি
- ইইউ (EU) উন্নয়ন সহায়তা ও মানবাধিকার ইস্যুতে সক্রিয়
- জাপান ও কোরিয়া অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ
- রাশিয়া: অস্ত্র রপ্তানি, ভারতের সাথে ঐতিহাসিক সম্পর্ক

SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation)

- দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (South Asian Association for Regional Cooperation)

- একটি আঞ্চলিক আন্তঃসরকারি সংস্থা
- প্রতিষ্ঠা ও সদর দফতর: SAARC প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৫ সালের ৮ ডিসেম্বর, বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়।
- প্রতিষ্ঠার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন বাংলাদেশের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- সার্কের সদর দফর অবস্থিত নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুতে।
- সদস্য দেশ: মোট সদস্য সংখ্যা ৮টি। এগুলো হলো: বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, মালদ্বীপ এবং আফগানিস্তান। আফগানিস্তান সর্বশেষ ২০০৭ সালে সদস্য হিসেবে যোগ দেয়।

সার্কের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- SAARC-এর মূল লক্ষ্য হলো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা,
- দারিদ্র্য দূরীকরণ, টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা
- একটি স্থিতিশীল ও শান্তিপূর্ণ আঞ্চলিক পরিবেশ গড়ে তোলা
- সংস্থাটি অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, পরিবেশ, প্রযুক্তি, নারী উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রে যৌথ কর্মসূচি গ্রহণ করে থাকে।

সার্কের প্রধান কার্যক্রম

- SAARC-এর শীর্ষ স্তরে রয়েছে রাষ্ট্রপ্রধানদের সম্মেলন, যা সাধারণত দুই বছর অন্তর অনুষ্ঠিত হয়।
- পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় "Council of Ministers", এবং সচিব পর্যায়ের বৈঠক হয় "Standing Committee" নামে।

আসিয়ান (ASEAN)

- ASEAN (Association of South East Asian Nations) হলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১০টি দেশের একটি আঞ্চলিক সংস্থা, যা পারস্পরিক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে।
- প্রতিষ্ঠা: প্রতিষ্ঠার তারিখ: ৮ আগস্ট ১৯৬৭
- প্রতিষ্ঠার স্থান: ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
- প্রতিষ্ঠাতা দেশ: ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড (৫টি)
- বর্তমান সদস্য সংখ্যা: ১০টি দেশ, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, মিয়ানমার, ব্রুনাই দারুসসালাম
- সদর দপ্তর: জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শান্তি, স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি নিশ্চিত করা
- মুক্ত বাণিজ্য ও বিনিয়োগ উন্নয়ন
- সদস্য দেশগুলোর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা
- সংস্কৃতি, শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে যৌথ উদ্যোগ

গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

- ASEAN Free Trade Area (AFTA): মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল
- ASEAN Summit: রাষ্ট্রপ্রধানদের বৈঠক, বছরে ২ বার হয়
- ASEAN Regional Forum (ARF): নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক আলোচনা
- RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership): বৃহৎ আঞ্চলিক বাণিজ্য চুক্তি, যার নেতৃত্বে আছে আসিয়ান।

আসিয়ান-এর চ্যালেঞ্জ

- সদস্য দেশগুলোর অর্থনৈতিক বৈষম্য
- অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংকট (বিশেষ করে মিয়ানমার)
- দক্ষিণ চীন সাগর বিরোধ (চীন বনাম ফিলিপাইন ভিয়েতনাম ইত্যাদি)
- যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার শক্তির দ্বন্দ্ব আসিয়ান দেশগুলোর অবস্থান কঠিন হয়ে উঠছে

Lecture: 10

টপিক:

বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান

- বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ
- উত্তর অক্ষাংশ: ২০°৩৪' থেকে ২৬°৩৮' উত্তর
- পূর্ব দ্রাঘিমাংশ: ৮৮°০১' থেকে ৯২°৪১' পূর্ব
- বাংলাদেশের মাঝ দিয়ে গেছে কর্কটক্রান্তি রেখা ২৩.৫ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশে অবস্থিত।
- উত্তর: পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয়, আসাম
- পূর্বে: ভারত (ত্রিপুরা, মিজোরাম), মিয়ানমার
- পশ্চিমে: ভারত (পশ্চিমবঙ্গ)
- দক্ষিণে: বঙ্গোপসাগর
- সীমান্তরেখার দৈর্ঘ্য:
 - ভারতের সাথে: ৪১৫৬ বা ৩৭১৫ কিমি (বিশ্বে ৫ম দীর্ঘতম দ্বিপাক্ষিক সীমান্ত)
 - মিয়ানমারের সাথে: ২৭১, ২৮০ কিমি
 - সমুদ্র উপকূলরেখা: ৭১১ বা ৭১৬ কিমি
 - মোট সীমারেখা: ৫১৩৮ কিলোমিটার
 - স্থল সীমারেখা: ৪৪২৭ কিলোমিটার
- ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব:
 - দক্ষিণ এশিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত।
 - ভারত, চীন, মিয়ানমার ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সংযোগস্থল।
 - বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে প্রবেশদ্বার।
 - বাংলাদেশের মাঝ দিয়ে ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করেছে।

□ বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থার ইতিহাস: প্রাচীন থেকে আধুনিক কাল

1. প্রাচীন সমাজব্যবস্থা (খ্রিস্টপূর্ব যুগ – ৮ম শতাব্দী)

➤ বৈশিষ্ট্য:

- গ্রামভিত্তিক সমাজ: কৃষি ছিল প্রধান পেশা।
- গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনধারা: পরিবার এবং বংশ ছিল সমাজের মূল ভিত্তি।
- ধর্মীয় ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস শুরু হয় (হিন্দু ধর্মে চার বর্ণ)।
- নারীরা তুলনামূলকভাবে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ছিল আদিম সমাজে।

- **শাসনব্যবস্থা:**
 - প্রাক-মৌর্য ও মৌর্য যুগে ক্ষুদ্র রাজ্য ও গোষ্ঠীগত শাসন।
 - পাল ও সেন যুগে হিন্দু ধর্ম ও বর্ণব্যবস্থা প্রভাব বিস্তার করে।
- 2. **মধ্যযুগের সমাজব্যবস্থা (৮ম- ১৮শ শতাব্দী)**
 - **বৈশিষ্ট্য:**
 - মুসলিম শাসনের সূচনা (১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক)।
 - হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সহাবস্থান গড়ে ওঠে।
 - জমিদারি ব্যবস্থা প্রবর্তন হয় সমাজে ধনী জমিদার ও দরিদ্র প্রজা বিভাজন প্রকট হয়।
 - নারীর অবস্থান: সীমিত অধিকার, পর্দা প্রথা জোরদার হয় মুসলিম শাসনে।
 - **শিক্ষা ও ধর্ম:**
 - মাদ্রাসা, পাঠশালা, ও মজব চালু হয়।
 - সুফি-সন্তদের প্রভাবে সমাজে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তৈরি হয়।
- 3. **ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা (১৭৫৭ - ১৯৪৭)**
 - **বৈশিষ্ট্য:**
 - ব্রিটিশরা জমিদারি প্রথা কয়েম করে (স্থায়ী বন্দোবস্ত, ১৭৯৩)। এতে কৃষক শোষিত হয়, জমিদার শ্রেণির উত্থান ঘটে।
 - শিক্ষা ও প্রশাসনে ইউরোপীয় ধারা আসে; ইংরেজি শিক্ষা প্রসার লাভ করে।
 - শ্রেণিভিত্তিক সমাজ (জমিদার, মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিক) আরও শক্তিশালী হয়।
 - **নারীর অবস্থান:**
 - নারী শিক্ষার সূচনা হলেও সুযোগ সীমিত ছিল।
 - কিছু মুসলিম নারী (বেগম রোকেয়া প্রমুখ) শিক্ষার অগ্রদূত হন।
- 4. **পাকিস্তান আমলের সমাজব্যবস্থা (১৯৪৭- ১৯৭১)**
 - **বৈশিষ্ট্য:**
 - পূর্ব বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বঞ্চনা বাড়তে থাকে।
 - ধনী-গরিব ব্যবধান বৃদ্ধি পায়।
 - আধুনিক শিক্ষা ও শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থান ঘটে।
 - **শিক্ষা ও সংস্কৃতি:**
 - ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ সমাজকে জাগ্রত করে।
 - নারী শিক্ষায় অগ্রগতি শুরু হয়।
- 5. **স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজব্যবস্থা (১৯৭১- বর্তমান)**
 - **বৈশিষ্ট্য:**
 - সংবিধানে সাম্য, মানবাধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা ঘোষিত হয়।
 - গ্রামীণ ও শহুরে সমাজের মধ্যে বৈষম্য এখনো বিদ্যমান।
 - নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে।
 - **আধুনিক সমাজের রূপ:**
 - প্রযুক্তির ব্যবহার বেড়েছে (স্মার্টফোন, ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়া)।
 - নারীর ক্ষমতায়ন হয়েছে (শিক্ষা, রাজনীতি, চাকরি)।
 - যৌথ পরিবার কমে গিয়ে একক পরিবার বাড়ছে।
 - গ্রামীণ উন্নয়ন ও মাইক্রোক্রেডিট আন্দোলন (বিশেষ করে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক) সমাজে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রেখেছে।

সমাজব্যবস্থার পর্যায়ক্রমিক তুলনামূলক চিত্র

সময়কাল	মূল বৈশিষ্ট্য	শ্রেণি বিভাজন	নারী ভূমিকা
প্রাচীন যুগ	কৃষিনির্ভর, গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ	বর্ণভিত্তিক	তুলনামূলক স্বাধীনতা
মধ্যযুগ	ধর্মভিত্তিক শাসন, জমিদারি সূচনা	জমিদার-প্রজা	ধর্মের প্রভাবে সীমিত
ঔপনিবেশিক যুগ	ইউরোপীয় প্রভাব, শিক্ষা বিস্তার	জমিদার-মধ্যবিত্ত-কৃষক	শিক্ষায় অগ্রগতি শুরু
পাকিস্তান আমল	বঞ্চনা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ উত্তর	ধনী-দরিদ্র	শিক্ষা ও জাগরণ
স্বাধীন বাংলাদেশ	উন্নয়ন, প্রযুক্তি, নারীর অগ্রগতি	নতুন মধ্যবিত্ত, শহর-গ্রাম	নেতৃত্বে অংশগ্রহণ

□ প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশের সংস্কৃতি

1. প্রাচীন বাংলার সংস্কৃতি (খ্রিস্টপূর্ব - ৮ম শতাব্দী)

> বৈশিষ্ট্য:

- সংস্কৃতি ছিল প্রকৃতি ও ধর্মনির্ভর।
- মূলত লোকায়ত ধারা, কৃষিভিত্তিক জীবন, ঋতু ও প্রকৃতিনির্ভর উৎসব (নবান্ন, বসন্ত উৎসব)।
- ধর্ম হিসেবে হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভাব ছিল বেশি।

> গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- পৌরাণিক কাহিনি ও রামায়ণ-মহাভারত মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে।
- পালি ভাষার সাহিত্য ও বৌদ্ধ ধর্মের রূপকথা ও গাথা জনপ্রিয় ছিল।

2. মধ্যযুগের সংস্কৃতি (৮ম - ১৭শ শতাব্দী)

> বৈশিষ্ট্য:

- মুসলিম শাসনের প্রভাবে ইসলামি সংস্কৃতির আগমন।
- বাংলার লোক সংস্কৃতির সঙ্গে ইসলামি আদর্শের মেলবন্ধন ঘটে।

> সংস্কৃতির ধারা:

- সুফি-সন্তদের প্রভাব ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও মরমী সংগীতের উদ্ভব (লালন, হাছন রাজা)।
- বাংলা সাহিত্যের উত্থান: মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, ধর্মীয় গীতিকা।
- পোশাক: ধুতি, শাড়ি, ফেজ্জটুপি, সালায়ার-কামিজ প্রচলিত হয়।

3. ঔপনিবেশিক যুগের সংস্কৃতি (১৭৫৭ - ১৯৪৭)

- > বৈশিষ্ট্য:
 - ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, পাশ্চাত্য সাহিত্য ও শিল্পের আগমন।
 - বাংলা নবজাগরণ শুরু হয়- যা সংস্কৃতির দিক থেকে একটি বিপ্লব।
- > উল্লেখযোগ্য অবদান:
 - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, মাইকেল মধুসূদন দত্ত- সাহিত্য, সংগীত ও নাটকে নতুন ধারা এনেছেন।
 - থিয়েটার, প্রিন্ট মিডিয়া, পত্রিকা ও নাট্যচর্চা শুরু হয়।
 - লোকসাহিত্য ও লোকসংগীত এর পুনরুজ্জীবন ঘটে।
- 4. পাকিস্তান আমলের সংস্কৃতি (১৯৪৭ – ১৯৭১)
 - > বৈশিষ্ট্য:
 - সংস্কৃতির উপর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ চাপানো হয়।
 - উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক জাগরণ তৈরি করে।
 - > সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ:
 - একুশে ফেব্রুয়ারি ও ভাষা শহীদদের স্মরণে সাহিত্য ও সংগীতের উত্থান।
 - নজরুল সংগীত ও রবীন্দ্র সংগীত নিষিদ্ধ হলেও গোপনে চর্চা চলতে থাকে।
 - এ সময়েই সুফিয়া কামাল, জসীমউদ্দীন, সেলিম আল দীন প্রমুখ বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সমাজে নেতৃত্ব দেন।
- 5. স্বাধীন বাংলাদেশের সংস্কৃতি (১৯৭১- বর্তমান)
 - > বৈশিষ্ট্য:
 - জাতীয় সংস্কৃতি হিসেবে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, পোশাক, লোকঐতিহ্য, উৎসবকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।
 - বিজয় দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, একুশে বইমেলা, নববর্ষ, একুশে পদক জাতীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠেছে।
- 6. আধুনিক সময়ের ধারা:
 - টেলিভিশন, সিনেমা, থিয়েটার, ইউটিউব, ফেসবুক- সাংস্কৃতিক বহুমুখিতা তৈরি করেছে।
 - লোকজ সংস্কৃতি যেমন পালাগান, বাউল গান, জারি-সারি ইত্যাদি শহুরে সমাজেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।
- > চ্যালেঞ্জ:
 - পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, কনজিউমারিজম (ভোগবাদ)
 - লোকজ সংস্কৃতির অবমূল্যায়ন
 - সামাজিক মিডিয়ায় অপসংস্কৃতির ছড়িয়ে পড়া

পর্যায়ক্রমিক সাংস্কৃতিক ধারা: তুলনামূলক চিত্র

সময়কাল	সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য	ভাষা-সাহিত্য	সংগীত ও শিল্প
প্রাচীন যুগ	প্রকৃতিনির্ভর, ধর্মমিশ্রিত	পালি, সংস্কৃত	বৈদিক, লোকগীতি

মধ্যযুগ	ইসলামি ও লোকজ মিলনধারা	মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি	মরমী, সুফি সংগীত
ঔপনিবেশিক যুগ	পাশ্চাত্য প্রভাব, নবজাগরণ	বাংলা সাহিত্য রেনেসাঁস	ক্লাসিকাল + লোকগীত
পাকিস্তান আমল	সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ও প্রতিরোধ	ভাষা আন্দোলনের সাহিত্য	প্রতিবাদী গান, নজরুলগীতি
স্বাধীন বাংলাদেশ	জাতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির মিশ্রণ	মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক সাহিত্য	লোকসঙ্গীত, ব্যান্ড, থিয়েটার, সিনেমা

গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহ

উপাদান	উদাহরণ
ভাষা	বাংলা (জাতীয় ভাষা), আঞ্চলিক উপভাষা
সংগীত	রবীন্দ্র সংগীত, নজরুলগীতি, বাউল গান ইত্যাদি
পোশাক	শাড়ি, পাঞ্জাবি, ফতুয়া, লুঙ্গি
উৎসব	পহেলা বৈশাখ, একুশে ফেব্রুয়ারি, ঈদ, দুর্গাপূজা
লোকসংস্কৃতি	পালাগান, জারি-সারি, কবিগান
শিল্পকলা	নকশিকাঁথা, পটচিত্র, মৃৎশিল্প

□ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস

- বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস একটি দীর্ঘ ও বৈচিত্র্যময় ধারাবাহিকতা, যা প্রাচীন সভ্যতা থেকে শুরু করে আজকের আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত।
- এই ইতিহাস বিভিন্ন শাসক, সামাজিক পরিবর্তন, ঔপনিবেশবাদ, আন্দোলন এবং গণতন্ত্রের উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে।

1. প্রাচীন যুগ (খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতক খ্রিস্টীয় ১২শ শতক)

➤ মৌর্য ও গুপ্ত শাসন (খ্রিস্টপূর্ব ৩২১ খ্রিস্টীয় ৬৫০):

- মৌর্য সাম্রাজ্যের (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, অশোক) অধীনে বাংলার কিছু অঞ্চল

শাসিত হতো।

- গুপ্ত সাম্রাজ্যে (৩২০-৫৫০ খ্রিঃ) বাংলা ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই সময়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।
- **শশাঙ্ক** ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন শাসক। **গৌড় রাজ্য** প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমান মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ)।

➤ স্বাধীন রাজ্য ও পাল-সেন শাসন (৭৫০- ১২০০ খ্রিঃ):

- **পাল রাজবংশ** (গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল) বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। বৃহৎ বাংলার অধিকাংশ অংশ তাদের অধীনে ছিল।
- **সেন রাজবংশ** (বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন) হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সেনদের সময় মুসলিম শাসনের আগমন শুরু হয়।
- লক্ষ্মণ সেন ছিলেন সেন বংশের শেষ রাজা।

2. মধ্যযুগ: মুসলিম শাসন (১২০৪ - ১৭৫৭)

➤ দিল্লি সালতানাত ও বাংলার স্বাধীনতা (১২০৪ - ১৩৫২):

- ১২০৪ সালে ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজি নদীয়া (নবদ্বীপ) জয় করে বাংলা অঞ্চলে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। শাসক ছিলেন লক্ষ্মণ সেন।
- শুরুতে দিল্লি সালতানাতের অধীনে থাকলেও পরে স্বাধীন সুলতানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

➤ বাংলার স্বাধীন সুলতানী শাসন (১৩৫২- ১৫৭৬):

- বাংলার নিজস্ব সুলতানরা (যেমন গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ, আলাউদ্দিন হুসাইন শাহ) শাসন করেন।
- ঢাকাকে (জাহাঙ্গীরনগর) রাজধানী করা হয়।

➤ মুঘল শাসন (১৫৭৬ - ১৭৫৭):

- মুঘল সম্রাট আকবর বাংলাকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে এ মুঘল সাম্রাজ্যের অংশ করেন।
- সুবেদার শায়েস্তা খাঁর আমলে উন্নয়ন ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল।
- বাংলার শাসককে বলা হতো **সুবাদার**।
- ঢাকা মুঘল আমলে জাহাঙ্গীরনগর নামে পরিচিত ছিল।
- ১৬১০ সালে ইসলাম খান ঢাকাকে রাজধানী করেন।
- বারো ভূঁইয়া (Baro Bhuiya) নামে পরিচিত স্থানীয় জমিদাররা মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিলেন ঈসা খান।

উপনিবেশিক শাসন: ব্রিটিশ আমল (১৭৫৭ - ১৯৪৭)

➤ পলাশীর যুদ্ধ ও ইংরেজ শাসনের সূচনা (২৩ জুন ১৭৫৭):

- নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ষড়যন্ত্র করে বিজয়ী হয়।
- এর মাধ্যমে বাংলা তথা পুরো উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সূচনা।

➤ ব্রিটিশ শাসনে বাংলা:

- ১৭৭২ সালে কলকাতা থেকে বাংলা শাসন শুরু করে ইংরেজরা।
- ইংরেজদের শাসন ছিল শোষণমূলক, ফলে একাধিক কৃষক বিদ্রোহ ও সামাজিক আন্দোলন শুরু হয়:
 - ✓ নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯-৬০); প্রধান নেতা: কৃষ্ণসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়
 - ✓ ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৮১৩-১৮২০)

- ✓ তিতুমীরের বিদ্রোহ: নেতা: তিতুমীর (আসল নাম: সৈয়দ মীর নিসার আলী) তিনি "বাঁশের কেন্দ্রা" নির্মাণ করেন। তিতুমীর শহীদ হন ১৮৩১।
- ✓ এটি ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রথম সুসংগঠিত সশস্ত্র মুসলিম বিদ্রোহ।

➤ **বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধিকার আন্দোলন:**

❖ **বঙ্গভঙ্গ**

- বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) এর মাধ্যমে ইংরেজরা হিন্দু-মুসলমানদের বিভক্ত করার চেষ্টা করে, যার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ হয়।
- ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর, ব্রিটিশ ভারতের ভাইসরয় লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন।
- বঙ্গভঙ্গ বলতে বোঝায়, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাংলা প্রদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করার একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।
- ১) পূর্ব বাংলা ও আসাম- রাজধানী ঢাকা- মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ
- ২) পশ্চিম বাংলা- কলকাতা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ

➤ **বঙ্গভঙ্গের কারণ**

- প্রশাসনিক কারণ
- রাজনৈতিক কারণ
- সামাজিক কারণ
- Divide and Rule

➤ **বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া ও রদ**

- হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে।
- স্বরাজ ও বয়কট আন্দোলন শুরু হয়:
 - বিদেশি পণ্য বর্জন
 - দেশি শিল্প গড়ে তোলা
 - স্বদেশি আন্দোলন গড়ে ওঠে।
- মুসলমানদের মধ্যে আলিগড় আন্দোলন এবং পরে মুসলিম লীগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠা পায়।
- ১৯১১ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ দিল্লিতে ভারতের রাজধানী স্থানান্তরের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ বাতিল করেন।

➤ **১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো সংস্কার আইন:**

- মুসলিমদের জন্য পৃথক নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রবর্তন।

➤ **১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি (Lucknow Pact, 1916):**

- এই চুক্তি হয়েছিল:
 - ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (INC) এবং
 - মুসলিম লীগ-এর মধ্যে।
- যদিও এটি এক ঐতিহাসিক ঐক্য ছিল, কিন্তু কিছুদিন পরই (খিলাফত আন্দোলনের পর) হিন্দু-মুসলিম ঐক্যে চির ধরে যায়।
- ভবিষ্যতে ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব ও ১৯৪৭ সালের দেশভাগ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিভাজনের সূচনা এখান থেকেই শুরু হয় বলে অনেকে মনে করেন।

➤ **১৯১৯ সালের আইন- Government of India Act, 1919 (মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার):**

- প্রাদেশিক শাসনে দ্বৈত শাসন চালু করা হয়।

➤ **১৯২৩ সালের বেঙ্গল প্যাক্ট (Bengal Pact, 1923):**

- চিত্তরঞ্জন দাস (C.R. Das) – তৎকালীন স্বরাজ দলের নেতা এবং কলকাতার মেয়র
- হিন্দু ও মুসলিম নেতৃত্বের মধ্যে সমঝোতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন।

- **১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act, 1935):**
 - প্রতিটি প্রদেশে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা।
 - কেন্দ্রের দ্বৈত শাসন চালু করা হয়।
 - ভারতীয়দের জন্য স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হলেও, পূর্ণ স্বাধীনতা নয়।
 - ভাইসরয় ও ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা বজায় থাকে।
- **দ্বি-জাতি তত্ত্বের ধারণা:**
 - ১৯৩৯ সালে মুসলিম লীগ নেতা মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই তত্ত্বের ধারণা প্রকাশ করেন।
 - ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে এর সুস্পষ্ট রূপরেখা তুলে ধরেন।
- **লাহোর প্রস্তাব:**
 - ১৯৪০ সালের ২৩ মার্চে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে এই প্রস্তাবটি পেশ করেন এ কে ফজলুল হক।
 - এই প্রস্তাবের ফলেই পরবর্তীকালে ‘ভারত স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭’ পাশ হয় এবং ভারত বিভাজনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়।
- **১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন (Indian Independence Act, 1947):**
 - দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষে ব্রিটিশ সরকার ভারতের স্বাধীনতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।
 - ১৯৪৬ সালে ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়।
 - ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন পাশ করা হয়।
 - 14 আগস্ট 1947: পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি।
 - 15 আগস্ট 1947: ভারতের স্বাধীনতা।
- **লর্ড লুইস মাউন্টব্যাটেন:**
 - ভারতের শেষ ভাইসরয় এবং স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল (15 আগস্ট 1947 – 21 জুন 1948)।
 - তিনিই ভারত বিভাগের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেন।
 - পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল ছিলেন মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

❖ **পাকিস্তান পর্ব (১৯৪৭ – ১৯৭১)**

পাকিস্তান রাষ্ট্রের স্বরূপ (১৯৪৭-১৯৭১)

- **দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠন (১৯৪৭):**
 - পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের (মুসলমান ও হিন্দু আলাদা জাতি) ভিত্তিতে।
 - দুটি ভৌগোলিক অংশ:
 - ✓ পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ)
 - ✓ পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান)
 - দুই অংশের মধ্যে ছিল ১২০০ মাইল দূরত্ব ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা।
- **ইসলামিক রাষ্ট্রব্যবস্থা:**
 - রাষ্ট্রের মূল চেতনা ছিল: ধর্মের ভিত্তিতে জাতীয়তা।
 - সংবিধানে ইসলামকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্র পরিচালনার কথা বলা হয়।
 - কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে মূলত বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির সংখ্যা বেশি থাকায় এ ধারণা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে।
- **সামরিকতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী শাসন:**
 - ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করেন।
 - গণতন্ত্র হরণ, মত প্রকাশের অধিকার সীমিত।

- পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী ও আমলারা রাষ্ট্র চালাত।
- **কেন্দ্রীয়তাবাদ ও একক শাসনব্যবস্থা:**
 - ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত ছিল ইসলামাবাদে।
 - পূর্ব পাকিস্তান ছিল প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে উপেক্ষিত।
 - এটি বাঙালিদের রাজনৈতিক বঞ্চনা ও আন্দোলনের জন্ম দেয়।
- **সাংস্কৃতিক বৈষম্য:**
 - বাংলা ভাষার বিরুদ্ধাচরণ।
 - বাঙালি সংস্কৃতি, গান, সাহিত্যকে অবজ্ঞা করা হতো।
 - ফলাফল: ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন।
- **অর্থনৈতিক শোষণ:**
 - পূর্ব পাকিস্তান ছিল মূল পাট উৎপাদক।
 - অথচ রাজস্বের ৮০% যেত পশ্চিম পাকিস্তানে।
 - পূর্বাংশে ছিল না শিল্প, অবকাঠামো বা কর্মসংস্থানের উন্নয়ন।
- **গণতন্ত্র ও জনগণের অধিকার হরণ:**
 - ১৯৫৬, ১৯৬২ সালে সংবিধান প্রণয়ন হলেও প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়নি।
 - জনগণের ভোটাধিকার বারবার খর্ব করা হয়।
 - ১৯৭০ সালের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা দিতে অস্বীকৃতি।
- **বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও স্বাধীনতা আন্দোলন:**
 - বাঙালিরা বুঝে যায়: ধর্ম নয়, ভাষা-সংস্কৃতি-অধিকারই প্রকৃত জাতীয় পরিচয়।
 - ৬ দফা দাবি (১৯৬৬), গণ-অভ্যুত্থান (১৯৬৯), এবং স্বাধীনতার যুদ্ধ (১৯৭১) এর সূত্রপাত।

❖ ভাষা আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৫৬)

ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

- ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান সৃষ্টি হয়— দুইটি অংশ নিয়ে:
 - পূর্ব পাকিস্তান (বাংলা ভাষাভাষী)
 - পশ্চিম পাকিস্তান (উর্দু ও অন্যান্য ভাষাভাষী)
- পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের শুরু থেকেই ভাষা নিয়ে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়।
- ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ কর্তৃক উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব দেন।
- ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ অধ্যাপক আবুল কাশেমের নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট ‘তমদ্দুন মজলিস’ ভাষা আন্দোলনের গোড়াপত্তন করে।
- ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল মনসুর আহমদ ও আবুল কাশেমের তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে প্রকাশ পায় ‘পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু’।
- ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত – পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বাংলা ভাষার পক্ষে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন (১৯৪৮ সালে)।
- পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে ঘোষণা দেয়, উর্দুই হবে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।

ভাষা আন্দোলনের কারণ

- পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা ভাষাভাষীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫৬%, তবুও উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়া হয়।
- বাঙালি সংস্কৃতিকে দমন করার প্রচেষ্টা।
- রাজনৈতিক দমননীতি ও পশ্চিম পাকিস্তানের আধিপত্য।
- সরকারি চাকরি, শিক্ষা, আদালত, ও প্রশাসনে উর্দুর এককচেটিয়া ব্যবহার পরিকল্পনা।

➤ ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

সাল	ঘটনা
১৯৪৭	পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা
১৯৪৮ (২১শে মার্চ)	মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকায় এক জনসভায় বলেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"
১৯৪৮ (১১ মার্চ)	প্রথম রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ
১৯৫২ (২৬শে জানুয়ারি)	পাকিস্তানের ততকালীন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঘোষণা করেন, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"
১৯৫২ (৩১শে জানুয়ারি)	জনসভায় রাজনৈতিক দলের সদস্যদের নিয়ে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কার্যকরী পরিষদ' গঠিত হয়।
১৯৫২ (২১ ফেব্রুয়ারি)	৮ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার - ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের মিছিল ও গুলি চালনা - শহীদ দিবস
১৯৫২ (২১-২৩ ফেব্রুয়ারি)	ঢাকায় রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার সহ অনেকে শহীদ হন
১৯৫২ (২৩ ফেব্রুয়ারি)	শহীদ মিনার নির্মাণ শুরু। নকশা করেন হামিদুর রহমান।
১৯৫২ (২৪ ফেব্রুয়ারি)	উদ্বোধন করেন শহীদ শফিউর রহমানের পিতা মাহফুজুর রহমান
১৯৫৬	বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায় (পাকিস্তান সংবিধানে)

➤ শহীদের নাম ও পরিচিতি

শহীদের নাম	পরিচিতি	শহীদ এর তারিখ
রফিক উদ্দিন	প্রিন্টিং প্রেসে পিতার কাজে করতেন। প্রথম শহীদ	২১ ফেব্রুয়ারি
আব্দুস সালাম	ঢাকা হাইকোর্টে পিওন হিসেবে কর্মরত ছিলেন	২১ ফেব্রুয়ারি
আবুল বরকত	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের মাস্টার্সের ছাত্র	২১ ফেব্রুয়ারি
জব্বার	শ্রমিক। পেশায় দরজি ছিলেন	২১ ফেব্রুয়ারি
শফিউর	স্কুলছাত্র। ঢাকা হাইকোর্টের একজন কর্মচারী ছিলেন।	২২ ফেব্রুয়ারি
অহিদুলজামান/অহিউল্লাহ	ভাষা শহীদ (শিশু)। বয়স: প্রায় ৮-৯ বছর। তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ত।	২২ ফেব্রুয়ারি

ফলাফল ও গুরুত্ব

- বাংলা ভাষা ১৯৫৬ সালের ৮ জানুয়ারী পাকিস্তান সংবিধানে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পায়।
- জন্ম নেয় বাঙালি জাতীয়তাবাদ।
- ভবিষ্যৎের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি রচিত হয়।
- ২১ ফেব্রুয়ারি পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে (UNESCO স্বীকৃতি: ১৯৯৯)।

> আওয়ামী মুসলিম লীগ

- > মুসলিম লীগের একচেটিয়া রাজনীতির বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।
- > পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার অধিকার আদায়ের লক্ষ্য ছিল।
- > প্রতিষ্ঠা: ২৩ জুন ১৯৪৯
- > স্থান: ঢাকার রোজ গার্ডেন (বর্তমান টিকাটুলী)
- > প্রথম নাম: পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ
- > ১৯৫৫ সালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলের নাম রাখা হয় শুধু "আওয়ামী লীগ"।
- > প্রতিষ্ঠাতা নেতারা:
 - মওলানা ভাসানী - সভাপতি
 - শামসুল হক - সাধারণ সম্পাদক

❖ ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন

পটভূমি (Background):

- > পাকিস্তান সৃষ্টির পর কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা
- > ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)
- > মুসলিম লীগের দুর্নীতি ও ব্যর্থতা
- > বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান
- > যুক্তফ্রন্ট গঠন (১৯৫৩)

যুক্তফ্রন্ট

- > যুক্তফ্রন্ট ছিল ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনের জন্য পূর্ব বাংলার (বর্তমান বাংলাদেশ) বিভিন্ন বিরোধী রাজনৈতিক দলের গঠিত একটি জোট বা ঐক্যফ্রন্ট।
- > এটি গঠিত হয়েছিল মুসলিম লীগ সরকারের একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে।
- > গঠন সাল: ৪ ডিসেম্বর ১৯৫৩।
- > প্রধান দলসমূহ (৪টি):
 - আওয়ামী লীগ (মওলানা ভাসানী)
 - কৃষক শ্রমিক পার্টি (এ কে ফজলুল হক)
 - নেজামে ইসলাম
 - গণতন্ত্রী দল।

> প্রতীক ও কর্মসূচি:

- > নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা। কর্মসূচি ছিল ২১টা।
- > মূল কর্মসূচি:
 - বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি (১)

- জমিদারি প্রথা ও খাজনা আদায়কারী মধ্যস্থত্ব উচ্ছেদকরে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উক্ত জমি বন্টনের ব্যবস্থা (২)
- অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা (৯)
- শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করা (১৫)
- শহীদ মিনার নির্মাণ (১৭)
- একুশে ফেব্রুয়ারীকে শহীদ দিবস ও সরকারি ছুটির দিন হিসেবে পালন (১৮)
- আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, পূর্ব বাংলায় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর, আনসার কে 'মিলিশিয়া' হিসেবে গড়ে তোলা (১৯)

➤ **মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:**

- মুসলিম লীগ শাসনের অবসান
- গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা
- বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি
- কৃষি ও শ্রমিকের উন্নয়ন
- দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গঠন
- প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা

➤ **১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ফলাফল**

আসনের সংখ্যা ও প্রকৃতি	দল/জোট	প্রাপ্ত আসন
মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ২৩৭ টি	যুক্তফ্রন্ট	২২৩টি
	মুসলিম লীগ	৯টি
	স্বতন্ত্র	৪টি
	খেলাফতে রব্বানী	১টি
অমুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন ৭২ টি	যুক্তফ্রন্ট	১৩টি
	মুসলিম লীগ	০টি
	কংগ্রেস	২৪টি
	তফশীলী ফেডারেশন	২৭টি
	অন্যান্য	৮টি
মোট আসন (২৩৭+৭২)		৩০৯টি

❖ এটা ছিলো মুসলিম লীগের জন্য বিশাল পরাজয়

প্রধান নেতা ও মুখ্যমন্ত্রী

➤ যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী: এ. কে. ফজলুল হক।

পতনের কারণ ও পরিণতি:

- সরকার ক্ষমতায় আসার ৬ সপ্তাহের (৫৬ দিন) মধ্যেই ভেঙে দেওয়া হয়।
- পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গুলাম মোহাম্মদ সরকারের বিরুদ্ধে "বিচার বিভাগকে অবমাননা" ও "অবাধ্যতা"র অভিযোগ এনে ১৯৫৪ সালের ৩০শে মে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন।
- পরে মুসলিম লীগ আবার ক্ষমতায় ফিরে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়ে।

এই নির্বাচনের গুরুত্বঃ

- এটি ছিল পূর্ব বাংলার মানুষের প্রথম গণতান্ত্রিক বিজয়।
- ভাষা আন্দোলনের প্রভাব ও বাঙালি জাতির রাজনৈতিক চেতনার জাগরণ স্পষ্ট হয়।
- ভবিষ্যতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি তৈরি হয়।
- প্রমাণ করে, পশ্চিম পাকিস্তান-কেন্দ্রিক শাসন কাঠামো বাঙালিদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে ব্যর্থ।
- এই ঘটনার ধারাবাহিকতায় ভবিষ্যতে আসে:
 - ৬-দফা আন্দোলন
 - গণঅভ্যুত্থান ১৯৬৯
 - এবং শেষে মুক্তিযুদ্ধ ১৯৭১

১৯৫৬ সাল: পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান

- তৈরি ও প্রণয়ন: ২৩ মার্চ ১৯৫৬
- পাকিস্তানকে ঘোষণা করা হয়: একটি গণতান্ত্রিক ইসলামি প্রজাতন্ত্র
- রাষ্ট্রভাষা: উর্দু ও বাংলা
- শাসনব্যবস্থাঃ পার্লামেন্টারি শাসনব্যবস্থা
- প্রেসিডেন্ট: ইক্বান্দার মির্জা
- গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব: পূর্ব পাকিস্তানকে কিছুটা স্বীকৃতি দেওয়া হলেও, বাস্তবে ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানের হাতেই রয়ে যায়।

১৯৫৮ সাল: সামরিক শাসনের সূচনা

➤ সামরিক শাসন

- প্রেসিডেন্ট ইক্বান্দার মির্জা ৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে সংবিধান বাতিল করে সামরিক শাসন জারি করেন।
- ২৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আইয়ুব খান ইক্বান্দার মির্জাকে সরিয়ে সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ক্ষমতায় আসেন।
- ২০ দিন পর: আইয়ুব খান ইক্বান্দার মির্জাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতি হন।

➤ ফলাফল:

- গণতন্ত্র রুদ্ধ হয়।
- সব রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়।
- সংবাদপত্র ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

১৯৫৯ সাল: মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ

➤ মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy):

জনগণ সরাসরি ভোট দেয় না, নির্বাচিত প্রতিনিধি বা "বেসিক ডেমোক্রোটদের" মাধ্যমে শাসনব্যবস্থা চলে। মোট ৮০ হাজার ভোটার (পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে ৪০ হাজার করে)।

➤ চার স্তর বিশিষ্ট: ➤ ইউনিয়ন ➤ থানা ➤ জেলা ➤ প্রদেশ/ডিভিশন

ফলাফল:

- পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অংশগ্রহণ ও অধিকার আরও সংকুচিত হয়।
- ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি, ৮০ হাজার মৌলিক গণতন্ত্রী ভোটারদের আস্থা-সূচক ভোটে ("হ্যাঁ" বা "না") আইয়ুব খান ৫ বছরের জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

Combined Opposition Parties (COP) বা সম্মিলিত বিরোধী জোট

- **Combined Opposition Parties (COP)** ছিল পাকিস্তানে গঠিত একটি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর জোট, যা গঠিত হয়েছিল ১৯৬৪ সালের ২৬ জুলাই, আইয়ুব খানের শাসনের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ অবস্থান নেওয়ার জন্য।
- COP-এর লক্ষ্য ছিল ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে একক বিরোধী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়া।
- COP-এ কয়েকটি প্রধান রাজনৈতিক দল অংশ নেয়, যেমন:
 - আওয়ামী লীগ
 - নেজামে ইসলাম পার্টি
 - কাউন্সিল মুসলিম লীগ
 - ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (NAP)
 - জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম
 - জমিয়তে উলামায়ে পাকিস্তান
- ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে COP তাদের প্রার্থী হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পরামর্শে মনোনয়ন দেয় ফাতেমা জিন্নাহ-কে (মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ'র বোন)।
- নির্বাচন ছিল পরোক্ষ (Basic Democrats ভোট দেয়) — তাই জনসমর্থন বেশি থাকলেও ফাতেমা জিন্নাহ পরাজিত হন।
- পরবর্তীতে এ আন্দোলন থেকেই গণসংগ্রাম এবং ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পদত্যাগের পথ প্রশস্ত হয়।

১৯৬৬ সালের ৬ দফা দাবি

- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৫-৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬, লাহোরে আয়োজিত আওয়ামী লীগের সম্মেলনে ঘোষণা করেন।
- ৬ দফার মূল লক্ষ্য:
 - পূর্ব বাংলার (পূর্ব পাকিস্তান) আর্থ-রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করা।
 - কেন্দ্রীয় শাসনের ক্ষমতা কমিয়ে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠা।

৬ দফা দাবি (সংক্ষেপে):

১) কেন্দ্রীয় সরকার কেবল দুটি বিষয়ে ক্ষমতা রাখবে:

- প্রতিরক্ষা
- পররাষ্ট্রনীতি
- (অন্য সব ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকবে)

২) দুটি পৃথক ও সহজপ্রাপ্য রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা থাকবে, অথবা

- একটি মুদ্রা থাকবে, তবে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং ব্যবস্থা থাকবে যাতে মুদ্রার অপপ্রবাহ ঠেকানো যায়।

৩) বাণিজ্য ও অর্থনীতি প্রদেশের অধীনে থাকবে:

- কর আদায় ও ব্যবস্থাপনা প্রদেশের হাতে থাকবে।
- কেন্দ্র তার জন্য কোনো কর আরোপ করতে পারবে না।

৪) প্রতিটি প্রদেশে পৃথক ব্যাংক ব্যবস্থা থাকবে:

- রাজস্ব আয় ও বৈদেশিক মুদ্রা আয় প্রদেশে থাকবে।
- পূর্ব পাকিস্তান নিজের অর্থ নিজের মতো ব্যয় করতে পারবে।

৫) প্রদেশে নিজস্ব মিলিশিয়া ও আধা-সামরিক বাহিনী থাকবে:

- আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পূর্ব বাংলার নিজস্ব বাহিনী থাকবে।

৬) প্রদেশের হাতে থাকবে সব ধরনের পণ্য আমদানী-রফতানির ক্ষমতা:

- পূর্ব পাকিস্তান নিজের ইচ্ছামতো বিদেশি দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য করতে পারবে।

৬ দফা ঘোষণার প্রভাব

- এটিকে বলা হয়: "বাঙালির মুক্তির সনদ"
- এটি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে বিচলিত করে তোলে
- শেখ মুজিবকে পাকিস্তানি সরকার গ্রেফতার করে (আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায়)
- এর মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়

আগরতলা মামলা (Agartala Conspiracy Case)

- ঘোষণা: ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮, পাকিস্তান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে মামলাটি প্রকাশ করে।
- অভিযোগ:
 - শেখ মুজিবসহ ৩৮ জন পূর্ব পাকিস্তানিকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে ভারতের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেছেন – এই মিথ্যা অভিযোগে মামলা হয়।
 - মূল অভিযোগ: ভারতের আগরতলা শহরে এই ষড়যন্ত্র হয়েছে – তাই এর নাম আগরতলা মামলা।
- প্রধান আসামি: শেখ মুজিবুর রহমান (Accused No. 1)
- প্রতিক্রিয়া: ছাত্র ও জনসাধারণ ব্যাপক প্রতিবাদে ফেটে পড়ে।
- ১৯৬৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ছাত্র নেতা আসাদুজ্জামান আসাদ পুলিশের গুলিতে শহিদ হন।
- মামলা প্রত্যাহার:
 - ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯: ব্যাপক আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার মামলা প্রত্যাহার করে নেয়।

১১ দফা কর্মসূচি

- ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি, পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক ঘোষিত।
- উদ্দেশ্য: শেখ মুজিবের ৬ দফাকে ভিত্তি করে অধিকতর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত দাবি উত্থাপন করা।

১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান

- পটভূমি:
 - আগরতলা মামলার মাধ্যমে শেখ মুজিবকে রাজনীতি থেকে সরানোর ষড়যন্ত্র
 - ১১ দফা আন্দোলনের জোরালো গণসমর্থন
 - আইয়ুব খানের একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের ঘৃণা
- গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা:
 - ২০ জানুয়ারি ১৯৬৯: ছাত্র মতিউর রহমান গুলিবদ্ধ হয়ে শহিদ
 - ২০ ফেব্রুয়ারি: আসাদ গুলিবদ্ধ হয়ে শহিদ
 - ২৪ ফেব্রুয়ারি: রফিকুল আমিন, জহির রায়হানসহ অনেকে শহিদ হন
- ফলাফল:
 - গণআন্দোলনের চাপে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার

- শেখ মুজিব জেল থেকে মুক্ত
- আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে যেতে বাধ্য হন
- **আইয়ুবের পদত্যাগ:**
 - **২৫ মার্চ ১৯৬৯:** আইয়ুব খান ক্ষমতা সেনাবাহিনীর প্রধান **জেনারেল ইয়াহিয়া খান** এর হাতে তুলে দেন।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

- **১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন** ছিল পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম এক এবং একক নির্বাচন, যেখানে পাকিস্তানের উভয় অংশ—পূর্ব (বর্তমান বাংলাদেশ) ও পশ্চিম পাকিস্তান—একই সঙ্গে অংশগ্রহণ করেছিল।
- এই নির্বাচন বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল।
- নির্বাচন হয়েছিল **১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর**।

ফলাফল

আসনের ধরন ও সংখ্যা		মোট আসন	আওয়ামী লীগ	পাকিস্তান পিপলস পার্টি
নির্বাচিত সাধারণ আসন ৩০০	পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	১৬০	০
	পশ্চিম পাকিস্তান	১৩৮	০	৮৩
সংরক্ষিত মহিলা আসন ১০	পূর্ব পাকিস্তান	৭	৭	০
	পশ্চিম পাকিস্তান	৬	০	৫
মোট আসন		৩১৩	১৬৭	৮৮

- **আওয়ামী লীগ** একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং সরকার গঠনের সাংবিধানিক অধিকার পায়।

গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

আওয়ামী লীগের বিজয়

- পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়।
- শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে নির্বাচন করে।

পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন স্পষ্ট হয়

- নির্বাচনের ফলে বোঝা যায়, পাকিস্তানের দুই অংশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক স্বার্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ক্ষমতা হস্তান্তর অস্বীকৃতি

- যদিও আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হতে দিতে রাজি হয়নি।

ফলাফল ও প্রতিক্রিয়া

- ভূট্টো ঘোষণা করেন, “উনি (মুজিব) পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ, আমি পশ্চিমে।”
- ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষোভ বাড়ে এবং স্বাধীনতা আন্দোলন ত্বরান্বিত হয়।

১৯৭১ সালের অসহযোগ আন্দোলন

পটভূমি

- ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন
- জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী

তারিখ	ঘটনা
১ মার্চ	ইয়াহিয়া খান অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। দেশজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়।
২ মার্চ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা "স্বাধীন বাংলাদেশ" নামক পতাকা উত্তোলন করেন (প্রথমবারের মতো)।
৩ মার্চ	ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ "স্বাধীনতার ইশতেহার" ঘোষণা করে।
৭ মার্চ	বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ – আসলে এটি ছিল অসহযোগ আন্দোলনের রূপরেখা।
৬-২৫ মার্চ	পুরো পূর্ব পাকিস্তানে কার্যত পাকিস্তান সরকারের উপর নিয়ন্ত্রণ চলে যায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাঙালিদের হাতে।

২৫ মার্চ ১৯৭১: এক ভয়াবহ রাত – কালরাত্রি

- এক রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ব্লিভাবে অপারেশন 'সার্চলাইট' (Operation Searchlight) নামে একটি সামরিক অভিযান চালিয়ে ঢাকা সহ সারা পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা শুরু করে।
- নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল টিক্কা খান।
- লক্ষ্য ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইপিআর সদর দফতর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, রাজনৈতিক নেতাদের বাসস্থান, সাংবাদিক, ছাত্র, হিন্দু সম্প্রদায়।
- কয়েক হাজার নিরীহ মানুষ এক রাতেই শহীদ হন। এই রাত থেকেই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।
- রাতের বেলায় শেখ মুজিবুর রহমান একটি স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠান: "এটাই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, বাংলাদেশ স্বাধীন।"
- ২৬ মার্চ ভোরে মেজর জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন।
- বাংলাদেশ সরকার ২৫ মার্চকে জাতীয় গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে।
- ২৬ মার্চ কে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়।

১০ এপ্রিল ১৯৭১: অস্থায়ী সরকার গঠন

- মুজিবনগর (তৎকালীন মেহেরপুর) এ বাংলাদেশের প্রথম অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়।
- এই সরকারই মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দেয়।

সরকারের মূল সদস্যরা

পদবী	নাম
রাষ্ট্রপতি (অনুপস্থিত, কারাবন্দি)	শেখ মুজিবুর রহমান
অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্বপ্রাপ্ত	সৈয়দ নজরুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রী	তাজউদ্দীন আহমদ
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী	এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান
পররাষ্ট্রমন্ত্রী	খন্দকার মোশতাক আহমদ
অর্থমন্ত্রী	এম. মনসুর আলী

অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহণ

- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে, মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা (বর্তমানে মুজিবনগর) থেকে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন ইউসুফ আলী।
- ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ সালে, মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলা (বর্তমানে মুজিবনগর) তে শপথ পাঠ অনুষ্ঠান পরিচালনা করান মোঃ ইউসুফ আলী ও আবদুল মান্নান।
- শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান দানকারী দলের নেতৃত্ব দেন মাহবুব উদ্দিন আহমেদ।

মুজিবনগর সরকারের প্রধান কাজ

- মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করা
- আন্তর্জাতিক সমর্থন অর্জন
- প্রশাসনিক কাঠামো গঠন
- বিভিন্ন সেক্টরে মুক্তিযোদ্ধা ও সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা
- আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণা

মুজিবনগর সরকারের গুরুত্ব

- এটি ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম আনুষ্ঠানিক সরকার।
- এই সরকারের নেতৃত্বেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত ও সফলভাবে পরিচালিত হয়।
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- ১৯৭১ সালের ১১ থেকে ১৭ জুলাই প্রধান মন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ সিনিয়র সামরিক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করেন এবং সমগ্র বাংলাদেশকে রণভঙ্গনের জন্য ১১ টি সেক্টরে ভাগ করেন।

১১ টি সেক্টর ও তাদের সদর দপ্তর

সেক্টর	সেক্টর কমান্ডার	এলাকা	ঘাঁটি/হেডকোয়ার্টার
১	মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর রফিকুল ইসলাম	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার	ভারতস্থ ত্রিপুরা
২	মেজর খালেদ মোশাররফ, মেজর এ.টি.এম হায়দার	কুমিল্লা, নোয়াখালী	আগরতলা
৩	মেজর কে.এম. শফিউল্লাহ	ঢাকা, হবিগঞ্জ, পূর্বাংশ	মেঘালয়
৪	মেজর চিত্ত রঞ্জন দত্ত (সি. আর. দত্ত)	সিলেট জেলার পূর্বাংশ	শিলং
৫	মেজর মীর শওকত আলী	সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল	বনগাঁ
৬	উইং কমান্ডার এম. কে. বাশার	রংপুর, দিনাজপুর	কোচবিহার
৭	মেজর কাজী নুরুজ্জামান	রাজশাহী, পাবনা	মালদা
৮	মেজর আবু ওসমান চৌধুরী, মেজর এম. এ.	কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর	কৃষ্ণনগর

	মনজুর		
৯	মেজর এম. এ. জলিল	বরিশাল, পটুয়াখালী	কলিকাতা
১০	নৌ-সেক্টর, কমান্ডার: ক্যাপ্টেন	উপকূলীয় এলাকা ও নৌবাহিনী	কলকাতা
১১	মেজর আবু তাহের, এম. হামিদুল্লাহ	ময়মনসিংহ	ভারতের বিভিন্ন ক্যাম্প

ব্রিগেড ফোর্স

ব্রিগেড ফোর্স মূলত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে গঠিত বিশেষভাবে সংগঠিত ও সুসংগঠিত তিনটি বড় আকারের বাহিনীকে বোঝায়। এই বাহিনীগুলোকে বলা হয়:

- জেড ফোর্স (Z Force) – মেজর জিয়াউর রহমান
- এস ফোর্স (S Force) – লেফটেন্যান্ট কর্নেল কে. এম. শফিউল্লাহ
- কে ফোর্স (K Force) – লেফটেন্যান্ট কর্নেল খালেদ মোশাররফ

বিভিন্ন আঞ্চলিক বাহিনী

- কাদেরিয়া বাহিনী – কাদের সিদ্দিকি- টাঙ্গাইল
- হেমায়েত বাহিনী – হেমায়েত উদ্দিন- বরিশাল অঞ্চল

অক্টোবর – নভেম্বর ১৯৭১

> অক্টোবর ১৯৭১

- যুদ্ধের গতি ত্বরান্বিত হয়:
 - মুক্তিযোদ্ধারা দেশে গেরিলা হামলা ও অপারেশন চালাতে থাকে।
 - ভারতের সাথে সমন্বয় করে সুনির্দিষ্টভাবে কমান্ডো স্টাইল অপারেশন শুরু হয়।
 - বহু এলাকায় মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি বাহিনীকে হটিয়ে "মুক্ত এলাকা" গঠন করে।
- আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চাপ বাড়তে পাকিস্তানের ওপর:

বিভিন্ন গণমাধ্যমে পাকিস্তানের গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও শরণার্থী সংকট নিয়ে ব্যাপক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

> নভেম্বর ১৯৭১

- মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর যৌথ যুদ্ধ পরিকল্পনা:
 - ভারত ও বাংলাদেশ যৌথভাবে যুদ্ধ পরিকল্পনা চূড়ান্ত করে।
 - ভারতের RAW ও সেনাবাহিনী সরাসরি মুক্তিবাহিনীকে সমর্থন দেয়।
- বড় বড় সামরিক অপারেশন:
 - গেরিলা অভিযান ও বড় আকারের সামরিক আক্রমণ পাকিস্তানিদের মনোবল ভেঙে দেয়।
 - "মুক্ত এলাকার" সংখ্যা বাড়তে থাকে।
 - অনেক জেলা ও উপজেলা ধাপে ধাপে পাকিস্তানিদের কবল থেকে মুক্ত হতে থাকে।

ডিসেম্বর ১৯৭১: চূড়ান্ত যুদ্ধ ও বিজয়

> ৩ ডিসেম্বর:

- পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করে।
- ফলে ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ করে এবং ৩ ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৭১) শুরু হয়।

> ৪-১৬ ডিসেম্বর: যৌথ বাহিনীর বিজয় অভিযান

- গঠিত হয়: যৌথ মিত্র বাহিনী (Joint Command of Mukti Bahini + Indian Army)

পূর্ব দিক থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পশ্চিম দিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মিলিত আক্রমণ।

ঢাকা ঘিরে ফেলা হয় একাধিক দিক থেকে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দ্রুত পিছুয়ে যেতে থাকে।

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১: শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস

- ১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক কালো দিন, যেদিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকার, আলবদর ও আলশামস মিলে পরিকল্পিতভাবে দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান—বুদ্ধিজীবীদের—হত্যা করে।
- এই দিনে ডাক্তার, অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, প্রকৌশলীসহ সমাজের অগ্রগণ্য মানুষদের ঘর থেকে তুলে নিয়ে গোপনে হত্যা করা হয়।
- রায়েরবাজার বধ্যভূমি হলো শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মৃতিতে নির্মিত প্রতীকী স্মৃতিস্তম্ভ।

শহীদ বুদ্ধিজীবীদের তালিকা (নমুনা)

পেশা	নাম
অধ্যাপক	ড. মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী
অধ্যাপক	ড. জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা
অধ্যাপক	ড. ফজলুল হক
সাংবাদিক	সিরাজুদ্দিন হোসেন, শহীদুল্লাহ কায়সার
ডাক্তার	ড. আলীম চৌধুরী, ড. ফজলে রাব্বি
সাহিত্যিক	আনোয়ার পাশা

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১: বিজয় দিবস

- ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের লেফটেন্যান্ট জেনারেল এ.এ.কে. নিয়াজী ৯৩ হাজার সেনাসহ আত্মসমর্পণ করেন।
- ভারতের পক্ষ থেকে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন।
- দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম এর সফল পরিণতি।

আত্মসমর্পণের সময় মধ্যে ছিলেন

নাম	দেশ	পদবী
এ. কে. খন্দকার	বাংলাদেশ	ডেপুটি চিফ অব স্টাফ
লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা	ভারত	পূর্বাঞ্চলীয় সেনা প্রধান
লেফটেন্যান্ট জেনারেল আমির আবদুল্লাহ খান নিয়াজী	পাকিস্তান	পূর্ব পাকিস্তানের কমান্ডার

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ ও ঘটনা

তারিখ	ঘটনা
৭ মার্চ ১৯৭১	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। বলেন: "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।"
২৫ মার্চ ১৯৭১	পাকিস্তান সেনাবাহিনী "অপারেশন সার্চলাইট" নামে পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যা শুরু করে। হাজার হাজার নিরীহ বাঙালি নিহত হয়।
২৬ মার্চ ১৯৭১	বঙ্গবন্ধু আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই দিনই বাংলাদেশ স্বাধীনতা দিবস। পরবর্তীতে জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা করেন।
১০ এপ্রিল ১৯৭১	গঠিত হয় "গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার" - প্রবাসী মুজিবনগর সরকার।
১৭ এপ্রিল ১৯৭১	মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণ। এটি ছিল বাংলাদেশের প্রথম সরকার।
মে-জুন ১৯৭১	মুক্তিবাহিনী সংগঠিত হয়ে ১১টি সেক্টরে ভাগ হয়ে যুদ্ধ শুরু করে। কর্নেল ওসমানী ছিলেন সর্বাধিনায়ক।
১ আগস্ট ১৯৭১	নিউইয়র্কে "Concert for Bangladesh" অনুষ্ঠিত হয় - আয়োজন করেন জর্জ হ্যারিসন ও পণ্ডিত রবিশঙ্কর।
৩ ডিসেম্বর ১৯৭১	ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। ভারত বাংলাদেশের পক্ষে যুদ্ধে অংশ নেয়।
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১	ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণ। মুক্তিযুদ্ধ বিজয় অর্জিত হয়। দিনটি বিজয় দিবস হিসেবে পালিত হয়।

সরকার প্রদত্ত বীরত্বসূচক উপাধি / খেতাবসমূহ

খেতাবের নাম	মোট সংখ্যা	ব্যাখ্যা
বীরশ্রেষ্ঠ	৭ জন	সর্বোচ্চ সম্মান, সর্বাধিক শহীদ
বীর উত্তম	৬৭ জন	দ্বিতীয় সর্বোচ্চ, অধিকাংশ জীবিত ছিলেন
বীর বিক্রম	১৭৪ জন	সাহসিকতার জন্য
বীর প্রতীক	৪২৪ জন	বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য

বীরশ্রেষ্ঠ (Bir Sreshtho)

➤ সংখ্যা: ৭ জন

➤ ঘোষণা: মুক্তিযুদ্ধের পরে, ১৯৭৩ সালে

ক্রম	নাম	পদের নাম
১	ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর	৭ নং সেক্টরে (মেহেরপুর ও যশোর)
২	সিপাহী হামিদুর রহমান	৪ নং সেক্টরে (সুনামগঞ্জ) যুদ্ধ করেন এবং ত্রিপুরার ডাইমুনি

		ও তেলিয়াপাড়াতে যুদ্ধরত অবস্থায় শহীদ হন।
৩	সিপাহী মোস্তফা কামাল	২ নং সেক্টরে (কুমিল্লা ও নোয়াখালী) যুদ্ধ করেন এবং আখাউড়াতে প্রতিরোধ যুদ্ধে শহীদ হন।
৪	ল্যান্স নায়েক মুন্সি আবদুর রউফ	১ নং সেক্টরে (চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম) যুদ্ধ করেন এবং রাঙ্গামাটির বুড়িঘাট এলাকায় যুদ্ধে শহীদ হন।
৫	সিপাহী নূর মোহাম্মদ শেখ	৮ নং সেক্টরে (রাজশাহী ও পাবনা) যুদ্ধ করেন এবং ছুটিপুর-রাম নগর এলাকায় যুদ্ধক্ষেত্রে শহীদ হন।
৬	স্কোয়াড্রন ইঞ্জিনিয়ার রুহুল আমিন	১০ নং সেক্টরে (বরিশাল ও পটুয়াখালী) যুদ্ধ করেন এবং পটুয়াখালীর রূপসা নদীতে যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি শহীদ হন।
৭	ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান	তিনি করাচি (পাকিস্তান) থেকে একটি যুদ্ধবিমান নিয়ে বাংলাদেশে আসার চেষ্টা করেন কিন্তু ব্যর্থ হন।

বাংলাদেশের সংবিধান (Constitution of Bangladesh)

- দেশের সর্বোচ্চ আইন, যা রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক কাঠামো নির্ধারণ করে।
- এটি নাগরিকের অধিকার, সরকারের কাঠামো, ও নীতিমালা নির্ধারণ করে দেয়।

সংবিধান প্রণয়নের ইতিহাস

- ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন
- ১১ এপ্রিল ড. কামাল কে প্রধান করে ৩৪ বিশিষ্ট 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠন করা হয়।
- একমাত্র নারী সদস্য বেগম রাজিয়া বানু
- একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
- প্রথম অধিবেশন ১৭ এপ্রিল
- মোট ৪৭ টি বৈঠক, ৩০০ ঘণ্টা ব্যয় করে ১০ জুন ১৯৭২ সালে প্রাথমিক খসড়া অনুমোদন করেন।
- ১২ অক্টোবর ১৯৭২ সালে গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে কামাল হোসেন সংবিধানের খসড়া বিল আকারে উত্থাপন করেন।
- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সংবিধান কার্যকর হয়।

এক নজরে সংবিধান

- সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্যঃ ৩৪ জন
- সংবিধান প্রণয়ন কমিটির মহিলা সদস্যঃ ১ জন, বেগম রাজিয়া বানু
- সংবিধান প্রণয়ন কমিটির বিরোধী দলীয় সদস্যঃ ১ জন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত
- সংবিধানের প্রস্তাবনাঃ ১ টি
- সংবিধানের ভাগ/অংশঃ ১১ টি
- সংবিধানের অনুচ্ছেদঃ ১৫০ টি
- সংবিধানের তফসিলঃ ৭ টি
- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিঃ ৪ টি
- সংবিধানের এ পর্যন্ত মোট সংশোধনীঃ ১৭ টি

বাংলাদেশের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য

- লিখিত দলিল
- দুস্পরিবর্তনীয়
- প্রস্তাবনা
- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি
- মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ
- সংবিধানের প্রাধান্য
- গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা
- সংসদীয় সরকার পদ্ধতি
- এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা
- এককেন্দ্রিক আইনসভা
- বহুদলীয় ব্যবস্থা
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা

ভাগ	বিষয়
প্রথম ভাগ	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক সীমা, রাষ্ট্রভাষা, নাগরিকত্ব ইত্যাদি
দ্বিতীয় ভাগ	রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি মূলনীতি।
তৃতীয় ভাগ	মৌলিক অধিকার নাগরিকদের বাকস্বাধীনতা, সমতা, ধর্মপালন ইত্যাদি অধিকার
চতুর্থ ভাগ	নির্বাহী বিভাগ রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব ও ক্ষমতা
পঞ্চম ভাগ	আইনসভা জাতীয় সংসদের গঠন, অধিকার, কার্যাবলি
ষষ্ঠ ভাগ	বিচার বিভাগ উচ্চ আদালত, বিচারপতির নিয়োগ, ক্ষমতা ও স্বাধীনতা।
সপ্তম ভাগ	নির্বাচন নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব, স্বাধীনতা ও কার্যাবলি
অষ্টম ভাগ	নিয়ন্ত্রক ও মহাহিসাব নিরীক্ষক সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা
নবম ভাগ	বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারীবৃন্দ সরকারি চাকরি, নিয়োগ, শৃঙ্খলা ইত্যাদি
দশম ভাগ	সংবিধান সংশোধন সংবিধান পরিবর্তনের পদ্ধতি (ধারা ১৪২)
একাদশ ভাগ	বিবিধ অন্যান্য বিষয় যা পূর্ববর্তী ভাগগুলিতে অন্তর্ভুক্ত হয়নি

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী

সংশোধনী	তারিখ	মূল বিষয়বস্তু
প্রথম সংশোধনী	১৫ জুলাই, ১৯৭৩	৪৭ ধারা সংশোধন, ৪৭(৩) ও নতুন ৪৭এ ধারার সংযোজন; ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও মানবতাবিরোধী অপরাধের

		জন্য সংবিধানগত ভিত্তি।
দ্বিতীয় সংশোধনী	২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩	জরুরি অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারের স্থগিতাদেশ; অনুচ্ছেদ-২৬, ৬৩, ৭২ ও ১৪২-গুলোর সংশোধন; নতুন Part IXA সংযোজন।
তৃতীয় সংশোধনী	২৭ নভেম্বর, ১৯৭৪	বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে এলাকা বিনিময় (Enclaves) ও সীমান্ত চুক্তি বৈধ করা।
চতুর্থ সংশোধনী	২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫	সংসদীয় থেকে প্রেসিডেন্সিয়াল শাসনব্যবস্থা; এক-দলীয় ব্যবস্থা; বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হ্রাস; মৌলিক অধিকারের বিষয়বস্তুতে হস্তক্ষেপ।
পঞ্চম সংশোধনী	৬ এপ্রিল, ১৯৭৯	১৫ আগস্ট ১৯৭৫-এর পর সামরিক শাসনের অধীনে করা কাজগুলিকে বৈধ ঘোষণা; সংবিধানে 'বিসমিল্লাহর রহমানির রহমান' সংযোজন।
ষষ্ঠ সংশোধনী	৯ জুলাই, ১৯৮১	(মূল বিষয়বস্তু হিসেবে) ভাইস প্রেসিডেন্টকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে অংশগ্রহণের সুযোগ।
সপ্তম সংশোধনী	১১ নভেম্বর, ১৯৮৬	দ্বিতীয় সামরিক শাসনামলের অধীনে করা আদেশ ও নির্দেশগুলোর বৈধতা নিশ্চিত করা হয়।
অষ্টম সংশোধনী	৯ জুন, ১৯৮৮	রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম করা হয়; হাইকোর্ট বিভাগের বিভিন্ন স্থায়ী বেঞ্চ গঠন; অন্যান্য সংশোধনী।
নবম সংশোধনী	১১ জুলাই, ১৯৮৯	রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নিয়ে কিছু বিধান সংযোজন করা হয়
দশম সংশোধনী	১২ জুন, ১৯৯০	নারীদের জন্য সংসদে আসন বৃদ্ধি
একাদশ সংশোধনী	১০ আগস্ট, ১৯৯১	রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ কে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ বৈধ ঘোষণা; বিচারপতি থেকে উপ-রাষ্ট্রপতির মেয়াদ বিবেচনা করা হবে
দ্বাদশ সংশোধনী	১৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯১	সংসদীয় শাসনপদ্ধতি পুনরায় প্রতিষ্ঠা; উপ-রাষ্ট্রপতির পদ বাতিল; প্রেসিডেন্সিয়াল ব্যবস্থা থেকে সরানো।
ত্রয়োদশ সংশোধনী	২৮ মার্চ, ১৯৯৬	নির্বাচনের ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে সংযোজন
চতুর্দশ সংশোধনী	১৬ মে, ২০০৪	মহিলা সংরক্ষিত আসন ৩০ থেকে ৪৫-এ বৃদ্ধি; সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতির অবসরের বয়স ৬৫ থেকে ৬৭; ছবিপ্রদর্শন সংক্রান্ত বিধান ইত্যাদি।
পঞ্চদশ সংশোধনী	৩ জুলাই, ২০১১	তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বিলোপ; ৭২-এর মূল নীতি (গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র) পুনর্বহাল; স্বাধীনতার ঘোষণা ও জন্ম ঘোষণা সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত; মহিলা আসন ৫০-এ উন্নয়ন ইত্যাদি

ষোড়শ সংশোধনী	২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৪	উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অপসারণ বা অভিযোগের প্রক্রিয়া সংসদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয় (ইমপিচমেন্ট সম্পর্কিত)।
সপ্তদশ সংশোধনী	৮ জুলাই, ২০১৮	মহিলা সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ২৫ বছর বাড়ানো হয়

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামল (১৯৭২-১৯৭৫)

➤ সময়কাল

- শাসনকালঃ জানুয়ারি ১২, ১৯৭২ – আগস্ট ১৫, ১৯৭৫
- স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ও পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান।

➤ ১৯৭২ – সাল

- ১০ জানুয়ারি ১৯৭২: পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশে আসেন।
- ১২ জানুয়ারি ১৯৭২: শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ।
- ১৭ মার্চ ১৯৭২: অস্থায়ী সংবিধান আদেশ কার্যকর হয়।
- ৪ নভেম্বর ১৯৭২: বাংলাদেশের সংবিধান গৃহীত হয়।
- ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২: সংবিধান কার্যকর হয়।

➤ ১৯৭৩ – সংসদ নির্বাচন ও জাতীয় পুনর্গঠন

- ৭ মার্চ ১৯৭৩: বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে (৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩)।
- যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে রেশনিং, পুনর্বাসন ও শিক্ষা সংস্কার শুরু হয়।

➤ ১৯৭৩-৭৪ সংবিধান সংশোধনী ও রাজনৈতিক রূপান্তর

- প্রথম সংশোধনী (১৫ জুলাই ১৯৭৩): মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করতে সংবিধানে ৪৭(৩) ও ৪৭ক ধারা সংযোজন।
- তৃতীয় সংশোধনী (২৮ নভেম্বর ১৯৭৪) বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুমোদন, ছিটমহল বিনিময়ের পথ উন্মুক্ত হয়।

➤ ১৯৭৪ – দুর্ভিক্ষ ও অভ্যন্তরীণ সংকট

- ব্যাপক খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।
- মূল্যস্ফীতি ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়, জন অসন্তোষ বাড়ে।

➤ ১৯৭৫ – একদলীয় শাসন ও রাজনৈতিক পরিবর্তন

- ৪র্থ সংশোধনী (২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫):
 - রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা চালু হয়।
 - একদলীয় শাসন (BAKSAL বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠন।
 - সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ (কেবল ৪টি পত্রিকা চালু ছিল)।
 - মৌলিক অধিকার অনেকাংশে স্থগিত।
 - বিচার বিভাগে নিয়ন্ত্রণ আরোপ।

১৫ আগস্ট ১৯৭৫

- সেনাবাহিনীর একটি অংশের দ্বারা শেখ মুজিব সপরিবারে হত্যাকাণ্ডের শিকার হন। এদিনই তাঁর শাসনামলের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৭৫ সাল: রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সূচনা

- ১৫ আগস্ট ১৯৭৫: শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য এক রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থানে নিহত হন। এটি ছিল বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম সামরিক অভ্যুত্থান।
- এরপর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতি হন এবং সরকার গঠন করেন।
- ৩ নভেম্বর ১৯৭৫: জেলহত্যা দিবস জাতীয় চার নেতা (তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এএইচএম কামরুজ্জামান, মনসুর আলী)কে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে হত্যা করা হয়।
- ৬ নভেম্বর: মোশতাক সরকার পতন হয়।

১৯৭৫ (পরবর্তী) – ১৯৭৭: মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের উত্থান

- ৭ নভেম্বর ১৯৭৫: সিপাহি-জনতা বিপ্লব বা "জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস"- কর্নেল তাহের এবং জাসদের সমর্থনে সেনাবাহিনীর এক অংশের অভ্যুত্থানে জিয়াউর রহমান মুক্ত হন এবং ধীরে ধীরে রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নেন।
- ১৯৭৭ জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হন। এই সময় তিনি ধাপে ধাপে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন এবং একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)।

১৯৭৮-১৯৮১: জিয়া সরকারের শাসনকাল

- ১৯৭৮: জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হন।
- রাজনৈতিক দল গঠন, অর্থনৈতিক সংস্কার এবং প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন।
- ইসলামী দলগুলোর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাদের রাজনীতিতে পুনরায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেন।
- সমালোচনা: বাকস্বাধীনতা ও বিরোধী মত দমন, সামরিক আদালতের ব্যবহার এবং রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার নিয়ে বিতর্ক ছিল।

১৯৮১: জিয়াউর রহমানের হত্যা

- ৩০ মে ১৯৮১: চট্টগ্রামে এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থানে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হন।
- এই ঘটনায় দেশে আবার রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হয়।
- এরপর বিচারপতি আব্দুস সাত্তার অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতি হন।

আব্দুস সাত্তার-এর শাসনকাল (১৯৮১-১৯৮২)

- ১৫ নভেম্বর ১৯৮১ সালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হলে, সে সময়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট জাস্টিস আব্দুস সাত্তার অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন।
- ২৪ মার্চ ১৯৮২: সেনাবাহিনী প্রধান হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এক রক্তহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আব্দুস সাত্তারের সরকারকে ক্ষমতা থেকে সরায়।
- এই ঘটনার মাধ্যমে দেশে দ্বিতীয় সামরিক শাসন শুরু হয়।

এরশাদের শাসন আমল (১৯৮২-১৯৯০)

- ক্ষমতায় আসা:
 - ২৪ মার্চ ১৯৮২: জেনারেল এরশাদ রাষ্ট্রপতি আব্দুস সাত্তারকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেন। সংবিধান বাতিল না করে সামরিক শাসন জারি করেন।
 - নিজেকে ঘোষণা করেন "চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর (CMLA)"
 - রাজনৈতিক দল ও কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করা হয়।

- সংবাদপত্রের ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়।
- ১৯৮৩: উপজেলা পদ্ধতি চালু করেন (উপজেলা চেয়ারম্যান ব্যবস্থা), স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে। এটা তার একটি আলোচিত ও টেকসই পদক্ষেপ ছিল।
- ১৯৮৬: নিজেই একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন **জাতীয় পার্টি (জাপা)**। পরে রাষ্ট্রপতির পদে নির্বাচনে অংশ নিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন।

➤ **নির্বাচন ও বৈধতা:**

- ১৯৮৫: জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত করে জেলা প্রশাসক পরিচালিত শাসন চালু করেন।
- ১৯৮৬: সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ অংশ নেয়, তবে বিএনপি বর্জন করে।
 - জাতীয় পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।
- ১৯৮৬: প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়ী হন এরশাদ (বিরোধীরা ভোট বর্জন করে)।
- ১৯৮৮: ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করেন।
 - জাতীয় পার্টির নেতৃত্বে নতুন সংসদে সংবিধানে **অষ্টম সংশোধনী** পাস করা হয়।

➤ **পতন:**

- ১৯৯০ সালের শেষ দিকে বিরোধী জোট গঠন হয় ৩ দলীয় জোট (আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বাম দল)।
- বিক্ষোভ, হরতাল ও গণ-আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায়।
- ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০: এরশাদ পদত্যাগ করেন এবং রাষ্ট্রক্ষমতা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে হস্তান্তর করেন (সেনাপ্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল নূরউদ্দীন ছিলেন মধ্যস্থতাকারী)।

গণতান্ত্রিক ধারায় ফেরা ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন

➤ **গণতন্ত্রে প্রত্যাবর্তন (১৯৯১)**

- ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ পদত্যাগ করেন জনগণের গণআন্দোলনের মুখে।
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হয় বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ-এর নেতৃত্বে।
- ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি: স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বিতীয় নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

➤ **বিএনপি সরকারের গঠন (১৯৯১)**

- নির্বাচনে বিএনপি সবচেয়ে বেশি আসন পায় এবং আওয়ামী লীগ দ্বিতীয়।
- বিএনপি নেতৃত্বে সরকার গঠন করে, এবং খালেদা জিয়া হন বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী।
- **সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তন**
 - বিএনপি সরকার **১২তম সংবিধান সংশোধনী**র মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসনব্যবস্থা বাতিল করে।
 - সংসদীয় সরকার পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তিত হয় (১৯৯১ সালের আগস্ট)।
 - রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা সীমিত করা হয় এবং কার্যকর ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে যায়।

➤ **তত্ত্বাবধায়ক সরকার আন্দোলন (১৯৯৪-১৯৯৬)**

- রাজনৈতিক সংকট চরমে ওঠে; হরতাল, অবরোধ, সহিংসতা বাড়ে।
- ১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিএনপি সরকার একটি একতরফা নির্বাচনের আয়োজন করে।
- ফলে ৫ম জাতীয় সংসদ মাত্র ১২ দিনের মাথায় বিলুপ্ত হয়।

➤ **১৯৯৬ সালের জুনের নির্বাচন**

- তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১২ জুন ১৯৯৬ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন।

➤ **তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা**

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার (Caretaker Government) হচ্ছে একটি অরাজনৈতিক, নিরপেক্ষ ও অস্থায়ী সরকার, যা

জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরিচালনার জন্য গঠিত হয়, যাতে নির্বাচন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়।

- **১৩তম সংশোধনী (১৯৯৬)** মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের অংশ হয়। এটি ছিল বিশ্বে একমাত্র সাংবিধানিক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা।

গঠনের পদ্ধতি

➤ প্রধান উপদেষ্টা:

- একজন অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি হন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান।
- সাধারণত সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেওয়া হতো।
- তার পদমর্যাদা হতো প্রধানমন্ত্রীর সমতুল্য।

➤ উপদেষ্টামণ্ডলী: ১০ জন উপদেষ্টা থাকতেন। তারা ছিলেন অরাজনৈতিক ও নিরপেক্ষ ব্যক্তি।

➤ কার্যকাল: তত্ত্বাবধায়ক সরকার সর্বোচ্চ ৯০ দিন (৩ মাস) দায়িত্ব পালন করতে পারত। এই সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করত।

➤ কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা:

- নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন পরিচালনা।
- দৈনন্দিন প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা, কিন্তু নীতিনির্ধারণী কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা।
- ২০১১ সালে ১৫তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়।

❖ সময়কালঃ ১৯৯৬-২০০৫

আওয়ামী লীগ সরকার (১৯৯৬-২০০১)

• ক্ষমতায় আসা:

- ১২ জুন ১৯৯৬: তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও জোট করে সরকার গঠন করে।
- শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন।

• প্রধান ঘটনা:

- গঙ্গা পানি চুক্তি (১৯৯৬) ভারতের সঙ্গে ৩০ বছরের গঙ্গা পানি বণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন (১৯৯৬) পাহাড়ি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সঙ্গে শান্তিচুক্তির পথ তৈরি হয়।
- পার্বত্য শান্তি চুক্তি (১৯৯৭) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন
 - ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামত।
 - বিশ্বব্যাংক, IMF সহ আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে উন্নয়ন সহযোগিতা বৃদ্ধি।

• বিরোধীদের ভূমিকা:

- বিএনপি সংসদে অনিয়মিত ছিল।
- হরতাল ও রাজনৈতিক সংঘাত চলমান ছিল।

বিএনপি সরকার (২০০১-২০০৬)

• ক্ষমতায় আসা:

- ২০০১ সালের ১ অক্টোবর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
- চারদলীয় জোট (বিএনপি, জামায়াত, জাগপা, ইসলামী ঐক্যজোট) বিশাল জয় পায়।

- খালেদা জিয়া দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হন।
- **প্রধান ঘটনা:**
 - শান্তিচুক্তির বাস্তবায়ন স্থগিত পার্বত্য চুক্তির বাস্তবায়ন কার্যত থেমে যায়।
 - সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতা (২০০১) নির্বাচনের পর হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, জমি দখল, লুটপাটের ঘটনা ঘটে।
 - আলোচিত সন্ত্রাসী হামলা ও জঙ্গিবাদ
 - ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট: শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা হয়। ২৪ জন নিহত, শতাধিক আহত।
 - ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট: ৬৩ জেলায় একযোগে বোমা হামলা চালায় জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (JMB)।
 - জঙ্গিবাদ নির্মূলে অভিযান শুরু

❖ ২০২৪ সালের "জুলাই বিপ্লব"

- **প্রেক্ষাপট: কোটা সংস্কার ও জনঅসন্তোষ**
 - ২০১৮ সালে, দীর্ঘ ছাত্র আন্দোলনের পর কোটা বাতিল করা হয়েছিল।
 - ২০২৪ সালের জুলাই মাসে, হাইকোর্ট কোটা পুনর্বহালের রায় দেয়।
 - শিক্ষার্থীরা এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু করে, যা দ্রুত সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিরাট গণআন্দোলনে পরিণত হয়।
- **দাবি ছিল:**
 - সরকারি চাকরিতে মেধা ভিত্তিক নিয়োগ
 - অতিরিক্ত কোটা সংস্কার
 - সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহি, এবং অধিকার রক্ষা।

তারিখ	ঘটনা
১৫ জুলাই	ঢাকা, রংপুর, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ছাত্ররা রাস্তায় নামে
১৬ জুলাই	রংপুরে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবু সায়েদ পুলিশের গুলিতে নিহত। আরও কয়েকজন নিহত হয়। পুলিশের সহিংসতা আন্তর্জাতিক মহলে নিন্দা সৃষ্টি করে।
১৭-২০ জুলাই	দেশজুড়ে ধর্মঘট, মানববন্ধন, অবরোধ চলতে থাকে। "জুলাই বিপ্লব" নামটি ছড়িয়ে পড়ে।
২১ জুলাই	আদালত রায় সংশোধন করে কোটা ৩০% থেকে কমিয়ে ৫% নির্ধারণ করে
২৫ জুলাই	প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের দাবিতে লক্ষ লক্ষ মানুষের অংশগ্রহণে মিছিল হয়

- **শেখ হাসিনার পলায়ন ও সরকারের পতন**
 - শেখ হাসিনা সরকার এই আন্দোলনকে "ষড়যন্ত্র" এবং "বিদেশি চক্রান্ত" বলেও আখ্যা দেয়।
 - সরকার পুলিশ, র‍্যাব ও বিজিবি দিয়ে দমন নীতিতে যায়, এতে আরও মৃত্যু ও সহিংসতা ঘটে।
- **পতনের চূড়ান্ত ধাপ:**

তারিখ	ঘটনা
-------	------

১৮-২৪ জুলাই	ইন্টারনেট শাটডাউন/Internet blackout শুরু হয়। ১৮ জুলাই থেকে মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ, ব্রডব্যান্ড কিছু ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয়। সেনাবাহিনী নিরপেক্ষ অবস্থানে যায়।
২০-৩১ জুলাই	আন্দোলন অব্যাহত থাকে শিক্ষার্থী, নাগরিক, সামাজিক অংশগ্রহণ বাড়ে; "quota reform" আন্দোলন একটি বৃহত্তর গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়।
৪ আগস্ট	বিকল্পভাবে আন্দোলন আরও চরমে পৌঁছায়; ইন্টারনেট ও মোবাইল ডেটা/4G-নেটওয়ার্কে শিথিলতা ও বাধার ঘটনা হয়।
৫ আগস্ট ২০২৪	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পদত্যাগ করেন এবং দেশ থেকে পলায়ন করেন।
৮ আগস্ট ২০২৪	Chief Adviser of the interim government ('ইন্টারিম প্রধানমন্ত্রী' বা 'অস্থায়ী সরকার প্রধান) হিসেবে ড. মোহাম্মাদ ইউনুছ এর শপদ গ্রহণ।

❖ বাংলাদেশে বিরোধী দলের ভূমিকা

➤ সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা:

- সরকারের নীতি ও কর্মকাণ্ডের সমালোচনা ও বিশ্লেষণ
- সংসদে নিজস্ব মত ও বক্তব্য উপস্থাপন
- জনগণের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা
- সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ
- আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ
- গণতন্ত্র ও নাগরিক অধিকার রক্ষার সোচ্চার থাকা

➤ কার্যক্রম ও আন্দোলন:

- রাজনৈতিক কর্মসূচি (হরতাল, বিক্ষোভ, মানববন্ধন)
- নির্বাচন সংশ্লিষ্ট দাবিদাওয়া (যেমন: তত্ত্বাবধায়ক সরকার দাবি)
- দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন
- মানবাধিকার ও বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতার দাবি

➤ সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ:

- সংসদে হাজিরার প্রবণতা
- সহিংস ও ধ্বংসাত্মক আন্দোলন
- গঠনমূলক বিকল্প না দেওয়া
- দলীয় ও ব্যক্তি স্বার্থের রাজনীতি
- আর্থিকভাবে নেতাকর্মীদের সেনাবাহবর্তি

➤ ইতিবাচক দিক:

- স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব
- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা
- জনমত গঠনে ভূমিকা
- সরকারের দমননীতির প্রতিবাদে সোচ্চারতা

❖ সর্বাধিক ২০০ টি MCQ

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সিস্টেম তত্ত্বের জনক কে?

- A) কার্ল মার্কস B) আর্নল্ড টয়েনবি
C) গ্যাব্রিয়েল অ্যালমন্ড D) ডেভিড ইস্টন

উত্তর: D) ডেভিড ইস্টন

ব্যাখ্যা: ডেভিড ইস্টন (David Easton) রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সিস্টেম তত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা হিসেবে পরিচিত।

২. Who said that 'Political science begins and ends with the state'? ("রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্র দিয়েই শুরু হয় এবং রাষ্ট্রেই শেষ হয়।" এটি কে বলেছিলেন?)

- ক Professor J. W. Garner
খ) H. D. Lasswell
গ) David Easton
ঘ) Professor R. G. Gettel

উত্তর: Professor J. W. Garner

৩. What is the main subject-matter of political science? (রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় কোনটি?)

- ক। Economy and Society (অর্থনীতি ও সমাজ)
খ। Religion and Culture (ধর্ম ও সংস্কৃতি)
গ। Politics, State and Government (রাজনীতি, রাষ্ট্র ও সরকার)
ঘ। History and Geography (ইতিহাস ও ভূগোল)

উত্তর:

৪. How many elements of a state are there? (রাষ্ট্রের উপাদান কয়টি?)

- ক ১ খ) ২
গ) ৩ ঘ ৪

উত্তর: ঘ) ৪

রাষ্ট্রের চারটি মৌলিক উপাদান রয়েছে: জনসমষ্টি, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, সরকার এবং সার্বভৌমত্ব।

৫. Who is the source of power in Democracy? (গণতন্ত্রে ক্ষমতার উৎস কে?)

- ক) King (রাজা)
(খ) Prime Minister (প্রধানমন্ত্রী)
(গ) President (রাষ্ট্রপতি)
ঘ) People (জনগণ)

উত্তর: People (জনগণ)

৬. Which one of the following is not the method of direct democracy? (নিম্নলিখিত কোনটি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পদ্ধতি নয়?)

- ক) Plebiscites (জনগণের ভোট)
(খ) Referendum (গণভোট)
গ) Initiatives (উদ্যোগ)
ঘ) Political parties (রাজনৈতিক দল)

উত্তর:) Political parties (রাজনৈতিক দল)

৭. Which of the following is not organs of the state? (নিচের কোনটি সরকারের অঙ্গ নয়)

- ক The Legislature (আইন বিভাগ)
(খ) The Executive (শাসন বিভাগ)
গ) The Judiciary (বিচার বিভাগ)
ঘ) The Election Commission (নির্বাচন কমিশন)
উত্তর:) The Election Commission (নির্বাচন কমিশন)

৮. Which country uses proportional representation in their national elections? (কোন দেশ জাতীয় নির্বাচনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব চালু রেখেছে?)

- ক) USA (যুক্তরাষ্ট্র)
(খ) UK (যুক্তরাজ্য)
(গ) Bangladesh (বাংলাদেশ)
ঘ) Germany (জার্মানী)

উত্তর: ঘ) Germany (জার্মানী)

৯. Who is the father of Ideal Bureaucracy? (আদর্শ আমলাতন্ত্রের জনক কে?)

- (ক) Laski (লাস্কি)
খ) De Gournay (ডি গোর্নে)
(গ) Finer (ফাইনার)

ঘ Max Weber (ম্যাক্স ওয়েবার)

উত্তর: Max Weber (ম্যাক্স ওয়েবার)

১০. Who is considered the father of Elite Theory? (এলিট তত্ত্বের জনক কে?)

- ক) Max Weber (ম্যাক্স ওয়েবার)
খ) Karl Marx (কার্ল মার্ক্স)
গ) Vilfredo Pareto (ভিলফ্রেডো পারেটো)
(ঘ) John Locke (জন লক)

উত্তর: গ) Vilfredo Pareto (ভিলফ্রেডো পারেটো)

১১. The principle of "Checks and Balances" is closely related to- ("নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য" নীতি কোন বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত?)

- ক) Parliamentary sovereignty (সংসদীয় সার্বভৌমত্ব)
 খ) Separation of power (ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ)
 গ) Federalism (যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা)
 ঘ) Rule of law (আইনের শাসন)
 উত্তর: ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ

১২. প্লেটোর দার্শনিক বিদ্যালয়ের নাম কী ছিল?

- (ক) The Lyceum (খ) The Academy
 গ) The Stoa (ঘ) The Cynic School
 উত্তর: The Academy

১৩.) The idea that "Virtue is knowledge" is attributed to:

- (ক) Plato (খ) Aristotle
 (গ) Socrates (ঘ) Sophists
 উত্তর: Socrates

১৪. প্লেটো শিক্ষক ছিলেন

- ক) Socrates (খ) Aristotle
 গ) Alexander (ঘ) Hippocrates
 উত্তর: খ) Aristotle

১৫. ভারতের ম্যাকিয়াভেলি বলা হয় কাকে?

- (ক) Krittibas Ojha (খ) Chandragupta
 গ) Kautilya (ঘ) All of them
 উত্তর: গ) Kautilya

১৬. ইবনে খালদুনের 'আসাবিয়া' তত্ত্ব হলো-

- ক) Clash in society (সমাজের সংঘাত)
 খ) Social solidarity (সামাজিক সংহতি)
 গ) Group cohesion (গোষ্ঠীগত ঐক্য)
 ঘ) both b & c
 উত্তর: ঘ) both b & c

১৭. (এরিস্টটলের 'পলিটিক্স' গ্রন্থটির মূল বিষয় হলো-)

- ক) State organisation (রাষ্ট্র সংগঠন)
 খ) Personal ethics (ব্যক্তিগত নৈতিকতা)
 গ) Warfare (যুদ্ধবিগ্রহ)
 ঘ) Religion (ধর্ম)
 উত্তর: State organisation (রাষ্ট্র সংগঠন)

১৮. (কত সালে গণপ্রজাতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠিত হয়?)

- ক) 1947 (খ) 1949

গ) 1959 (ঘ) 1921

উত্তর: 1949

১৯. 'ক্ষমতার উৎস হলো বন্দুকের নল।' উক্তিটি কার?

- ক) Mao Zedong (মাও সেতুং)
 খ) Vladimir Lenin (ভ্লাদিমির লেনিন)
 গ) Karl Marx (কার্ল মার্ক্স)
 ঘ) Joseph Stalin (জোসেফ স্টালিন)
 উত্তর: Mao Zedong (মাও সেতুং)

২০. হবসের তত্ত্বে সামাজিক চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য কী?

- ক) To maximize personal freedoms only (কেবল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করা)
 খ) To create moral perfection (নৈতিক পরিপূর্ণতা সৃষ্টি)
 গ) To abolish sovereignty (সার্বভৌমত্ব বাতিল করা)
 ঘ) To ensure security and peace (নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা)
 উত্তর: To ensure security and peace (নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করা)

২১. Who is the founder of System Analysis Theory?

- (সিস্টেম বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রবক্তা কে?)
 ক) MaX Waber (খ) Gabriel Almond
 গ) David Easton (ঘ) Karl Marx
 উত্তর: গ) David Easton

২২. System Analysis থিওরি-তে "Subsystem" শব্দটি কী বোঝায়?

- (ক) The entire Government (পুরো সরকার)
 (খ) External influence (বাহ্যিক প্রভাবক)
 গ) The Election Commission or a topic-specific unit/block (নির্বাচনী কমিশন বা বিশেষ বিষয় ভিত্তিক ব্লক)
 ঘ) Historical context (ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট)
 উত্তর: The Election Commission or a topic-specific unit/block (নির্বাচনী কমিশন বা বিশেষ বিষয় ভিত্তিক ব্লক)

২৩. নিম্নলিখিত কোনটি এলিট তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক?

ক) Real power is with voters (আসল ক্ষমতা ভোটারদের হাতে রয়েছে)

খ) People are the real sovereign (জনগণই প্রকৃত সার্বভৌম)

গ) Judiciary is real power in state (বিচার বিভাগই রাষ্ট্রে আসল ক্ষমতা ধারণ করে)

ঘ) Minor group holds power (সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ক্ষমতা ধারণ করে)

উত্তর: Minor group holds power (সংখ্যালঘু গোষ্ঠী ক্ষমতা ধারণ করে)

২৪. ডেভিড ট্রুম্যানের মতে, রাজনীতি হচ্ছে-

ক) A process of interaction among groups seeking to influence government (সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার একটি প্রক্রিয়া)

খ) Solely the rule of the majority (কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসন)

গ) A class struggle between bourgeoisie and proletariat (বুজোয়া ও প্রলেতারিয়েতের মধ্যে শ্রেণি সংগ্রাম)

ঘ) A moral activity above society (সমাজের উপরে একটি নৈতিক কার্যকলাপ)

উত্তর: সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে চাওয়া বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়ার একটি প্রক্রিয়া)

২৫. Role conflict occurs when- (ভূমিকা দ্বন্দ্ব ঘটে যখন-)

ক) An individual faces conflicting expectations from multiple roles (একজন ব্যক্তি একাধিক ভূমিকায় বিপরীত প্রত্যাশার সম্মুখীন হয়)

খ) A political party dissolves (একটি রাজনৈতিক দল ভেঙে যায়)

গ) There is an economic crisis (অর্থনৈতিক সংকট ঘটে)

ঘ) Parliament is dissolved (সংসদ ভেঙে দেওয়া হয়)

উত্তর: একজন ব্যক্তি একাধিক ভূমিকায় বিপরীত প্রত্যাশার সম্মুখীন হয়

২৬. সংঘাত তত্ত্ব মূলত সম্পর্কিত

ক) Max Weber

খ) Karl Marx

গ) Emile Durkheim

ঘ) Talcott Parsons

উত্তর: কার্ল মার্ক্স

২৭. Game of Chicken প্রায়ই কোন পরিস্থিতি মডেল করতে ব্যবহৃত হয়-

ক) Cooperative teamwork (সহযোগী টিমওয়ার্ক)

খ) Legal disputes (আইনি বিরোধ)

(গ) Market equilibrium (বাজারের সমতা)

ঘ) Strategic conflicts and brinkmanship (কৌশলগত সংঘাত এবং সীমারেখার কৌশল)

উত্তর: কৌশলগত সংঘাত এবং সীমারেখার কৌশল)

২৮. সমাজ বিশ্লেষণে নব্য-মার্কসবাদে কোন ধারণা কেন্দ্রীয়?

ক। Collective unconscious (সমষ্টিগত অবচেতন)

খ। Electoral competition (নির্বাচনী প্রতিযোগিতা)

গ। Hegemony (আধিপত্য)

ঘ। Separation of powers (ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ)

উত্তর: আধিপত্য

২৯. Principles of Public Administration'

গ্রন্থের লেখক কে?

(ক) Max Weber

(খ) W. F. Willoughby

গ) F. W. Riggs

(ঘ) F. W. Goodnow

উত্তর: ঘ) W. F. Willoughby

৩০. লোক প্রশাসনের জনক কে?

(ক) Thomas Laviathan

খ) L. D. White

গ) Woodrow Wilson

ঘ) F. W. Taylor

উত্তর: Woodrow Wilson

৩১. লোকপ্রশাসনে POSDCORB এর পূর্ণরূপ কী?

ক) Directing, Controlling, Reporting, Budgeting, Predicting, Organizing, Staffing,

(খ) Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting, Organizing, Staffing,

(গ) Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting

ঘ) Organizing, Staffing, Delegating, Coordinating, Reporting, Budgeting

উত্তর: Planning, Organizing,

Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting

৩২. সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনের মূল পার্থক্য-

- ক) Profit motive (লাভের উদ্দেশ্য)
- খ) Public Accountability (জনজবাবদিহিতা)
- গ) Nature of functions (কর্ম প্রকৃতি)
- ঘ) All of the above (উপরের সবগুলোই)

উত্তর: ঘ। সবগুলোই

৩৩. জনপ্রশাসন বলতে বুঝায়-

- ক Private sector management (বেসরকারি খাত ব্যবস্থাপনা)
- খ) implementation of public policies (সরকারি নীতি বাস্তবায়ন)
- গ) cooperate government (সরকারকে সহযোগিতা)
- ঘ) All of these (সবগুলোই)

উত্তর: সরকারি নীতি বাস্তবায়ন

৩৪. The 4Ps Theory of Departmentalization as advocated by Luther Gulick are-

- (ক) Purpose, process, plan, place
- (খ) Place, person, programme, process
- (গ) Purpose, process, place, programme
- ঘ Purpose, process, person, place

উত্তর: Purpose, process, person, place

৩৫. ইলেক্টোরাল কলেজের মাধ্যমে কে নির্বাচিত হন?

(Who is elected through the Electoral College?)

(ক) যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী

খ যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী

গ) চীনের প্রধানমন্ত্রী

ঘ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

উত্তর: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

৩৬. সিনেটের সদস্যসংখ্যা কত?

- ক) ১০০
- খ) ২০০
- গ) ৪০০
- ঘ) ৪৩৫

উত্তর: ১০০

৩৭. The first President of the Chinese Republic was-

- (ক) Manchu
- (খ) Tae Ping
- (গ) Mao Zedong
- ঘ Dr. Sun Yat Sen

উত্তর: Dr. Sun Yat Sen

৩৮. What is the political system in China regarding the number of political parties?

- (ক) Two party system
- (খ) Single party system
- (গ) Multiparty system
- ঘ) Non partisan system

উত্তর: Single party system

৩৯. জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন-

- (ক) জনগণের সরাসরি ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে
- (খ) সুপ্রিম কোর্টের ভোটে
- (গ) সম্রাট দ্বারা মনোনীত
- (ঘ) ডায়েটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে

উত্তর: ডায়েটের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে

৪০. The "One country, two systems" policy applies to which regions?

- (ক) Taiwan and Tibet
- (খ) Hong Kong and Macau
- (গ) Tibet and Xinjiang
- ঘ Beijing and Shanghai

উত্তর: Hong Kong and Macau

৪১. The Chinese State Council is equivalent to which of the following?

- (ক) The Parliament
- (খ) The Executive Cabinet
- গ) The Supreme Court
- (ঘ) The Central Bank

উত্তর: The Executive Cabinet

৪২. বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি হলো

- (ক) Friendship with major powers only (কেবলমাত্র প্রধান শক্তির সাথে বন্ধুত্ব)
- খ। Friendship to all, malice towards none (সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়)

গ। Alliance with neighboring countries গ (প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে জোট গঠন)

ঘ। Support for Cold War blocs (ঠান্ডা যুদ্ধকালীন ব্লক রাজনীতিকে সমর্থন)

উত্তর: সবার সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়

৪৩. ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশকে প্রথম কোন দেশ স্বীকৃতি দেয়?

- (ক) USA (যুক্তরাষ্ট্র)
- (খ) India (ভারত)

(গ) China (চীন) ঘ USSR (সোভিয়েত ইউনিয়ন)
 উত্তর: ভারত

৪৪. আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশের ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হলো-)

(ক) Territorial expansion (ভূ-সম্পদের সম্প্রসারণ)
 খ) Forming military alliances (সামরিক জোট গঠন)
 গ) Isolation from international law (আন্তর্জাতিক আইন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা)
 ঘ) Strengthening global peace and security (বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করা)
 উত্তর: বৈশ্বিক শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করা

৪৫. বাংলাদেশে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের প্রথম ধাপ কী?)

(ক) Parliamentary approval (সংসদ অনুমোদন)
 খ) International negotiation (আন্তর্জাতিক আলোচনা)
 গ) Policy implementation (নীতি বাস্তবায়ন)
 ঘ) Policy formulation (নীতি প্রণয়ন)
 উত্তর: Policy formulation (নীতি প্রণয়ন)

৪৬. The Prince গ্রন্থের লেখক কে?

(ক) হবস (খ) লক
 (গ) রুশো (ঘ) ম্যাকিয়াভেলি
 উত্তর: ম্যাকিয়াভেলি

৪৭. এরিস্টটলের বিখ্যাত গ্রন্থ-

ক। দ্য প্রিন্স খ। দ্য পলিটিক্স
 গ। দ্য রিপাবলিক ঘ। আর্ট অব ওয়ার
 উত্তর: দ্য প্রিন্স

৪৮. প্লেটোর মতে সমাজের কয়টি শ্রেণি ছিল?

ক। ২টি খ। ৩টি
 গ। ৪টি ঘ। ৫টি
 উত্তর: ৩টি।

৪৯. অর্থশাস্ত্রে কৌটিল্য কয়টি রাষ্ট্রীয় উপাদানের কথা উল্লেখ করেন?

ক। ৩ খ। ৪
 গ। ৫ ঘ। ৭
 উত্তর-৭টি। রাজা, মন্ত্রী, দেশ, দুর্গ, কোষাগার, সেনা, মিত্র

৫০. বাংলাদেশের দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদের প্রতি পররাষ্ট্রনীতি মূলত কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেয়?)

ক Military dominance (সামরিক আধিপত্য)
 খ Peace, trade, and cooperation (শান্তি, বাণিজ্য এবং সহযোগিতা)
 (গ) Colonization (উপনিবেশ স্থাপন)
 ঘ। Cultural supremacy (সাংস্কৃতিক আধিপত্য)
 উত্তর: শান্তি, বাণিজ্য এবং সহযোগিতা)

৫১. যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে হলে ন্যূনতম কত ইলেক্টোরাল ভোটের প্রয়োজন?

ক. ২৭২ খ. ২৭০
 গ. ২৭১ ঘ. ২৬৮
 উত্তর: ২৭০

৫২. বাংলাদেশ-EU বাণিজ্য সম্পর্কের একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো-)

ক Climate change (জলবায়ু পরিবর্তন)
 খ Space technology (মহাকাশ প্রযুক্তি)
 গ Compliance with labor and human rights standards (শ্রমিক ও মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি)
 (ঘ) Colonization (উপনিবেশ স্থাপন)
 উত্তর: শ্রমিক ও মানবাধিকার মানদণ্ডের সাথে সঙ্গতি)

৫৩. বাংলাদেশের OIC-এর সদস্যপদ প্রধানত কী কাজে সহায়তা করে?)

ক Colonization (উপনিবেশ স্থাপন)
 খ Economic, cultural, and political cooperation (অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা)
 গ) Space exploration (মহাকাশ গবেষণা)
 ঘ Military conquest (সামরিক বিজয়)
 উত্তর: অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সহযোগিতা

৫৪. বাংলাদেশের প্রথম UN শান্তি রক্ষা মিশনে অবদান ছিল

ক) ১৯৭৩ খ) ১৯৭১
 গ) ১৯৮০ ঘ) ১৯৮৫
 উত্তর: ১৯৭৩

খ জেনারেল আইয়ুব খান

গ) চৌধুরী মোহাম্মদ আলী

ঘ) কেউই নয়

উত্তর: জেনারেল আইয়ুব খান

৬৬. ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় পরিষদের

মোট কয়টি আসনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়?

ক) ২০০

খ) ২৩৭

গ) ৩০৯

ঘ) ৩১৩

৬৭. ১৯৬২ সালের সংবিধানে কোনটি গুরুত্ব পায়?

(ক) স্থানীয় সরকারের ক্ষমতা

খ) সংসদের ক্ষমতা

গ) বিচার বিভাগের ক্ষমতা

(ঘ) রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

উত্তর: রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা

৬৮. প্লেটোর মতে একটি আদর্শ রাষ্ট্রে যে চারটি

মৌলিক (cardinal) গুণ থাকা উচিত, সেগুলো কী?)

ক Knowledge, Honour, Pleasures, Philosophers (জ্ঞান, সম্মান, ভোগ, দার্শনিক)

খ। Justice, Spirit, Appetite, Reason

(ন্যায়বিচার, আত্মা (স্পিরিট), আকাঙ্ক্ষা (প্রবৃত্তি), যুক্তি)

(গ) Temperance, Courage, Wisdom, Justice

(আত্মসংযম, সাহস, প্রজ্ঞা (জ্ঞান), ন্যায়বিচার)

ঘ। Wisdom, Courage, Control, Justice (জ্ঞান, সাহস, নিয়ন্ত্রণ, ন্যায়বিচার)

উত্তর: আত্মসংযম, সাহস, প্রজ্ঞা (জ্ঞান), ন্যায়বিচার

৬৯. প্লেটোর মতে যোদ্ধা শ্রেণির মূল বৈশিষ্ট্য-

(ক) Wisdom (প্রজ্ঞা)

(খ) Courage (সাহস)

গ Appetite (প্রবৃত্তি)

(ঘ) None of these (কোনোটিই নয়)

উত্তর : সাহস

৭০. আল-মুকাদ্দিমার কোন অধ্যায়টি 'The Prince'

নামক গ্রন্থের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. প্রথম

খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয়

ঘ. চতুর্থ

উত্তর: তৃতীয়

৭১. ইবনে খালদুনের আলোচিত সমাজবিজ্ঞানের

কেন্দ্রবিন্দু কোনটি?

ক. আল আসাবিয়া

খ. রক্ত সম্পর্ক

গ. পারিবারিক ঐতিহ্য

ঘ. রাজনৈতিক আদর্শ

উত্তর: আল আসাবিয়া

৭২. সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা কোনটি?

ক। এক নায়কতন্ত্র খ। পলিটি

গ। গণতন্ত্র

ঘ। অভিজাততন্ত্র

উত্তর: গণতন্ত্র

৭৩. রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাতে শাসন বিভাগের প্রধান কে?

ক) রাষ্ট্রপতি

খ) প্রধানমন্ত্রী

গ) স্পীকার

ঘ) কোনটিই নয়

উত্তর: রাষ্ট্রপতি

৭৪. আইন প্রণয়ন কার কাজ?

ক) রাষ্ট্রপতি

খ) আইনসভা

গ) বিচার বিভাগ

ঘ) সামরিক বাহিনী

উত্তর: আইনসভা

৭৫. রাষ্ট্রপতির পদচ্যুতি কীভাবে হয়?

ক। আদালতের রায়

খ। জনগণের দাবি

গ। অভিশংসন

ঘ। মৃত্যু

উত্তর: অভিশংসন

৭৬. আধুনিক ফেডারেলিজমের প্রধান প্রবণতা কী?

ক. সহযোগী ফেডারেলিজম খ. একনায়কতন্ত্র

গ। সামরিক প্রভাব

ঘ. ধর্মীয় প্রভাব

উত্তর: সহযোগী ফেডারেলিজম

৭৭. কোন নতুন বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ যুক্ত হয়েছে?

ক. জলবায়ু পরিবর্তন

খ. রাজতন্ত্র

গ. সামরিকবাদ

ঘ. ধর্মীয় দ্বন্দ্ব

উত্তর: জলবায়ু পরিবর্তন

৭৮. বিশ্বায়নের প্রভাবে কী বৃদ্ধি পেয়েছে?

ক. বিকেন্দ্রীকরণ

খ। কেন্দ্রীয়করণ

গ। সামরিক

ঘ। কোনোটিই নয়

উত্তর: বিকেন্দ্রীকরণ

৭৯. অর্থশাস্ত্র আবিষ্কার করেন কে?

ক) আর্থার শেলোম্যান

খ) ম্যাক্স মুলার

গ) পাণিনি

ঘ) জেমস মিল

উত্তর: আর্থার শেলোম্যান

৮০. কৌটিল্যের মতে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য কী?

ক) যুদ্ধ জয়

খ। নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি

গ) ধর্ম প্রচার

ঘ) বিলাসিতা

উত্তর: নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি

৮১. কনফুসিয়াস কোন দেশের দার্শনিক?

৯৭. সার্বভৌম রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ক্ষমতা- কে বলেছেন?

- ক। উইলোবি খ। ব্ল্যাকস্টোন
গ। বোদা ঘ। কেউই নয়।

উত্তর। উইলোবি

৯৮. অধ্যাপক হল্যান্ডের মতে আইন কত প্রকার?

- ক। ২ প্রকার খ। ৫ প্রকার
গ। ৭ প্রকার ঘ। ৯ প্রকার

উত্তর: ২ প্রকার

৯৯. আইনের ইংরেজি প্রতিশব্দ Law এটি এসেছে-

- ক। গ্রিক শব্দ থেকে খ। জার্মান শব্দ
গ। টিউটনিক শব্দ ঘ। সংস্কৃত শব্দ

উত্তর: টিউটনিক শব্দ

১০০. . 'Voice of the people is the voice of God'- উক্তিটি কে বলেছেন?

- ক। রুশো
খ। মন্টেস্কু
গ. আব্রাহাম লিংকন
ঘ. গার্নার

উত্তর: জ্যাঁ জ্যাক রুশো

মডেল ২

১. Who is called the father of political science? (রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক বলা হয় কাকে?)

- ক) Socrates (সক্রেটিস) খ) Plato (প্লেটো)
গ) Aristotle (এরিস্টটল) ঘ) Aquinas (একুইনাস)

উত্তর: Aristotle (এরিস্টটল)

এরিস্টটল প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক ছিলেন এবং তিনিই প্রথম রাষ্ট্র, সরকার এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার গঠন ও কার্যাবলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

২. সিস্টেম তত্ত্বের মূল ধারণা কী?

- A) রাষ্ট্র একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়
B) ক্ষমতা সমাজের একটি কেন্দ্রবিন্দু
C) একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে তার পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে
D) রাষ্ট্রের উৎপত্তির কারণ

উত্তর: C) একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে তার পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে

ব্যাখ্যা: সিস্টেম তত্ত্ব একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে তার পরিবেশ থেকে 'ইনপুট' গ্রহণ করে এবং 'আউটপুট' তৈরি করে, তা বিশ্লেষণ করে।

৩. In which method has the constitution of Bangladesh been formulated? (কোন পদ্ধতিতে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে?)

- ক Ratification (অনুমোদন)
খ) Constituent Assembly (গণপরিষদ)
গ) Evolution (বিবর্তন)
ঘ) Revolution (বিপ্লব)

উত্তর খ) Constituent Assembly (গণপরিষদ)

বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত হয়।

৪. Which country has an unwritten constitution? (কোন রাষ্ট্রে অলিখিত সংবিধান?)

- (ক) India (ভারত) খ) USA (যুক্তরাষ্ট্র)
(গ) UK (যুক্তরাজ্য) ঘ) Bangladesh (বাংলাদেশ)
উত্তর: গ) UK (যুক্তরাজ্য)

ভারত, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশে লিখিত সংবিধান রয়েছে

৫. According to Aristotle, what is the best practicable form of government? (এরিস্টটলের মতে, সর্বাধিক কার্যকর সরকারব্যবস্থা কোনটি?)

- ক) Monarchy (রাজতন্ত্র) খ) Tyranny (স্বৈরতন্ত্র)
গ) Aristocracy (অভিজাততন্ত্র)
ঘ) Polity (পলিটি)

উত্তর:) Polity (পলিটি)

এরিস্টটলের মতে এরিস্টটলের মতে- পলিটি সর্বোত্তম, এবং গণতন্ত্র নিকৃষ্ট ধরনের সরকার।

৬. A semi-presidential regime is- (আর্ধ-রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারব্যবস্থা হলো-)

ক) dual executive between president and prime minister. (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দ্বৈত নির্বাহী)

খ) power sharing between president and vice president. (রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি)

গ) semi-democratic regime with elected parliament. (আংশিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা)

ঘ) vice president as president of the senate (উপরাষ্ট্রপতি সিনেটের প্রধান)

উত্তর: ক) dual executive between president and prime minister. (রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর দ্বৈত নির্বাহী)

অর্ধ-রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার বলতে এমন একটি শাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী উভয়ই সরকার পরিচালনায় অংশ নেন।

৭. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির প্রধান দার্শনিক কে?

ক) Aristotle (এরিস্টটল)

খ) Rousseau (রুশো)

গ) Montesquieu (মন্টেস্কু)

ঘ) Locke (লক)

উত্তর: Montesquieu (মন্টেস্কু)

৮. Electorate means- (নির্বাচকমন্ডলী হচ্ছে-)

ক) Elected Representatives (নির্বাচিত ক প্রতিনিধি)

খ) Election Commission (নির্বাচন কমিশন)

গ) Citizens who are eligible to vote (ভোট গ দেয়ার জন্য যোগ্য নাগরিক)

ঘ) Political party in power (ক্ষমতাশীল রাজনৈতিক দল)

উত্তর: Citizens who are eligible to vote (ভোট গ দেয়ার জন্য যোগ্য নাগরিক)

৯. নিম্নের কোনটি একটি রাজনৈতিক দলকে

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী থেকে আলাদা করে?

(ক) রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে চায়;

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নীতি প্রভাবিত করে

খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে; দল করে না

গ) উভয়ই অরাজনৈতিক সংগঠন

ঘ) দল কখনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে না

উত্তর: রাজনৈতিক দল সরকার গঠন করতে চায়;

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী নীতি প্রভাবিত করে

১০. দ্বি-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে কোন দেশে?

ক) Bangladesh (বাংলাদেশ)

খ) India (ভারত)

গ) Pakistan (পাকিস্তান)

ঘ) USA (যুক্তরাষ্ট্র)

উত্তর: যুক্তরাষ্ট্র

১১. প্লেটো বিশ্বাস করতেন সত্য অবশ্যই হওয়া

উচিত।)

(ক) universal and eternal (সার্বজনীন ও চিরন্তন)

খ) revealed by which works (যেসব কর্মের মাধ্যমে প্রকাশ পায়)

গ) based on particular facts and perspectives (নির্দিষ্ট তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে)

ঘ) shown in rigorous logical proofs (কঠোর যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের সাহায্যে)

উত্তর: কঠোর যুক্তিসঙ্গত প্রমাণের সাহায্যে

১২. প্লেটোর 'সিম্পোজিয়াম'-এর প্রধান বিষয় কী?

ক) Justice (ন্যায়বিচার)

খ) Love (ভালোবাসা)

গ) Knowledge (জ্ঞান)

ঘ) Politics (রাজনীতি)

উত্তর: খ) ভালোবাসা

১৩. কনফুসিয়াসের মতে, শাসনের ভিত্তি কোনটি?

ক) Morality (নৈতিকতা)

খ) Economy (অর্থনীতি)

গ) Military (সামরিক শক্তি)

ঘ) Religion (ধর্ম)

উত্তর: Morality (নৈতিকতা)

১৪. নিচের কোন গ্রন্থটি ইবনে খালদুনের নয়?

ক) Kitab-al-Ibar

খ) Muqaddima

গ) History of Berbers

ঘ) Siyasat namah

উত্তর: Siyasat namah

১৫. আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) Divine power (ঐশ্বরিক ক্ষমতা)

খ) Traditional custom (প্রথাগত রীতি)

গ) Sovereignty (সার্বভৌমত্ব)

ঘ) Monarchy (রাজতন্ত্র)

উত্তর: Sovereignty (সার্বভৌমত্ব)

১৬. হবসের মতে, প্রাকৃতিক অবস্থায় জীবন কেমন?

ক) Solitary, poor, nasty, brutish, and short (একাকী, দরিদ্র, কুটিল, নিষ্ঠুর এবং সংক্ষিপ্ত)

খ) Peaceful and harmonious (শান্তিপূর্ণ ও সমন্বিত)

গ) Governed by justice and equality (ন্যায় ও সমতার দ্বারা শাসিত)

ঘ) Based on natural laws alone (শুধুমাত্র

প্রাকৃতিক আইনের উপর নির্ভরশীল)

উত্তর: ক) Solitary, poor, nasty, brutish, and short (একাকী, দরিদ্র, কুটিল, নির্ভর এবং সংক্ষিপ্ত)

১৭. শ্রেণি সংগ্রাম তত্ত্বের প্রধান প্রবক্তা কে?)

ক Max Weber (ম্যাক্স ওয়েবার)

(খ) Karl Marx (কার্ল মার্ক্স)

গ) Emile Durkheim (এমিলি ডুর্খাইম)

(ঘ) John Locke (জন লক)

উত্তর: Karl Marx (কার্ল মার্ক্স)

১৮. নিচের কোনটি ম্যাকিয়াভেলির নীতি?)

ক) The ends justify the means (লক্ষ্য মাধ্যমের যৌক্তিকতা বিধান করে)

(খ) Life, liberty, and property (জীবন, স্বাধীনতা, সম্পত্তি)

গ) Separation of powers (ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ)

ঘ) Class struggle (শ্রেণি সংগ্রাম)

উত্তর: The ends justify the means (লক্ষ্য মাধ্যমের যৌক্তিকতা বিধান করে)

১৯. সিস্টেম এনালিসিস থিওরি কোনটির উপর গুরুত্ব দেয় না?)

ক System dynamics (সিস্টেমের গতিশীলতা)

(খ) Individual behaviour (ব্যক্তিগত আচরণ)

(গ) Feedback (ফিডব্যাক)

ঘ) Environment (পরিবেশ)

উত্তর: Individual behaviour (ব্যক্তিগত আচরণ)

২০. রাজনৈতিক নিয়োগ কোন ধরনের কার্যকলাপ?)

ক Input (ইনপুট)

(খ) Output (আউটপুট)

(গ) Feedback (প্রতিক্রিয়া)

ঘ) Environment (পরিবেশ)

উত্তর: ইনপুট

২১. এলিট তত্ত্ব গুরুত্ব দেয়-

(ক) Distribution of power (ক্ষমতার বণ্টন)

(খ) Participation of people (জনগণের অংশগ্রহণ)

গ) Class conflict (শ্রেণী সংঘাত)

ঘ) System analysis (ব্যবস্থা বিশ্লেষণ)

উত্তর: ক) Distribution of power (ক্ষমতার বণ্টন)

২২. ভূমিকা তত্ত্বের বিকাশের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যুক্ত কোন চিন্তাবিদ?)

ক Gabriel Almond (গ্যাব্রিয়েল আলমন্ড)

খ Talcott Parsons (ট্যালকট পার্সন্স)

গ) David Easton (ডেভিড ইস্টন)

(ঘ) Karl Marx (কার্ল মার্ক্স)

উত্তর: গ্যাব্রিয়েল আলমন্ড)

২৩. ক্রীড়া তত্ত্বের "Zero-Sum Game" বলতে বোঝায়-

ক One player's gain is exactly equal to the other player's loss (একজন খেলোয়াড়ের লাভ অন্য খেলোয়াড়ের ক্ষতির সমান)

খ All players gain equally (সব খেলোয়াড় সমানভাবে লাভ করে)

গ All players lose equally (সব খেলোয়াড় সমানভাবে ক্ষতি করে)

(ঘ) No player gains or loses (কোনো খেলোয়াড় লাভ বা ক্ষতি করে না)

উত্তর: একজন খেলোয়াড়ের লাভ অন্য খেলোয়াড়ের ক্ষতির সমান

২৪. নব্য-মার্ক্সবাদী তত্ত্ব মূলত কী ওপর গুরুত্ব দেয়?)

ক Only economic factors (শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণ)

খ Religious authority (ধর্মীয় কর্তৃত্ব)

গ Military power (সামরিক শক্তি)

ঘ Economic factors, culture, ideology, and political institutions (অর্থনীতি, সংস্কৃতি, আদর্শ এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান)

উত্তর: অর্থনীতি, সংস্কৃতি, আদর্শ এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান

২৫. নব লোক প্রশাসন সম্পর্কে কোনটি সত্য?)

ক carried out for the public interest (জনস্বার্থে পরিচালিত)

খ a market oriented (বাজারমুখী)

গ focuses on performance appraisal (কার্যদক্ষতার মূল্যায়নে গুরুত্ব দেয়)

ঘ supports managerial autonomy (পরিচালনাগত স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দেয়)

উত্তর: জনস্বার্থে পরিচালিত

২৬. How many principles of organization were propounded by Henry Fayol ?

ক) 5

খ) 9

গ) 14

ঘ) 21

উত্তর: ১৪

২৭. পিপিপি এর একটি উদাহরণ হলো-

ক Complete privatization (পরিপূর্ণ বেসরকারিকরণ)

খ Government outsourcing (সরকারি আউটসোর্সিং)

গ Collaboration between government and private sector for public service delivery (সরকারি সেবার জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়)

ঘ Government disengagement from) service delivery (সেবা প্রদানে সরকারের অনাগ্রহ)
উত্তর: সরকারি সেবার জন্য সরকারি ও বেসরকারি খাতের সমন্বয়)

২৮. মাসলোর 'চাহিদা সোপান তত্ত্ব'এর প্রথম ধাপটি কী?

ক Physiological needs such as food and shelter

(খ) Esteem needs such as self-respect

গ Safety needs such as security and stability

ঘ Self-actualization needs such as personal growth

উত্তর: Physiological needs such as food and shelter

২৯. আইনসভার উপর নির্ভর করতে হয় না-

ক ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী

খ) যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

(গ) চীনের প্রধানমন্ত্রী

ঘ) কেউই নয়

উত্তর: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট

৩০. আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি' কী?

ক। The President has total power over Congress and the Supreme Court. (কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্টের উপর রাষ্ট্রপতির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ)

খ। Congress and the Supreme Court can stop the President having too much power.(কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণ থেকে বাধা দিতে পারে)

গ। Congress and the Supreme Court have total power over the President. (কংগ্রেস গ এবং সুপ্রিম কোর্টের রাষ্ট্রপতির উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ)
ঘ None of these (কোনোটাই নয়)

উত্তর: কংগ্রেস এবং সুপ্রিম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে অতিরিক্ত ক্ষমতা গ্রহণ থেকে বাধা দিতে পারে)

৩১. The Electoral College in US comprises-

ক) 545 Electors

খ) 538 Electors

গ) 541 Electors

ঘ) 535 Electors

উত্তর: 538 Electors

৩২. কোন রাষ্ট্রপতি দুইবার অভিষিক্ত হন)

ক) Andrew Johnson

খ) Bill Clinton

গ) Richard Nixon

ঘ) Donald Trump

উত্তর: Donald Trump

৩৩. যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দশটি সংশোধনী কী নামে পরিচিত?

ক) বিল অব রাইটস

খ) ফেডারেল কোড

গ) ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট

ঘ) কনস্টিটিউশনাল এক্ট

উত্তর: বিল অব রাইটস

৩৪. পৃথিবীর সর্বোচ্চ শক্তিশালী দ্বিতীয় কক্ষের নাম কী?

ক) মার্কিন সিনেট

খ) ব্রিটেনের লর্ডসভা

গ) জাপানের ডায়েট

ঘ) সবগুলোই

উত্তর: মার্কিন সিনেট

৩৫. Which country is a pioneer in introducing the parliamentary system?

ক) France

খ) USA

গ) UK

ঘ) None of these

উত্তর: UK

৩৬. জাপানের সরকার পদ্ধতি-

ক) Absolute monarchy খ) Federal republic

(গ) Constitutional monarchy

ঘ) Communist state

উত্তর: Constitutional monarchy

৩৭. গণচীনের সর্বোচ্চ বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান কোনটি?

ক) National People's Congress

খ) State Council

গ) Supreme People's Court

ঘ) Polite bureau

উত্তর: Supreme People's Court

৩৮. (১৯৭১ সালে পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনের প্রধান কারণ কী ছিল?)

ক) Religious affinity (ধর্মীয় ঘনিষ্ঠতা)

খ) Pakistan's role in Cold War diplomacy (opening to China) (শীতল যুদ্ধকালীন কূটনীতিতে পাকিস্তানের ভূমিকা- চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন)

গ) Economic aid from Pakistan (পাকিস্তানের গ অর্থনৈতিক সহায়তা)

ঘ) Cultural ties (সাংস্কৃতিক সম্পর্ক)

উত্তর: শীতল যুদ্ধকালীন কূটনীতিতে পাকিস্তানের ভূমিকা- চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন

৩৯. মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানকে সমর্থন জানাতে কোন দেশ সশস্ত্র নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পাঠিয়েছিল?)

ক) USSR (সোভিয়েত ইউনিয়ন) খ) USA (যুক্তরাষ্ট্র)

গ) China (চীন) ঘ) UK (যুক্তরাজ্য)

উত্তর: USA

৪০. নিম্নের কোনটি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য?)

ক। Territorial expansion (ভূ-সম্পদের সম্প্রসারণ)

খ। Promoting peace, security, and development (শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন প্রচার)

গ। Military dominance (সামরিক প্রাধান্য)

ঘ। Cultural isolation (সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা)

উত্তর: শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন প্রচার)

৪১. প্লেটোর বিখ্যাত গ্রন্থ-

ক। দ্য প্রিন্স

খ। দ্য পলিটিক্স

গ। দ্য রিপাবলিক

ঘ। আর্ট অব ওয়ার

উত্তর: দ্য রিপাবলিক

৪২. এরিস্টটলের অনুসৃত পদ্ধতি-

ক। অবরোহ

খ। আরোহ

গ। উভয়ই

ঘ। কোনোটিই নয়

উত্তর: আরোহ

৪৩. বাংলাদেশের সংবিধান মূলত কোন অনুচ্ছেদের মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতিকে দিকনির্দেশনা প্রদান করে?)

ক Article 25 (অনুচ্ছেদ ২৫)

(খ) Article 50 (অনুচ্ছেদ ৫০)

গ) Article 70 (অনুচ্ছেদ ৭০)

ঘ Article 100 (অনুচ্ছেদ ১০০)

উত্তর: Article 25 (অনুচ্ছেদ ২৫)

৪৪. বাংলাদেশ ও দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীরা কোন আঞ্চলিক পরিবহন উদ্যোগের অংশ?)

ক) BBIN

খ) ASEAN

গ) OIC

ঘ) EU

উত্তর: BBIN

৪৫। বাংলাদেশের মায়ানমারের সঙ্গে কৌশলগত

সহযোগিতা কোন কারণে প্রভাবিত?

(ক) Textile export (পোশাক রপ্তানি)

খ Rohingya crisis (রোহিঙ্গা সংকট)

গ Nuclear cooperation (পারমাণবিক সহযোগিতা)

(ঘ) Tourism (পর্যটন)

উত্তর: রোহিঙ্গা সংকট

৪৬. Spoils system কী?

ক। মেধা

খ। আনুগত্য

গ। দলীয় সুযোগ

ঘ। বংশ পরিচয়

উত্তর: দলীয় সুযোগ

ব্যাখ্যা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'Spoil system' হল একটি রাজনৈতিক প্রথা যেখানে একটি রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় এসে তার সমর্থকদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দেয়।

৪৭. জাতীয় সংসদের সভাপতি কে?

ক. রাষ্ট্রপতি

খ. প্রধানমন্ত্রী

গ। স্পিকার

ঘ। ডেপুটি স্পিকার

উত্তর: স্পিকার

৪৮. যুক্তরাষ্ট্রের কোন অঙ্গরাজ্যের ইলেকটোরাল ভোটে সবচেয়ে বেশি?

ক. ক্যালিফোর্নিয়া

গ. নিউইয়র্ক

খ. টেক্সাস

ঘ. ফ্লোরিডা

উত্তর: ক্যালিফোর্নিয়া ৫৫ টি

৪৯. ককাস কী

ক. প্রচারণা

খ। প্রার্থীতা বাছাই

গ। রাজনৈতিক দল

ঘ। কোনোটিই নয়

উত্তর: প্রার্থীতা বাছাই

দলের নিবন্ধিত ভোটার ও কর্মীদের সভা যেখানে সভায় প্রার্থী ও তাঁদের নির্বাচনী ইস্যু নিয়ে আলাপ-আলোচনা

হয়। পরে তাঁরা ভোটের আয়োজন করে একজন প্রার্থী নির্বাচন করেন।

৫০. ১৯৭২ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের সদস্যপদের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে কোন পরাশক্তি ভেটো ব্যবহার করেছিল?

- ক) USA (যুক্তরাষ্ট্র)
- খ) USSR (সোভিয়েত ইউনিয়ন)
- গ) China (চীন)
- ঘ) UK (যুক্তরাজ্য)

উত্তর: চীন

৫১. বাংলাদেশ-রাশিয়া সহযোগিতার কোন খাত প্রধানভাবে ফোকাস নয়?

- ক) Nuclear energy (পারমাণবিক শক্তি)
- খ) Defense cooperation (সামরিক সহযোগিতা)
- গ) Education and training (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ)
- ঘ) Colonization (উপনিবেশ স্থাপন)

উত্তর: উপনিবেশ স্থাপন

৫২. বাংলাদেশ-চীন রাজনৈতিক সম্পর্ক মূলত কী ভিত্তিতে?

- ক) Strategic partnership and economic cooperation (কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা)

খ) Colonization (উপনিবেশ স্থাপন)

গ) Military conquest (সামরিক বিজয় / আক্রমণ)

ঘ) Isolation (বিচ্ছিন্নতা)

উত্তর: কৌশলগত অংশীদারিত্ব ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা)

৫৩. কোন জাতিসংঘ সংস্থা বাংলাদেশকে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে সহায়তা করে?

- ক) UNESCO (ইউনেসকো)
- খ) WTO (বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা)
- গ) NATO (উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা)
- ঘ) IMF (আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল)

উত্তর: ইউনেস্কো

৫৪. বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে একচেটিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল (EEZ) সংক্রান্ত দাবি কীভাবে সমাধান করা হয়েছিল-

ক) Bilateral treaty with India (ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি)

(খ) UN arbitration (জাতিসংঘের মধ্যস্থতা)

গ) SAARC mediation (সার্কের মধ্যস্থতা)

ঘ) ASEAN negotiation (আসিয়ানের আলোচনার মাধ্যমে)

উত্তর: UN arbitration (জাতিসংঘের মধ্যস্থতা)

৫৫. ১৯৯৬ সালে কোন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল সুষ্ঠু নির্বাচন তদারকির জন্য?

ক) Interim civilian rule (অন্তর্বর্তীকালীন কবেসামরিক শাসন)

(খ) Military council (সামরিক পরিষদ)

গ) Non-party caretaker government (নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার)

ঘ) Emergency administration (জরুরি প্রশাসন)

উত্তর : নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার)

৫৬. বাংলাদেশের 'জেল হত্যা দিবস' কাকে নির্দেশ করে?

ক) Assassination of Sheikh Mujibur Rahman (শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ড)

খ) Killing of four national leaders in Dhaka Central Jail (ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ড)

গ) Death of Ziaur Rahman (জিয়াউর রহমানের মৃত্যু)

ঘ) 7 November soldiers' revolt (৭ নভেম্বর সেনা বিদ্রোহ)

উত্তর: ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে চার জাতীয় নেতার হত্যাকাণ্ড

৫৭. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় কবে?

ক) 7 March 1971 খ) 25 March 1971

গ) 16 December 1971 ঘ) 26 March 1971

উত্তর: ২৬ মার্চ ১৯৭১

৫৮. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে কোন ব্রিগেড ফোর্স গঠিত হয়?

ক) এস ফোর্স খ) জেড ফোর্স

গ) কে ফোর্স ঘ) কোনোটিই নয়

উত্তর: জেড ফোর্স

৫৯. স্বাধীনতার কত বছর পরে বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমানের দেহাবশেষ পাকিস্তান হতে বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়?

(ক) ২৫ বছর

(খ) ২৯ বছর

(গ) ৩৫ বছর (ঘ) ৩৭ বছর
 উত্তর: ৩৫ বছর
 ৬০. ড. মোহাম্মদ শামসুজ্জোহা শহীদ হন-
 ক) ৫২ এর ভাষা আন্দোলনে
 খ) ৬২ এর শিক্ষা আন্দোলনে
 গ) ৬৬ এর ছয়-দফা আন্দোলনে
 ঘ) ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থানে
 উত্তর: ৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান
 ৬১. গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলাকে অন্যতম ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান কোন সদস্য?
 ক) শামসুল হক খ) ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
 গ) শামসুর রাহমান ঘ) আতাউর রহমান খান
 উত্তর: ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত
 ৬২. বেসিক ডেমোক্রেসি' (Basic Democracy) বা মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা কে প্রবর্তন করেন?
 ক) জেনারেল ইয়াহিয়া খান
 খ) জেনারেল আইয়ুব খান
 গ) শেখ মুজিবুর রহমান
 ঘ) জুলফিকার আলী ভুট্টো
 উত্তর: জেনারেল আইয়ুব খান
 ৬৩. ছয় দফা দাবির মূল উদ্দেশ্য কী ছিল?
 ক) স্বাধীনতা অর্জন
 খ) প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
 গ) শিক্ষা সংস্কার
 ঘ) রাষ্ট্রভাষা বাংলা
 উত্তর: প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন
 ৬৪. ১৯৬২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ছিল-
 ক) রাষ্ট্রপতি শাসিত খ) গণভোট
 গ) ইসলামি ব্যবস্থা ঘ) সবগুলো
 উত্তর: সবগুলো
 ৬৫. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কী?
 ক। To give all governmental authority in one person (শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব একজন ব্যক্তিকে দেয়া)
 খ। To divide governmental power among different organs of state (সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শাসনক্ষমতা ভাগ করা)
 গ। To create a powerful Legislative body (শক্তিশালী আইনসভা তৈরি)

ঘ। To eliminate the need for checks and balances (নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের অভাব বিলোপ করা)
 উত্তর: সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শাসনক্ষমতা ভাগ করা)
 ৬৬. প্রতিনিধিত্বের বৈচিত্র্যতা কী?)
 ক। Authority of Majority group (সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কর্তৃত্ব)
 খ। Single-party Control (এক-দলীয় নিয়ন্ত্রণ)
 গ। Fair Participation of all groups (সকল দলের সুষ্ঠু অংশগ্রহণ)
 ঘ। Increasing administrative power (প্রশাসনিক ক্ষমতা বৃদ্ধি)
 উত্তর: সকল দলের সুষ্ঠু অংশগ্রহণ
 ৬৭. (নিচের কোনটি নির্বাচকমন্ডলীর কাজ নয়)
 ক। Choosing representatives (প্রতিনিধি বাছাই)
 খ Protecting democracy (গণতন্ত্র রক্ষা)
 (গ) Expressing public opinion (জনমত প্রকাশ)
 ঘ Making judicial decisions (বিচারিক সিদ্ধান্ত নেয়া)
 উত্তর: বিচারিক সিদ্ধান্ত নেয়া)
 ৬৮. সফ্রেটিস কীভাবে মারা যান?)
 ক) Murder (হত্যা/খুন)
 খ) Suicide (আত্মহত্যা)
 গ) Sentenced to death by poisoning (বিষপানে মৃত্যুদণ্ড)
 ঘ) Peacefully with age (বার্ধক্যজনিত কারণে শান্তিপূর্ণভাবে)
 উত্তর: বিষপানে মৃত্যুদণ্ড
 ৬৯. গ্রিসের নগররাষ্ট্রে কোন ধরনের সরকার ব্যবস্থা ছিল?)
 ক) Monarchy খ) Democracy
 গ) Oligarchy ঘ) All of these
 উত্তর: সবগুলো
 ৭০. সমাজবিজ্ঞানের পথিকৃৎ বলা হয় কোন দার্শনিককে?
 ক. কার্ল মার্কসকে খ. ইবনে খালদুনকে
 গ. ম্যাক্স ওয়েবার ঘ. এথিল ডুখেইমকে
 উত্তর: ইবনে খালদুন
 ৭১. . আইন নিরর্থক হয়, যদি-

ক) শাসক চরিত্রবান হন
 খ) শাসক গণতান্ত্রিক মনস্ক হন
 গ) শাসক দুর্নীতিপরায়ন হন
 ঘ) কোনোটিই নয়
 উত্তর: শাসক দুর্নীতি পরায়ন হয়।

৭২. জাতিরাত্ত্বের আদিকরূপ-
 ক) পরিবারত খ) সম্প্রদায়
 গ) সমাজ ঘ) নগর রাষ্ট্র
 উত্তর: নগর রাষ্ট্র

৭৩. টমাস হবসের গ্রন্থের নাম-
 ক। সোসাল কনট্রাক্ট
 খ। লেভিয়াথান
 গ। টু ট্রিটিক অন সিভিল গভর্নমেন্ট
 ঘ. ডেমোক্রেসি
 উত্তর: ট্রিটিক অন সিভিল গভর্নমেন্ট

৭৪. মার্কসের মতে রাষ্ট্র কি ধরনের প্রতিষ্ঠান?
 ক। সামাজিক খ। রাজনৈতিক
 গ। জৈবিক ঘ। শোষণকারী
 উত্তর: শোষণকারী

৭৫. মুকাদ্দিমা অর্থ কী?
 ক। গোষ্ঠী সংহতি খ। ভূমিকা
 গ। উপসংহার ঘ। আলোচনা
 উত্তর: ভূমিকা

৭৬. সামাজিক চুক্তি মতবাদের দার্শনিক কারা?
 ক. বেস্থাম, লক, রুশো
 খ। হবস, লক, রুশো
 গ গ্রিন, ভলটেয়ার, রুশো
 ঘ. হবস, লক, ভলটেয়ার
 উত্তর: হবস, লক, রুশো

৭৭. গণতন্ত্র জনগণের, জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য" উক্তিটি কার?
 ক. এরিস্টটল খ. আব্রাহাম লিংকন
 গ। মন্টেকু ঘ. প্লেটো
 উত্তর: আব্রাহাম লিংকন

৭৮. গণতন্ত্রে শাসককে কার কাছে জবাবদিহি করতে হয়?
 ক) রাজা খ) আদালত
 গ) জনগণ ঘ) কেউই নয়
 উত্তর: জনগণ

৭৯. রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের নীতি কী?

ক। ফেডারেলিজম খ) চেক অ্যান্ড ব্যালান্স
 গ) একনায়কত্ব ঘ) সংসদীয় নীতি
 উত্তর: চেক এন্ড ব্যালান্স

৮০. যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পদ্ধতি কী?
 ক) প্রত্যক্ষ ভোট খ) পরোক্ষ ভোট
 গ) ইলেক্টোরাল কলেজ ঘ) সংসদীয় নির্বাচন
 উত্তর: ইলেক্টোরাল কলেজ

৮১. মন্ত্রণালয়ের প্রধান কে?
 ক) সচিব খ) উপসচিব
 গ) মন্ত্রী ঘ) স্পিকার
 উত্তর: মন্ত্রী

৮২. এককেন্দ্রিক সরকারের উদাহরণ কোন দেশ?
 ক) ভারত খ) যুক্তরাজ্য
 গ) যুক্তরাষ্ট্র ঘ) জার্মান
 উত্তর: যুক্তরাজ্য

৮৩. এককেন্দ্রিক সরকারের অধীনে স্থানীয় সরকার কেমন?
 ক) স্বাধীন খ) কেন্দ্রনির্ভর
 গ) ফেডারেল ঘ) সামরিক
 উত্তর: কেন্দ্রনির্ভর

৮৪. আধুনিক ফেডারেলিজমে কোন নতুন ইস্যু যুক্ত হয়েছে?
 ক. টেকসই উন্নয়ন খ. সামরিক ক্ষমতা
 গ. ধর্মীয় প্রভাব ঘ. সাম্রাজ্যবাদ
 উত্তর: টেকসই উন্নয়ন

৮৫. তাওবাদের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি কী?
 ক) ধর্ম খ) তাও
 গ) বাণিজ্য ঘ) পরিবার
 উত্তর: তাও

৮৬. কনফুসিয়ানিজমের মূল লক্ষ্য কী?
 ক) ধর্মীয় মুক্তি
 খ) নৈতিকতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা
 গ) ধ্যান
 ঘ) জ্ঞানচর্চা
 উত্তর: নৈতিকতা ও সামাজিক শৃঙ্খলা

৮৭. গায়থালীর মতে, রাষ্ট্র পরিচালনায় সবচেয়ে জরুরি কী?
 ক) অর্থনীতি খ) নৈতিকতা
 গ) সামরিক শক্তি ঘ) শক্তি
 উত্তর: নৈতিকতা

৮৮. গায়খালীর সর্বাধিক পরিচিত গ্রন্থ কোনটি?

- ক) আল-মদিনা খ) এহ ইয়াউ উলুমুদ্দীন
গ) আল-সিয়াসা খ) নাসিহাতুল উলামা

উত্তর: এহ ইয়াই উলুমুদ্দীন

৮৯. ম্যাকিয়াভেলিকে কোন উপাধি-

- ক) আধুনিক ইতিহাসের জনক
খ) আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক
গ) আধুনিক দর্শনের জনক
ঘ) আধুনিক অর্থনীতির জনক

উত্তর: আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক

৯০. এরিস্টটলের সমসাময়িক গ্রীক সমাজ ছিল-

- ক. ধনতান্ত্রিক খ। সমাজতান্ত্রিক
গ। দাসভিত্তিক ঘ। সামন্ততান্ত্রিক

উত্তর: দাসভিত্তিক

৯১. এরিস্টটল কোন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা?

- ক. একাডেমি
খ. লাইসিয়াম
গ. পেরিপ্যাটেকটিক
ঘ. জিমনেশিয়াম

উত্তর: একাডেমি

৯২. কোটিল্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন?

- ক) নালন্দা খ) বিক্রমশীলা
গ) তক্ষশীলা ঘ) মগধ

উত্তর: তক্ষশীলা

৯৩. এরিস্টটলের মতে মানুষ হলো-

- ক. অর্থনৈতিক প্রাণী ঘ. ধর্মীয় প্রাণী
গ. রাজনৈতিক প্রাণী ঘ. সামরিক প্রাণী

উত্তর: রাজনৈতিক প্রাণী

৯৪. সফ্রেটিসের শিক্ষাপদ্ধতির নাম কী?

- ক) দার্শনিক পদ্ধতি খ। মায়োটিক
গ) নৈতিক পদ্ধতি ঘ) অভিজ্ঞতাবাদ

উত্তর: মায়োটিক বা সফ্রেটিস পদ্ধতি

৯৫. মনসমীক্ষামূলক পন্থার প্রবর্তক কে?

ক) কার্ল মার্কস খ। সিগমুন্ড ফ্রয়েড

গ) এডওয়ার্ড বার্নেস ঘ) এ. বি. হগার্ট

উত্তর: সিগমুন্ড ফ্রয়েড

৯৬. জেনারেল এরশাদ কবে ক্ষমতা দখল করেন?

- ক) ১৯৮০ সালের ২৪ মার্চ
খ) ১৯৮১ সালের ২৪ মার্চ
গ) ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ
ঘ) ১৯৮৩ সালের ২৪ মার্চ

উত্তর: ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ

৯৭. সেনাবাহিনী কবে প্রথম বাংলাদেশের ক্ষমতা দখল করে?

- ক) ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ
খ) ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর
গ) ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারী
ঘ) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট

উত্তর: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট

৯৮. ১৯৯০ সালে এরশাদ বিরোধী আন্দোলন কে নেতৃত্ব দেয়?

- ক) আওয়ামী লীগ। খ) বিএনপি
গ) ছাত্র সংগঠন ঘ) সবগুলোই

উত্তর: সবগুলোই

৯৯. বাংলাদেশের সংবিধানে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি বিলুপ্তি ও পুনর্বহাল করা হয় কততম সংশোধনীর মাধ্যমে?

- ক। দ্বাদশ ও চতুর্দশ খ. চতুর্থ ও দ্বাদশ
গ. তৃতীয় ও দ্বাদশ ঘ. ষষ্ঠ ও দ্বাদশ

উত্তর: চতুর্থ ও দ্বাদশ

১০০. ম্যাকিয়াভেলি কোন ধরনের রাজনৈতিক দর্শনের প্রবর্তক?

- ক) ভাববাদ খ) বাস্তববাদ
গ) আদর্শবাদ ঘ) নীতিবাদ

উত্তর: বাস্তববাদ

Wishing all of you the best outcome.....

THANKS